মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফী

প্রচলিত ভুল
সংশয় ও বিভ্রান্তি

গ্রন্থনা
মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফী
উলুমুল হাদিস সমাপন : মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা
উসতাযুল হাদিস : জামিয়া ইসলামিয়া চরপাড়া, ময়মনসিংহ

সম্পাদনা
মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি
শায়খুল হাদিস : আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

সম্পাদকের কথা

باسمه تعالى

বহু কাল ধরে আমাদের সমাজে কিছু কিছু কথা প্রচলিত আছে। অনেক আলেমও এ সকল বিষয় তাদের বয়ান-বক্তৃতায় প্রচার করে থাকেন। কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এগুলো কতটুকু সঠিক, এগুলোর ভিত্তি কতটুকু মজবুত, মানুষের কাছে তা প্রচার-প্রসার করার যোগ্য কিনা, তা যাচাই করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি না। অথচ যে কোনো কথা প্রচার করার দ্বারা কিংবা কোনো নেক আমলের দ্বারা তখনই সাওয়াবের আশা করা যায়, যদি বিষয়টি সহিহ হয়। পক্ষান্তরে সনদবিহীন প্রচলিত কোনো কথা যদি মানুষের কাছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিসেবে তুলে ধরা হয়, তাহলে হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী এটি বড় ধরনের গুনাহর কারণ হবে।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে গত কয়েক বছর আমার স্নেহাস্পদ মাও. মাহবুবুল হাসান আরিফি এ জাতীয় নানা বিষয়ের তাহকিক ও গবেষণা শুরু করে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তা প্রচারে সচেষ্ট হয়। বেশ কিছু বিষয় লেখার পর পাঠক মহল থেকে তা পুস্তক আকারে প্রকাশের চাহিদা আসে। অতঃপর লেখাগুলো গ্রন্থিত করে সে আমার কাছে পেশ করে। আমি পুরো বইটি পড়ে দেখেছি। কয়েক জায়গায় সংশোধন করে দিয়েছি। আবার কোনো কোনো জায়গায় কিছুটা সংযোজন-বিয়োজনও করেছি। আর কিছু কিছু বিষয় আমার কাছে একটু বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় সেগুলো বাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছি।

সহিহ কথার প্রচার ও ভিত্তিহীন বিষয়ের অসারতা প্রমাণে তার এই মহৎ উদ্যোগটি অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। দোয়া করি আল্লাহ তায়ালা তার লেখায় যেন বরকত দান করেন এবং সমাজ ও জাতি যেন এর দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে লেখাগুলোর উপর আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

-মাওলানা শফিকুর রহমান জালালাবাদি

লেখকের কথা

২০১৫ সাল থেকে আমি ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ে লিখে আসছি। সমাজে প্রচলিত ভুল কথা, ভুল কাজ, ভুল বিশ্বাস এবং কিছু বিভ্রান্তি ও সংশয়ই ছিল আমার লেখার মূল প্রতিপাদ্য। সময়ে সময়ে এ সকল বিষয়ে আমি লিখতাম। এভাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লেখা জমা হয়ে গেলে আমার কল্যাণকামী বন্ধুরা সেগুলোকে মলাটবদ্ধ করার তাগিদ দিতে থাকেন। কিন্তু অন্যান্য লেখালিখিতে ব্যস্ত থাকায় এগুলো পরিমার্জন করার সুযোগ হচ্ছিল না। একদিন রাহনুমা প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী দেওয়ান মুহা. মাহমুদুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করলে তিনি লেখাগুলো ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তার উৎসাহ পেয়ে পরিমার্জনের কাজে হাত দেই।

আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া, অবশেষে **'প্রচলিত ভুল, সংশয় ও বিভ্রান্তি'** নামক গ্রন্থটির কাজ শেষ হয়। অতঃপর আমার একান্ত ঘনিষ্ঠ বিজ্ঞ কয়েকজন আলেমকে এটি দেখে দেওয়ার অনুরোধ করি। তারা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে পুরো গ্রন্থটি দেখে কিছু পরামর্শ দেন। তাদের পরামর্শের আলোকে পুনরায় বইয়ে পরিমার্জন শুরু করি। তারপর আমার পিতা মাও. শফিকুর রহমান জালালাবাদি সাহেবের নিকট বইটি সম্পাদনার জন্য পেশ করি। তিনি এটি আদ্যোপান্ত দেখে কয়েক জায়গায় সংযোজন-বিয়োজন করেন, কিছু কিছু জায়গায় সংশোধনও করে দেন, আবার দুয়েকটি লেখা বাদ দেওয়ার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ অনুযায়ী আমি লেখাগুলো চূড়ান্ত করি।

এ বইটি একসাথে বসে লেখা কোনো বই নয়; বরং এ বই সময়, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের উপর নানান লেখার সমষ্টি। তাই এখানকার প্রতিটি লেখাই স্বতন্ত্র। এ কারণেই সবগুলো লেখার উপস্থাপনা একরকম হয়নি। তবে বইটি বিশুদ্ধ ও পাঠকপ্রিয় করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও কোথাও যদি কোনো ভুল পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাকে অবগত করলে খুশি হব।

বইটি সংকলনে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। বিশেষভাবে আমার সহকর্মী মুফতী আব্দুল্লাহ মাহমুদ এবং আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তায়ালা তাদের অশেষ প্রতিদান দিন। আর লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক ও পাঠক সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতের অশেষ কল্যাণ দান করুন। বইটির উসিলায় আমাদের সবার নাজাতের ব্যবস্থা করে দিন। আমিন।

সূচি

ঈমান-আকিদা

‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়’—কথাটি কি সঠিক?

আমাদের সমাজে অনেকের মুখে মুখে প্রচলিত কিছু কথা এমন আছে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। থাকলেও যে অর্থে কথাগুলো প্রসিদ্ধ, সে অর্থগুলো বাস্তবতাবিরোধী। এমনই একটি কথা হচ্ছে ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়।’

এই কথাটি অনেকের কাছে যেন এক ‘মূলনীতি’তে পরিণত হয়ে গেছে। আর এই প্রসিদ্ধ কথার উপর ভিত্তি করেই গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি নেওয়া হচ্ছে—কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক, যিন্দিক[১], শাতিমে রাসুল (রাসুলকে কটূক্তিকারী), ইসলাম বিদ্বেষী, বেদআতি, পাপাচারী, কারও প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ করা যাবে না। শুধু তাই নয়, এই কথাটির উপর ভিত্তি করে মাঠে-ময়দানে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের ভালোবাসতে বলা হয়। তাদের মহব্বত করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। তাদের অসম্মান করলে, মহব্বত না করলে সাব্যস্ত করা হয় মহাপাপী বলে!

মোটকথা, এই ‘মূলনীতি’র ভিত্তিতেই আমরা তাদের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা পোষণ করে চলছি। অথচ তারা তাদের ভ্রান্ত ধর্ম বা মতবাদে এতই কট্টর যে, আমাদের ভালোবাসা তো দূরের কথা, বরং আমাদের হীনতম শত্রু মনে করে। দেশে দেশে আমাদের ভাইবোনদের ব্যাপক হত্যা ও নির্যাতনের কোনো অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি এবং রাখছেও না। বাস্তবতা হচ্ছে ‘পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়’ কথাটি বাহ্যিক অর্থে এবং যে অর্থে প্রসিদ্ধ, সেই অর্থে এটির ব্যবহার কুরআন ও হাদিসের বিরোধী। এ কথাটি বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

প্রথম কথা হল, কুরআন-সুন্নাহয় সুস্পষ্টভাবে কাফের-মুশরিকদের প্রতি বিদ্বেষ রাখতে এবং তাদের ঘৃণা করতে বলা হয়েছে। নিচে এ সংক্রান্ত কিছু আয়াত ও হাদিস লক্ষ করুন।

---

১. যে ইরতিদাদ অর্থাৎ ইসলামত্যাগ-মূলক কোনো আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে অথবা অনুরূপ কাজ-কর্মের সঙ্গে জড়িত থেকেও নিজেকে কথা বা কাজে মুসলমান বলে দাবি করছে।

কুরআনের দাবি

এক. কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

'তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সূচিত হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যদি-না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আন।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

লক্ষ করুন, উপরোক্ত আয়াতে কাফেরদের সাথে চিরকালের জন্য الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ—অর্থাৎ শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা বলা হয়েছে। আর الْبَغْضَاءُ শব্দের অর্থই হচ্ছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। সুতরাং উপরোক্ত আয়াতের আলোকেই কাফেরদের সাথে চিরকালের জন্য একজন মুমিনের ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকবে; শুধু কুফরের প্রতি ঘৃণা থাকলেই হবে না।

আরও লক্ষ করুন, উক্ত আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে, إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ—অর্থাৎ 'তোমাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।' এরপর বলা হয়েছে, 'এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সঙ্গেও সম্পর্ক নেই।'

বোঝা গেল, শুধু গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের) ইবাদত অপছন্দ করলে এবং তা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখলেই হবে না। গাইরুল্লাহর ইবাদতকারী থেকেও 'বারাআত' তথা সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করা আবশ্যক।

দুই. আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا.

'অতঃপর সে যখন তাদের এবং তারা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করত, তাদেরকে পরিত্যাগ করল, তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকুব এবং প্রত্যেককে নবি বানালাম।' (সুরা মারইয়াম, আয়াত ৪৯)

লক্ষ করুন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের বড় বড় নেয়ামতপ্রাপ্তির কারণ হিসেবে শুধু তাদের উপাস্য থেকে পৃথক হওয়ার কথাই বলেননি, বরং উপাস্যের পাশাপাশি যারা উপাসনা করত, তাদের থেকেও পৃথক হওয়া এবং তাদেরও পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। বোঝা গেল, শুধু অপরাধকে ঘৃণা করে পরিত্যাগ করলেই হবে না, অপরাধীদেরও পরিত্যাগ করতে হবে।

হাদিসের দাবি

কুরআনুল কারিমের পাশাপাশি হাদিস শরিফেও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদিসগুলো দেখুন।

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

অর্থাৎ যার ভালোবাসা ও ঘৃণা, দান করা ও না করা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে, সে পূর্ণ ঈমানদার।[১]

ওলামায়ে কেরাম এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে কাউকে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য ভালো না বেসে শুধুই আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, পাশাপাশি কারও প্রতি নিজের ক্ষোভ থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ না রেখে কুফরি ও গোনাহের সূত্রে ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তাহলে সে হচ্ছে পূর্ণ ঈমানদার।[২]

আবদুল্লাহ ইবনে বায রহ. হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আল্লাহর জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের অর্থ হচ্ছে, তুমি কোনো কাফেরকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখলে শুধু আল্লাহর জন্য তার প্রতি বুগয—অর্থাৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। অথবা কোনো মুসলমানকে আল্লাহর অবাধ্যতা করতে দেখলে তার অবাধ্যতার পরিমাণ অনুযায়ী তার প্রতি বুগয—অর্থাৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। আল্লাহর জন্যই মুত্তাকি ও ঈমানওয়ালাদের মহব্বত করবে এবং আল্লাহর জন্যই কাফের-পাপাচারীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি ভালো-মন্দ দুটি দিকই পাওয়া যায়, যেমন— পাপাচারী মুমিন, তাহলে তাকে তার ইসলামের কারণে মহব্বত করবে, আর পাপের কারণে ঘৃণা করবে। একই সাথে ভালোবাসা ও ঘৃণা—দুটি দিকই পাওয়া যাবে। সারকথা, মুমিন ও সৎ লোকদের পূর্ণ মহব্বত করবে, আর কাফেরদের প্রতি পুরোপুরি ঘৃণা ও বিদ্বেষ রাখবে। আর যার মধ্যে পাপ ও পুণ্যের

---

১. *সুনানে আবু দাউদ*: ৪৬৮১ (হাদিসটির সনদ সহিহ)

২. *আউনুল মাবুদ*: ১২/২৮৫; *ফাইযুল কাদির*, মুনাভি: ৬/২৯; *মিরআতুল মাফাতিহ*: ১/১০২

দুটি দিকই আছে, তাকে তার ঈমান ও ইসলামের পরিমাণ অনুযায়ী মহব্বত করবে, পাশাপাশি তার পাপ ও শরিয়ত-বিরোধিতার পরিমাণ অনুযায়ী তাকে ঘৃণা করবে।’

দুই. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ، فَيَقُولُ: إِنِّي أُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضْهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ. قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ.

‘আল্লাহ তায়ালা কাউকে অপছন্দ করলে জিবরিলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ করো। তখন জিবরিল আলাইহিস সালাম তাকে অপছন্দ করেন। এরপর তিনি আকাশবাসীকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা অমুক বান্দাকে অপছন্দ করেন, তাই তোমরাও তাকে অপছন্দ করো। তখন আসমানবাসীও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। অতঃপর পৃথিবীতে তার প্রতি বিদ্বেষ অবধারিত করে দেওয়া হয়।’[১]

লক্ষ করুন, এই হাদিসে বার বার بغض—‘বুগয’ শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ ঘৃণা করা, বিদ্বেষ পোষণ করা, অপছন্দ করা। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দার কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতি ‘বুগয’ পোষণ করেন, এরপর জিবরিল আলাইহিস সালাম ঘোষণা দিয়ে বলেন, ‘আল্লাহ তায়ালা অমুকের প্রতি ‘বুগয’ তথা ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করেন, তোমরাও তার প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করো।’

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট যে, পাপাচারীদের প্রতি তাদের পাপের পরিমাণ অনুপাতে ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকতে হবে। মুমিন হলে তার ঈমানের কারণে তার প্রতি মহব্বত থাকবে, আবার পাপের কারণে তার প্রতি এক প্রকারের ঘৃণা ও অসন্তুষ্টিও থাকবে। আর পাপাচারী যদি কাফের হয়, তখন তার প্রতি তো পুরোপুরিই ঘৃণা থাকবে। মহব্বতের লেশও থাকবে না।

যুক্তির দাবি

কাফের, মুরতাদ, নাস্তিক, যিন্দিক, শাতিমে রাসুল (রাসুলের শানে কটূক্তিকারী), ইসলাম বিদ্বেষী, বেদআতি ও পাপাচারীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ থাকা কুরআন-হাদিসের নির্দেশের পাশাপাশি সাধারণ যুক্তির দাবিও বটে। কারণ,

---

১. *সহিহ মুসলিম:* ২৬৩৭

আপনি যাকে ভালোবাসেন ও মহব্বত করেন, তার দুশমনের সাথে আপনার ভালোবাসা থাকতে পারে না। কাফেররা হচ্ছে আল্লাহর দুশমন। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকলে তার দুশমনের সাথে ভালোবাসা থাকতে পারে না। থাকবে শুধু ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

দেখুন, কাউকে মহব্বত করার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হচ্ছে তার প্রিয় বস্তুটি নিজের কাছেও প্রিয় হওয়া এবং তার অপ্রিয় বস্তুটি নিজের কাছেও অপ্রিয় হওয়া। এখন চিন্তা করার বিষয় হল কাফের, মুশরিক, যিন্দিক, নাস্তিক, ইসলাম বিদ্বেষী, এরা আল্লাহর দুশমন। সুতরাং কারও অন্তরে আল্লাহর মহব্বত থাকলে, তাদের প্রতি কোনো মহব্বত থাকতে পারে না। কেউ যদি ইসলাম বিরোধী একটি কথাও বলে, তাহলে তার প্রতি কারও আন্তরিকতা থাকতে পারে না।

আপনাকে বলছি— আপনার সামনে আপনার অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর সমালোচনা কেউ করলে, কিংবা তার ব্যাপারে কুৎসা রটালে আপনার অবস্থা কেমন হবে, বলুন তো? তাহলে কেউ যদি মুমিনের প্রকৃত ওলি ও বন্ধু আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে, তার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বা তার প্রিয় দ্বীন সম্পর্কে কুৎসা রটায়, গালাগালি ও সমালোচনা করে, তারপরও তার প্রতি আপনার মহব্বত ও অন্তরের টান থাকাটা একজন মুমিন হিসেবে আপনার জন্য কতটুকু কাম্য হতে পারে?

কয়েকটি সংশয়ের নিরসন

এক. অনেকে থানভি রহ. এর একটি বক্তব্য সামনে এনে বলে থাকে, তিনি পাপকে ঘৃণা করতে বলেছেন, পাপীকে নয়। কিন্তু তাদের কথাটি বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমে থানভি রহ. এর বক্তব্যটি লক্ষ করুন। *আনফাসে ঈসা* গ্রন্থে (পৃ. ১৬০) তিনি বলেন, 'নিজের তাকওয়া ও পবিত্রতার প্রতি অহংকারবশত গুনাহগারদের তুচ্ছ মনে করো না।'

খুব ভালো করে লক্ষ করুন, তিনি কী বলেছেন! বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বলি। কোনো পাপাচারীকে দেখে মনের মধ্যে দুটি অবস্থা হতে পারে। হয়ত এই ভেবে মনে মনে খুশি অনুভূত হবে যে, আল্লাহ তায়ালাই তো আমাকে কুফর এবং গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছেন। না হয় আমার কী শক্তি ছিল! আমার পাশেই তো একজন কত বড় অপরাধে লিপ্ত। একজন মুমিন এজন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে। এটাই একজন মুমিনের কাম্য। এতে সে সাওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে মনে মনে নিজেকে অপরাধীর চেয়ে ভালো ও বড় মনে করা এবং

অপরাধীকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে অহংকার। এতে গুনাহ হবে। সুতরাং যে কোনো পাপাচারীকে অহংকারবশত তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করা এবং নিজেকে উত্তম ও বড় মনে করা এক বিষয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর জন্য কারও প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা ভিন্ন বিষয়। আর থানভি রহ. এর কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথমটি, অর্থাৎ অহংকার থেকে বারণ করা। আর এটি তো আপন জায়গায় ঠিকই আছে।

দুই. কাফেরদের সাথে বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে কোনোরূপ সদাচরণ করা যাবে না। বরং সাধারণ অবস্থায় অমুসলিম আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্য যে কোনো বিধর্মীর সাথে সদাচরণ শরিয়তে বৈধ। নিজের ঈমান-আকিদা এবং ইসলামি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা রক্ষা করে তাদের সাথে সদাচরণ করা শুধু বৈধই নয়, বরং এ ব্যাপারে শরিয়তের নির্দেশ রয়েছে। এমনকি নফল দান-সদকা দ্বারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাও জায়েয। তা ছাড়া কুরআন মাজিদের এ হুকুম তো সকলের জন্যই প্রযোজ্য—'ভালো ও মন্দ সমান হতে পারে না, মন্দ প্রতিহত করুন উৎকৃষ্টের দ্বারা। ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।' (সুরা হা-মিম আস-সাজদা, আয়াত ৩৪-৩৫)

আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে— কাফেরদের সাথে আমাদের শত্রুতা কেবল আল্লাহর জন্য। তাই আমি তার সাথে কখনও বেইনসাফি করব না। বরং যদি দেখি সে মজলুম হচ্ছে, আর তাকে জুলুম থেকে মুক্ত করার সামর্থ্য আমার আছে, তাহলে জুলুম থেকে মুক্ত করতেও আমি পিছপা হব না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

'তোমাদেরকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না। আল্লাহকে ভয় করবে। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।' (সুরা মায়িদা, আয়াত ২)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ.

'হে মুমিনগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। সুবিচার করবে, তা তাকওয়ার নিকটতর। আর আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।' (সুরা মায়িদা: ৮)

সুরা মুমতাহিনার আট নম্বর আয়াতে বলেন,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

'দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন।'

মোটকথা, একজন মুমিনের উপর অমুসলিমের যে হক সাব্যস্ত হয়, তা তো অবশ্যই আদায় করতে হবে, কিন্তু তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে না। বরং মুমিন তাকে আল্লাহর জন্য দুশমনই মনে করবে, যে পর্যন্ত না সে ঈমান আনে ও ইসলাম কবুল করে।

তিন. আমাদের বিদ্বেষ যেহেতু আল্লাহর জন্য, তাই বিদ্বেষের পাশাপাশি দরদও থাকবে। অর্থাৎ কোনো অপরাধীকে দেখলে এই ভেবে মনে মনে কষ্ট হবে—হায়! আমাকে আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করেছেন, কিন্তু আমার কাছের লোকটিই তো মহাবিপদে পড়ে আছে। সে যদি কুফর থেকে বেঁচে না আসে, তাহলে তো চির জাহান্নামি হয়ে যাবে। সে যদি গুনাহ পরিত্যাগ না করে, কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে।

সাধারণত কারও সাথে দুনিয়াবি কোনো স্বার্থের কারণে শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকলে শত্রুর প্রতি কোনো দরদ থাকে না। কিন্তু আমাদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ যেহেতু আল্লাহর জন্য, তাই বিদ্বেষের পাশাপাশি দরদও থাকবে।

চার. কাফের ও অমুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাদের উপাস্যকে গালাগাল করা যাবে না। ইসলাম মুসলমানদের অপর ধর্মের উপাস্যকে গালাগালের অনুমতি দেয় না। কারণ, তা ভদ্রতা পরিপন্থি। তা ছাড়া একে বাহানা বানিয়ে তারা ইসলামের সত্য নিদর্শনের অবমাননা করবে।

এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

'আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদেরকে ডাকে, তোমরা তাদেরকে গালি দিয়ো না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অতঃপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।' (সুরা আনয়াম, আয়াত ১০৮)

অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপাস্য ও নিদর্শনকে উপহাস ও কটূক্তি থেকে বিরত থাকা ইসলামের শিক্ষা, যা স্বস্থানে ইসলামি আদর্শের এক উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যের দিক। কিন্তু এর অর্থ কখনও এই নয় যে, তাদের রব ও মাবুদের (যা নিঃসন্দেহে অসার ও অসত্য) এবং এদের শাআইর ও নিদর্শনের (যা পুরোপুরি কল্পনা ও কুসংস্কারপ্রসূত) সমর্থন ও সত্যায়ন করা হবে, কিংবা এগুলোর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হবে, অথবা এগুলোর প্রতি অন্তরে আবেগ ও ভক্তি পোষণ করা হবে। কারণ এসব সরাসরি কুফর। যদি তা সমর্থনযোগ্য এবং সত্যায়নযোগ্য হয়ে যায়, তাহলে তো ঈমান ও কুফরের মাঝে কোনো পার্থক্যই অবশিষ্ট থাকে না। আর উপরোক্ত বিশ্বাস ও কর্মের পর ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

ভালোভাবে বোঝা উচিত, কোনো কিছুর কটূক্তি-অবজ্ঞা থেকে বিরত থাকার অর্থ এই নয় যে, ওই বিষয়কে সম্মান করতে হবে, বা সত্য মনে করতে হবে। মনে রাখতে হবে—কুফরের শাআইরের সম্মান বা ভালোবাসা হচ্ছে সুস্পষ্ট কুফর।

* * *

অপরাধীকে অহংকারবশত ঘৃণা নয়

একজন মুমিনের উচিত সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। এটাই তার ঈমানের দাবি। কিন্তু বাস্তবতা হল—কমবেশি সবারই কিছু না কিছু অপরাধ হয়েই যায়। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.

'আদম সন্তানের সবাই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তওবাকারীরাই সর্বোত্তম।'[১] সুতরাং শত চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অপরাধ আমাদের থেকে হয়েই যাবে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই কারও যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়, তাহলে কুরআন-হাদিসে তাকে তাওবা-ইস্তিগফার করতে বলা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য অন্য একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমরা কাউকে কোনো অপরাধ করতে দেখলে আমাদের উচিত হবে তাকে যথাসম্ভব অপরাধ থেকে বিরত রাখা। হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ.

'দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনার নাম।' বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রাসুলকে জিজ্ঞেস করলাম— 'কার জন্য কল্যাণ কামনা?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন— 'আল্লাহ, তার কিতাব ও তার রাসুলের এবং মুসলিম শাসক ও মুসলিম জনগণের জন্য কল্যাণ কামনা।'[২]

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমার ভাইকে জালিম ও মজলুম উভয় অবস্থায় সহযোগিতা করো।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন— 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, মজলুমকে সহযোগিতা করার বিষয়টি বুঝি। কিন্তু জালিমকে কীভাবে সাহায্য করব?' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তার হাতে ধরবে (তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সহযোগিতা করা)।'[৩]

এই হল নববি নির্দেশনা। কাউকে অপরাধ করতে দেখলে কী করতে হবে, তার বিবরণ এতে ফুটে উঠেছে।

তাছাড়া এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে,

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ২৪৯৯
২. *সহিহ মুসলিম*: ৫৬
৩. *সহিহ বুখারি*: ২৪৪৪

'মুমিনগণ এক দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে যেমন পুরো শরীর আক্রান্ত হয়, তেমনই একজন মুমিন কোনো ব্যথায় ব্যথিত হলে অপর মুমিনও ব্যথিত হবে।'[১]

সুতরাং কোনো মুমিন অপরাধে জড়িয়ে পড়লে অন্য মুমিনের কষ্ট হবে। ব্যথিত হবে এই ভেবে— 'আমার ভাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আমার ভাই বিপদে পড়ে গেছে, তাকে সহযোগিতা করা দরকার।' কিন্তু আমাদের সমাজ খুবই খারাপ। কাউকে অপরাধ করতে দেখলে কিংবা কারও দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে গেলে, সহযোগিতা তো করবেই না; বরং তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করবে; হাসাহাসি করবে; ঘৃণা করবে। আর অপরাধ যদি গোপনে করে থাকে, তাহলে সেটা আরও দশজনকে বলবে, তাকে গালিগালাজ করবে। অথচ তা কখনও মুমিনের শান হতে পারে না।

আমরা একটুও চিন্তা করি না, আল্লাহ যদি সাহায্য না করেন, তাহলে কারও পক্ষেই অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আজ যে অপরাধে আমার এক ভাই জড়িয়ে গেল, কাল আমি সে-অপরাধে জড়াব না, এর কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? সুতরাং কেন আমরা অপর ভাইকে অপরাধে লিপ্ত দেখলে প্রথমে আল্লাহর শোকর আদায় করি না এই বলে— হে আল্লাহ, অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার শক্তি আমাদের নেই, যদি আপনি আমাদেরকে সাহায্য না করেন। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তোমার অসংখ্য শোকর হে আল্লাহ! তুমি যে আমাকে অপরাধ হতে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেছ।

আমরা কি পারি না, আমার ভাইকে অপরাধে জড়িত দেখলে একটু সহযোগিতা করতে? অপরাধ হয়ে গেলে তাকে তওবা করতে উৎসাহ দিতে?

না, আমরা এগুলো করি না, এগুলো আমরা করতে পারি না। আমরা পারি কেবল অহংকারবশত ঘৃণা করতে। অথচ এমনও তো হতে পারে যে, অপরাধী তওবা করার কারণে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা অনেক বেড়ে গেল, আর আমি তাকে ঘৃণা করার কারণে আল্লাহর নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে গেলাম এবং আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয় হয়ে গেলাম।

সুতরাং অন্যের অপরাধের দিকে না তাকিয়ে নিজের দিকে তাকানোই আমাদের কর্তব্য।

---

১. *সহিহ মুসলিম: ২৫৮৯*

অপরাধীর সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

অপরাধীকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন দৃষ্টিতে দেখতেন, একটু লক্ষ করুন:

ক. *সহিহ মুসলিমে* (১৬৯৮) বর্ণিত হয়েছে, হযরত মাইয আসলামি রাযি. কে রজম (ব্যভিচারের কারণে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা) করার দুদিন পর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববিতে দাঁড়িয়ে বললেন,

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ.

'মাইয এমন তওবা করেছে যে, এর সাওয়াব যদি পুরো এক জাতির মাঝে বণ্টন করা হয়, তা হলে সবার জন্য এই তওবাই যথেষ্ট হয়ে যাবে।'

আর তিরমিজি শরিফের বর্ণনায় (১৫৫৪) এসেছে—

لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ.

'পুরো মদিনাবাসীর জন্য এই তওবাই যথেষ্ট হয়ে যেত।'

খ. *সহিহ মুসলিমের* অন্য বর্ণনায় (১৬৯৯) এসেছে— মাখযুমি মহিলাকে রজম করার সময় তার রক্তের ছিটা হযরত খালিদ রাযি. এর গায়ে এসে পড়লে তিনি তাকে লানত করলেন। তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ রাযি. কে ধমক দিয়ে বললেন,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ.

'সে এমন তওবা করেছে যে, অন্যায় ট্যাক্স উসুলকারীও যদি এমন তওবা করে, তা হলে তার তওবা কবুল হবে।'

গ. *সহিহ বুখারির* বর্ণনায় (৬৭৮০, ৬৭৮১) এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক লোককে বার বার মদপানের জন্য বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। এক বার তাকে নিয়ে এসে যখন বেত্রাঘাত করা হল, তখন এক সাহাবি দাঁড়িয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, তাকে লানত করুন।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তাকে লানত করো না। আল্লাহর কসম, আমি জানি সে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে মহব্বত করে।' আরও বললেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না।'

এই হল অপরাধীর সাথে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ। সুতরাং অহংকারবশত অপরাধীকে ঘৃণা না করে তার প্রতি সদয় হওয়া, তাকে সহযোগিতা করাই মুমিনের কাম্য। আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন। হক বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

‘প্যারাডক্সিক্যাল’র একটি পাঠ : একটি ভুল ও নিরসন

ইসলামে শত্রুতা ও মিত্রতার একটি মাপকাঠি আছে। মুমিনের বন্ধু কে হবে, মুমিন কাকে ভালোবাসবে, কাকে অপছন্দ করবে, কার প্রতি তার বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকবে, কুরআন-সুন্নাহয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শত্রুতা-মিত্রতা এবং পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান ও কুফর। একজন মুমিনের বন্ধুত্ব থাকবে অন্য মুমিনের সাথে। কুরআনুল কারিমের অসংখ্য আয়াতের পাশাপাশি বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— একজন মুমিনের মহব্বত, ভালোবাসা, দরদ থাকবে কেবল অন্য মুমিনের প্রতি।

কারা মুমিনের বন্ধু হতে পারে, কুরআনের ভাষায় শুনুন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

‘নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সহায়তা করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু।’ (সুরা আনফাল, আয়াত ৭২)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

‘মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু।’ (সুরা তাওবা, আয়াত ৭১)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

‘তোমাদের বন্ধু কেবল আল্লাহ, তার রাসুল ও মুমিনগণ।’ (সুরা মায়িদা, আয়াত ৫৫)

বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে আরও অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

‘মুমিনগণ কাফেরদের যেন বন্ধু না বানায়।’ (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৮)

অন্য আয়াতের বলেছেন, কেয়ামতের দিন কিছু বন্ধুত্বের কারণে মানুষ আফসোস করবে। তারা কেয়ামতের দিন বলবে,

يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا

'হায়! অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম!' (সুরা ফুরকান, আয়াত ২৮)

কাফেররা যেহেতু আল্লাহ তায়ালা এবং মুসলমানদের দুশমন, বন্ধু নয়, তাই দুশমনের প্রতি মুসলমানদের কোনো প্রকারের ভালোবাসা থাকবে না, থাকতে পারে না। বরং তাদের প্রতি থাকবে ঘৃণা, শত্রুতা ও বিদ্বেষ। এ বিষয়টিও কুরআন শরিফে সুস্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের আদর্শের কথা তুলে ধরে বলেছেন,

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.

'ইবরাহিম ও তার সাথে যারা ছিল, তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল—তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর, তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ উদ্রেক হল চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।' (সুরা মুমতাহিনা, আয়াত ৪)

এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, চিরকালের জন্য কাফেরদের সাথে মুমিনদের শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল, কোনো কাফের কখনও মুমিনের বন্ধু হতে পারে না এবং কাফেরের প্রতি মুমিনদের কোনো ভালোবাসা থাকতে পারে না।

এ সব কথার মূল উদ্দেশ্য হল প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা। লেখক আরিফ আজাদের 'প্যারাডক্সিক্যাল' বইটি বেশ চমৎকার। কিন্তু আলোচিত বিষয়টির ক্ষেত্রে তিনি মারাত্মক একটি ভুল করেছেন। তার বইয়ের প্রথম সংস্করণের ৫৮ পৃষ্ঠায় 'একটি সাম্প্রদায়িক আয়াত এবং...' শিরোনামে لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ আয়াতের মধ্যে 'আউলিয়া' শব্দের অর্থ বলেছেন 'অভিভাবক'। এরপর দাবি করেছেন— উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের মুমিনের অবিভাবক বানাতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু বন্ধু বানাতে নিষেধ করেননি।

প্রিয় পাঠক, উপর্যুক্ত কুরআনের আয়াতসমূহ থেকে এ কথা খুবই সহজে বুঝে আসে— আরিফ আজাদ ভাইয়ের এটি একটি মারাত্মক ভুল। তবু মুফাসসিরদের কিছু বক্তব্যের আলোকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

প্রথমেই একটি বিষয় সুস্পষ্ট করে নিই। 'আউলিয়া' শব্দটি 'ওলিউন' এর বহুবচন। আর 'ওলি' শব্দটি যেমন বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি অভিভাবক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আমি কোনো একটি অর্থকে নির্দিষ্ট করছি না। 'আউলিয়া' (اولياء) শব্দের অর্থ কেবল 'বন্ধু', 'অভিভাবক' অর্থ হতে পারে না, এমন কোনো দাবি আমি করছি না। আমার বক্তব্য হল দুটি :

১. অভিধানে 'ওলি' শব্দের মধ্যে যত অর্থেরই সম্ভাবনা থাকুক না কেন, কুরআনের আয়াত 'لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء' এর মধ্যে যে 'আউলিয়া' শব্দ ব্যবহার হয়েছে, এর অর্থ কি অভিভাবক? এবং আয়াতের মর্ম কি 'মুমিনগণ যেন কাফেরদেরকে অভিভাবক না বানায়' এমন? না। বিষয়টি কিছুতেই এমন নয়।

২. যদি ধরেও নিই—আয়াতের মর্ম তা-ই, যা উপরে বলা হয়েছে, তাহলে কি কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো যাবে? এ বিষয়ে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা-নিষেধ নেই? অবশ্যই আছে।

প্রথম কথা হল, তাফসিরের কিতাবগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এ কথা সুস্পষ্ট বোঝা যায়—উক্ত আয়াতে শুধু অভিভাবক বানাতেই নিষেধ করা হয়নি, বরং অভিভাবক বানানো নিষেধের পাশাপাশি বন্ধু বানাতেও নিষেধ করা হয়েছে। *তাফসিরে তাবারি*তে এই আয়াতের তাফসির ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই আয়াতে কাফেরদের সাথে কোমল আচরণ করতে এবং মুমিনদের ছাড়া কাফেরদের বন্ধু বানাতে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম তাবারির বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে— আয়াতে কাফেরদের সাথে সদয় আচরণ করতে এবং তাদেরকে বন্ধু মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। *তাফসিরে রাযি*তেও একই কথা বলা হয়েছে। *তাফসিরে তাবারি*তে সুরা নিসার ১৩৯ এবং ১৪৪ আয়াতেও আউলিয়া শব্দের ব্যাখ্যায়ও একই কথা বলা হয়েছে।

শুধু উল্লিখিত তাফসিরগুলোতেই নয়, বরং তাফসিরের প্রায় সব কিতাবেই অনুরূপ বলা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ কুরআনের যেখানে যেখানে ' لا يتخذ

المؤمنون الكافرين اولياء' আয়াতটি এসেছে, সেই আয়াতগুলোর কোনো নির্ভরযোগ্য তাফসির দেখে নিলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন।

হ্যাঁ, এ কথা ঠিক যে, কোনো কোনো তাফসিরে 'আউলিয়া' শব্দের ব্যাখ্যায় অভিভাবক না বানানোর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ কখনও এই নয় যে, তাদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়নি। বরং এর অর্থ অভিভাবক তো বানাবেই না, বন্ধুও বানাবে না। বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যদি উপরোক্ত আয়াতটি কোরআনের যত জায়গায় এসেছে সবগুলোর তাফসির দেখে নেওয়া যায়।

দ্বিতীয় কথা হল, যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, এই আয়াতে কেবল অভিভাবক বানাতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বন্ধু বানানোর ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি, তবুও এ কথা কখনও বলা যাবে না যে, একজন মুমিনের জন্য কোন কাফেরকে বন্ধু বানানো বৈধ। কেননা কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো যে অবৈধ, এটা অসংখ্য আয়াত ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। উপরে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে।

সারকথা হল, কাফেরদের বন্ধু কিংবা অভিভাবক কোনোটিই বানানো যাবে না। তবে মনে রাখতে হবে— কাফেরদেরকে বন্ধু বা অভিভাবক বানানো যাবে না—এ কথার অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি সদাচরণ করা যাবে না, বা তাদের সাথে কোনো প্রকারের সম্পর্ক রাখা যাবে না।

* * *

শেষ নবি মানা ও না মানা নিয়ে একটি বিভ্রান্তি

এক ভাই আমাকে একটি লিফলেট দেখালেন। লিফলেটে দেওবন্দিদের কিছু কুফরি আকিদা শীর্ষক আলোচনায় লেখা আছে— 'সাধারণ মানুষের কাছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন (শেষ নবি) হলেও বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে নয়।' নাউযুবিল্লাহ। (*তাহযিরুন্নাস*, কাসেম নানুতুবি, পৃ. ৩)

এমন একটি কথা যে কাউকে বিচলিত করবে। আমিও বিচলিত হয়েছি। *তাহযিরুন্নাস* গ্রন্থটি আমার সংগ্রহে ছিল। কিতাবটি খুলে আমি তো হতবাক! এ যে আগাগোড়াই মিথ্যাচার!

বিষয়টি বোঝার আগে নানুতুবি রহ. এর *তাহযিরুন্নাস* কিতাবটি লেখার প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। ঘটনা হল, নানুতুবি রহ. এর কাছে ইবনে আব্বাস রাযি.

থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াত সম্পর্কে ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল।[1] রেওয়ায়াতটি হল, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কুরআনুল কারিমের সুরা তালাকের ৬৫ নং আয়াত— اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ —'আল্লাহ সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীও সেই পরিমাণে'—সম্পর্কে বলেছেন, 'সাত জমিনের প্রতিটি জমিনে তোমাদের নবির মতো নবি আছেন এবং আদম আছেন তোমাদের আদমের মতো, ইবরাহিম আছেন তোমাদের ইবরাহিমের মতো এবং ঈসা আছেন তোমাদের ঈসার মতো।'[2]

এই রেওয়ায়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করলে প্রশ্ন জাগে— যদি আমাদের নবির মতো অন্য জমিনেও শেষ নবি থাকেন, তা হলে আমাদের নবি শেষ নবি হলেন কীভাবে? এ কারণেই অনেকে হাদিসটি অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কাসিম নানুতুবি রহ. এর কাছে যখন এই প্রশ্ন উত্থাপিত হল, তিনি হাদিসের এমন ব্যাখ্যা পেশ করলেন, যার কারণে আলোচনার মোড়ই পালটে গেল। এ যাবৎ আলোচনা চলে এসেছিল হাদিসটি সহিহ হবে কিনা তা নিয়ে, কিন্তু নানুতুবি রহ. এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদিসকে সহিহ মেনে নিলেও খতমে নবুয়ত তথা আমাদের নবি শেষ নবি হওয়ার মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকে না। এ ব্যাপারে তিনি প্রায় ৬৬ পৃষ্ঠার একটি কিতাব লিখে বিষয়টি বুঝিয়েছেন। তার সব আলোচনা এখানে পেশ করা তো সম্ভব নয়। এখানে কেবল ওই লিফলেটে যা আছে, তা সম্পর্কে আলোচনা করছি।

নানুতুবি রহ. তার কিতাবের শুরুতে বলেন, "প্রথমে কুরআনুল কারিমের আয়াত مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ—'মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।' (সুরা আহযাব, আয়াত ৪০) এর মধ্যে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' শব্দটির অর্থ বোঝা জরুরি, যেন উত্তর বোঝা সহজ হয়।"

তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের ধারণা অনুযায়ী 'খাতামুন নাবিয়্যিন' শব্দের অর্থ আমাদের নবি সকল নবির পরে এসেছেন, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ভালো করেই জানেন যে, শুধু কালের বিবেচনায় পিছনে আসা শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হতে পারে না। অথচ এই আয়াতটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার জন্য আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন। সুতরাং 'খাতামুন নাবিয়্যিন'

---

১. ওই ইস্তেফতারও একটি প্রেক্ষাপট আছে, যা এই ছোট পরিসরে উল্লেখ করছি না।

২. *মুসতাদরাকে হাকিম:* ২/৪৯৩ (হাকিম রাহি. এর সনদকে সহিহ বলেছেন, আর যাহাবি রাহি.-ও এতে একমত হয়েছেন। তা ছাড়া বাইহাকি রহ.-ও হাদিসকে সহিহ বলেছেন। দেখুন, *তাহযিরুন্নাস : এক তাহকিকি মুতালায়া:* ২০

অর্থ শুধু কালের দিক দিয়ে আমাদের নবি শেষে এসেছেন, তা নয়, বরং এর অর্থ আমাদের নবি মর্যাদার দিক দিয়ে 'খাতামুন নাবিয়্যিন'। কেননা আমাদের নবির নবুয়ত হল প্রকৃত, আর অন্যান্য নবির নবুয়ত হল আমাদের নবির কল্যাণেই।"

বিষয়টি তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, 'মনে করুন—সূর্যও আলোকময়, আবার ঘরবাড়িও আলোকময়। কিন্তু সূর্যের আলো তার নিজস্ব, আর ঘরবাড়ির আলো সূর্য থেকে গৃহীত। তেমনিভাবে আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন নবিদের ইমাম এবং নবিদের নবি। তার নবুয়ত হল প্রকৃত, আর অন্যান্য নবির নবুয়ত হল আমাদের নবির কল্যাণে এবং তারই মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা থেকে অর্জিত।' এরপর এ বিষয়ে তিনি অনেক প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। আগ্রহী পাঠকগণ নানুতুবি রহ. এর কিতাবটি দেখে নিতে পারেন।

তিনি বলেন, "মূলত আমাদের নবি মর্যাদার দিক দিয়ে অন্যান্য নবিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এ কথাটিই 'খাতামুন নাবিয়্যিন' এর মধ্যে বলা উদ্দেশ্য। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্ম যেহেতু অন্যান্য ধর্মের তুলনায় পরিপূর্ণ ও উত্তম, এবং অন্যান্য ধর্মকে রহিতকারী, তাই অন্যান্য রহিত ধর্মগুলো আগে প্রদান করে আমাদের নবির ধর্মকে শেষে প্রদান করলেন, যেন আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্যাদার দিক দিয়ে 'খাতামুন নাবিয়্যিন' হওয়ার পাশাপাশি কালের বিবেচনায়ও 'খাতামুন নাবিয়্যিন' হতে পারেন।"

প্রিয় পাঠক, নানুতুবি রহ. এর বক্তব্য আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছি। আগ্রহীগণ *তাহযিরুন্নাস* কিতাবটি পড়লে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট বুঝতে পারবেন। নানুতুবি রহ. এর উক্ত বক্তব্য থেকে কি এ কথা বোঝা যায়—আমাদের নবি 'খাতামুন নাবিয়্যিন' নয়?

লিফলেট প্রচারক নানুতুবি রহ. এর দিকে সম্বন্ধ করে যে কথাটি উল্লেখ করেছেন, এটা মূলত তার একটি কথার বিকৃতি। তার হুবহু উর্দু বক্তব্যটি হল,

سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونا بایں معنی کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔

উক্ত বক্তব্যের অনুবাদ এভাবে করা—'সাধারণ মানুষের কাছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যিন (শেষ নবি) হলেও বুজুর্গ ব্যক্তির কাছে নয়' সম্পূর্ণ ভুল। বরং এর সঠিক অনুবাদ হল, "সাধারণ মানুষের ধারণা অনুযায়ী 'খাতামুন নাবিয়্যিন' শব্দের অর্থ—আমাদের নবি সকল নবির পরে

এসেছেন, কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ভালো করেই জানেন যে, শুধু কালের দিক দিয়ে আগে-পরে হওয়া শ্রেষ্ঠত্বের কোনো কারণ হতে পারে না।"

লিফলেট প্রচারক নানুতুবি রহ. এর বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও ব্যাখ্যা উল্লেখ না করে শুধু বক্তব্যটুকু, তা-ও ভুল অনুবাদে প্রচার করলেন! খুবই দুঃখজনক। আল্লাহ তায়ালা সকল ধরনের ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।

* * *

কালিমা-সংশ্লিষ্ট একটি স্বপ্ন এবং বিভ্রান্তি

পূর্বের লেখায় যে লিফলেটের কথা বলা হয়েছে, তাতে এ কথাটিও ছিল—দেওবন্দি (কওমি)-দের আসল চেহারা; তাদের পুস্তকে—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশরাফ আলি রাসুলুল্লাহ।' আর 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা আশরাফ আলি' বলার মধ্যে সান্ত্বনা রয়েছে, এতে কোনো আপত্তি নেই। (*রিসালায়ে ইমদাদ*, পৃ. ৩৫, সফর ১৩৩৬ হিজরি সংখ্যা, আশরাফ আলি থানভি)

আশরাফ আলি থানভি রহ. কে যারা চিনেন, তাদের কাছে কোনো দলিল-প্রমাণ না থাকলেও এটা যে মিথ্যা অপবাদ, তা চোখ বুজেই বলতে পারবেন। তবু এই অপবাদের সূত্র খুঁজেছি এবং লিফলেটের বক্তব্যের সঙ্গে কোনোই মিল পাইনি।

রিসালায়ে ইমদাদে কী আছে, একটু লক্ষ করুন—

এক মুরিদ থানভি রহ. কে নিজের অবস্থা জানাচ্ছেন— তিনি এক রাতে স্বপ্নে 'কালিমা তয়্যিবা' পাঠ করতে লাগলেন। কিন্তু 'মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' এর স্থলে 'আশরাফ আলি রাসুলুল্লাহ' বলে ফেললেন। অনেক চেষ্টা করেও মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ বলতে পারলেন না। সজাগ হয়ে যখন খেয়াল হল মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, তিনি তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পড়তে লাগলেন। কিন্তু তখনও মুখ দিয়ে 'নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ' এর স্থলে—'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা আশরাফ আলি' বের হচ্ছিল। চেষ্টা করেও 'নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ' বলতে পারছিলেন না। এতে তিনি পেরেশান হয়ে কাঁদতে লাগলেন। এরপর হযরতের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বললেন—'এই ঘটনার মধ্যে এই সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, তুমি যার কাছে যাওয়া-আসা কর, আল্লাহর সাহায্যে তিনি সুন্নাহর অনুসারী।'

এই হল প্রকৃত ঘটনা। লিফলেটের উক্ত বক্তব্যের সাথে ঘটনার কী সম্পর্ক আছে? স্বপ্নে কেউ শরিয়তবিরোধী কিছু দেখলে বা করলেও কি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে? কেউ স্বপ্নে দেখল সে কাফের হয়ে গেছে, তাহলে কি সে কাফের হয়ে যাবে? অথবা কেউ যদি অস্ত্র হাতে নিয়ে অন্য একজনকে বলে—বল 'আমি কাফের।' লোকটি বাধ্য হয়ে বলল—'আমি কাফের', কিন্তু অন্তরে তার পূর্ণ ঈমান থাকে, তখন ওই লোক কি কাফের হয়ে যাবে? ওই মুরিদ স্বপ্নে ভুল কালিমা পড়েছেন এবং জাগ্রত হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে—'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা আশরাফ আলি' কথাটি বের হয়েছে, আবার এই অনাকাঙ্ক্ষিত কাজের জন্য তিনি অনেক কান্নাকাটিও করেছেন। এমতাবস্তায়ও কি তার ঈমান থাকবে না? لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا 'কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত চাপের সম্মুখীন করা হয় না' আয়াতটি তাহলে আর কার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হবে?

স্বপ্নের ব্যাখ্যা এমন একটি বিষয়, যা সবার পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর সাহাবায়ে কেরামের স্বপ্ন শুনে এর ব্যাখ্যা করতেন। এক্ষেত্রে আল্লামা ইবনে সিরিন রহ. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি খুবই অদ্ভুতও। কেউ স্বপ্নে দেখল তার ঘরে আগুন লেগেছে, বাহ্যিকভাবে এটা যদিও খারাপ, কিন্তু এর ব্যাখ্যা—তার ঘরের নিচে স্বর্ণ আছে। আবার কেউ আরও ভালো কিছু দেখল, কিন্তু সেটার ব্যাখ্যা হল সে কাফন চোর। ওই মুরিদ থানভি রহ. কে নিজের স্বপ্ন সম্পর্কে অবগত করলেন। হযরত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন। এতে কি ভুল হয়ে গেল?

কেউ পির-মুরিদি বিশ্বাস না করলে বা সহ্য করতে না পারলে সেটা তার ব্যাপার। তাই বলে এমন সরল বস্তুকে গরল ব্যাখ্যা দেওয়া, এমন নির্জলা অপবাদ রটনা করা কোনো সুস্থ বিবেকের কাজ হতে পারে না। আল্লাহ সবাইকে হিদায়াত দান করুন। আমিন।

* * *

কুরবানি ও 'শিরকে আসগর'

কুরবানি আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। সামর্থ্যবান সকল মুসলমানের উপর শর্তসাপেক্ষে কুরবানি ওয়াজিব। হাদিস শরিফে কুরবানির অনেক গুরুত্ব ও

ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا، أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا، وَأَظْلَافِهَا، وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا.

'কুরবানির দিন আদম সন্তান এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা মহামহিম আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত (কুরবানি) করার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। কেয়ামতের দিন কুরবানির পশুগুলো শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কুরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই (কুরবানি) মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব, তোমরা আনন্দ সহকারে কুরবানি কর।'[১]

সামর্থ্য থাকার পরও কুরবানি না দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। হাদিস শরিফে এ সম্পর্কে কঠিন ধমকির বাণী এসেছে। *সুনানু ইবনে মাজাহ* ও *মুসনাদু আহমদে* হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে— রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا.

'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।'[২]

এই যে আল্লাহর রাহে কুরবানি, এই যে তার আদেশে পশু জবাই, এর পিছনে আল্লাহর কী উদ্দেশ্য? আল্লাহর কাছে কুরবানির গোশত, রক্ত ইত্যাদি কোনো কিছু কি পৌঁছায়? তা হলে কেন এই মাল খরচ? কেন এই ত্যাগ?

হ্যাঁ, অবশ্যই এতে আল্লাহর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআনের ভাষায় শুনুন সেই উদ্দেশ্য। সুরা হজের ৩৭ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ.

'আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এগুলোর গোশত ও রক্ত। বরং তার কাছে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।'

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ১৪৯৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*: ৩১২৬

২. *মুসনাদু আহমাদ*: ৮২৭৩; *সুনানে ইবনে মাজাহ*: ৩১২৩

এই হল কুরবানির উদ্দেশ্য। সুতরাং কার অন্তরে কতটুকু তাকওয়া আছে, সেটা পরীক্ষা হবে কুরবানির মধ্য দিয়ে। কে কত টাকা দিয়ে পশু ক্রয় করেছেন, কার গরু কতটুকু মোটা-তাজা, সেটা এখানে মুখ্য নয়।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, কুরবানির মতো পবিত্র একটি ইবাদত, যার উদ্দেশ্যই হল তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ, সেটাই আজ রিয়া এবং লোক দেখানোর মহড়ায় পরিণত হয়েছে। কারও কারও কুরবানির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে এটাই প্রতীয়মান হয়। আমার কাছাকাছি ঘটে যাওয়া দুটি চিত্র বলছি।

এক. এক ভাই খুবই অভাবগ্রস্ত। একসময় অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণী। পরিবারের দৈনন্দিন খাবারের ব্যবস্থা করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে শুনলাম— তিনিও নাকি কুরবানি দিয়েছেন! জিজ্ঞেস করলাম— 'তার আর্থিক এই দুরবস্থায় আবার কুরবানি!' তিনি বললেন, 'লজ্জা! লজ্জার ভয়ে! লোকে বলবে—অমুকে কুরবানি দেয়নি, এজন্য বাধ্য হয়ে ঋণ করে কুরবানি দিতে হচ্ছে।'

দুই. ছেলেকে বিদেশে পাঠানোর জন্য একজনের ব্যাংকে টাকা আছে। তিনি কুরবানি দেবেন না, টাকা খরচ হয়ে যাবে এই ভয়ে। নিকটাত্মীয় একজন তাকে বোঝালেন—আপনার উপর যেহেতু কুরবানি ওয়াজিব, তাই না দিলে গুনাহ হবে। সুতরাং একটি ছাগল হলেও কুরবানি দিন, অথবা কারও সাথে গরুতে শরিক হোন। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি রাজি হলেন। বের হলেন গরু কিনতে।

ঘটনা শুনে আমি বললাম—এটা কেমন হল? কুরবানি দেবেন না, একটি ছাগলও না; টাকা খরচ হয়ে যাবে! এখন দেবেন তো গরুই দেবেন। পয়সাই যখন বাঁচানোর ইচ্ছা, একটি ছাগল কুরবানি দিলেই তো হয়। তিনি বললেন, 'আশপাশের সবাই গরু কুরবানি দেবে, আমি একা কীভাবে ছাগল কুরবানি দেবো' এই লজ্জায় তিনি গরু কুরবানি করছেন!

উল্লিখিত দুটিমাত্র চিত্র তুলে ধরলাম। এ ধরনের অসংখ্য চিত্র আমাদের আশপাশে রয়েছে, যেগুলো দেখে সুস্পষ্ট বোঝা যায়, এই কুরবানিগুলোর উদ্দেশ্য কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি কিংবা তাকওয়া অর্জন নয়, যা কুরবানির মূল লক্ষ্য। বরং এগুলোর উদ্দেশ্য লোকদেখানো ও লোক-লজ্জা থেকে বাঁচা।

ভাবনার বিষয় হচ্ছে, ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান পালনে এই যাদের মানসিকতা, তারা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছেন! কুরবানি তো হচ্ছেই না, উপরন্তু এই

লোক দেখানো কুরবানির কারণে তারা 'রিয়া' নামক অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন। হাদিস শরিফে এই রিয়াকে 'শিরকে-আসগর' বা 'ছোট শিরক' বলা হয়েছে।

মুসনাদে আহমদে হযরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি 'শিরকে-আসগরে'র ভয় করি।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেন— "আল্লাহর রাসুল, 'শিরকে-আসগর' কী?" নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—"'শিরকে-আসগর' হল রিয়া। যেদিন আল্লাহ তায়ালা বান্দার আমলের প্রতিদান দেবেন, সেদিন (যারা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করে, তাদের) বলবেন, 'দুনিয়ায় তোমরা যাদেরকে তোমাদের ইবাদত দেখাতে, তাদের কাছে যাও। দেখো, তারা এর কোনো প্রতিদান দেয় কিনা!"

যারা লোকদেখানো এবং লোক-লজ্জার ভয়ে কুরবানি করেন, তারা একটু ভেবে দেখবেন কি!

* * *

ফাসাদ ফিল-আর্দ : একটি বিভ্রান্তি

কোনো মুরতাদ, ইসলামবিদ্বেষী কিংবা রাসুলকে কটূক্তিকারী ও রাসুলের কুৎসা রচনাকারীর উপর আঘাত আসলে অনেক ভাইকে খুব জোরগলায় এই আয়াতটি বলতে শোনা যায়—

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا.

'যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে অন্য প্রাণের বিনিময় ব্যতীত হত্যা করে, কিংবা তার দ্বারা ভূপৃষ্ঠে কোনো ফিতনা ফাসাদ বিস্তার ব্যতীত হত্যা করে, তা হলে সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করে ফেলল।' (সুরা মায়েদা, আয়াত ৩২)

উপরোক্ত আয়াতে যে أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ 'ভূপৃষ্ঠে ফাসাদ বিস্তার করা'র কথা এসেছে, এর দ্বারা আসলে কী বোঝানো হয়েছে? এর ব্যাখ্যা কী?

ইসলামবিদ্বেষীদের সাথে উঠাবসা আছে, এমন মুসলিম নামধারী লোকেরা দৃঢ়তার সাথে বলে থাকেন, ওই সকল লোকদের উপর আক্রমণ করা 'ফাসাদ ফিল-আর্দ' এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কাউকে হত্যা করল, সে যেন সমস্ত মানুষকে হত্যা করল! আমাদের ঘরানার অনেক ভাইও ইদানীং এমন কথা

বলে থাকেন। অথচ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যে লোকটি কটূক্তি করল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দিল, সেটা তাদের দৃষ্টিতে 'ফাসাদ ফিল-আর্‌দ' এর আওতায় পড়ে না!

এ প্রসঙ্গে আমার মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক দামাত বারাকাতুহুম এর আলোচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তার *ঈমান সবার আগে* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩) বলেন,

''যে কোনো ইরতিদাদ সাধারণ কুফর থেকে ভয়াবহ। সাধারণ কুফর তো হচ্ছে সত্য দ্বীন থেকে বিমুখ থাকা বা গ্রহণ না করা। কিন্তু ইরতিদাদ নিছক বিমুখতাই নয়, এ হচ্ছে বিরুদ্ধতা। সত্য দ্বীন গ্রহণ করার পর তা বর্জনের অর্থ ওই দ্বীনকে অভিযুক্ত করা, যা নির্জলা অপবাদ। বরং ইরতিদাদ তো সত্য দ্বীনের প্রতি বিরুদ্ধতার পাশাপাশি **'ইফসাদ ফিল-আর্‌দ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতি)-ও বটে।** বিশেষত মুরতাদ (সত্য দ্বীন ত্যাগকারী) যখন কটাক্ষ-কটূক্তি এবং অবজ্ঞা-বিদ্রুপে লিপ্ত হয়। এ তো সরাসরি 'মুহারিব' (যুদ্ধঘোষণাকারী) ও 'মুফসিদ ফিল-আর্‌দ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতিকারী)''

তিনি আরও বলেন,
''বিশেষত যে নাস্তিক বা মুরতাদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটূক্তি করে কিংবা ইসলামের নিদর্শনের অবমাননা করে, সে তো সরাসরি 'মুফসিদ ফিল-আর্‌দ' (ভূপৃষ্ঠে দুষ্কৃতিকারী)। এ ব্যক্তি রাসুল-অবমাননাকারী হিসেবেও 'ওয়াজিবুল-কতল' (অপরিহার্যভাবে হত্যাযোগ্য) এবং দুষ্কৃতিকারী হিসেবেও।''

* * *

ফখরুদ্দিন রাযি রহ. কে জড়িয়ে একটি বিভ্রান্তি

এক ভাই লিখেছেন, "ফারায়েয শাস্ত্রের ইমাম ফখরুদ্দিন রাযির বক্তব্য—'আদম আলাইহিস সালাম অবাধ্য ছিলেন। আর অবাধ্য হওয়াকে আমরা কবিরা গুনাহ মনে করি।' (*ইছমতে আম্বিয়া*, পৃ. ৩৬)

উল্লিখিত কথাটি আল্লামা রাযির নামে জঘন্যতম একটি মিথ্যাচার। ঘটনা হল, আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. তার *ইসমাতুল আম্বিয়া* গ্রন্থে প্রথমে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং ফেরেশতাদের মাসুম (নিষ্পাপ) হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। এরপর

বিভিন্ন বাতিল ফেরকা—যারা নবিদের মাসুম মানে না, তাদের দলিল উল্লেখ করে এগুলোর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'জেনে রেখো, এ ব্যাপারে (নবিদের মাসুম হওয়া) প্রতিপক্ষের সংশয় অনেক। আমি সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি।'

এরপর তিনি আদম আলাইহিস সালাম এর প্রসঙ্গ টেনে তাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে— 'তারা বলে, কুরআনুল কারিমে এসেছে—وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আদম আলাইহিস সালাম অবাধ্য ছিলেন। আর অবাধ্য ব্যক্তি অবশ্যই কবিরা গুনাহকারী।' অর্থাৎ, ফখরুদ্দিন রাযি খণ্ডনের লক্ষ্যে তাদের বক্তব্যটি উল্লেখ করেছেন আর তাদের বক্তব্যটিকেই ফখরুদ্দিন রাযি রহ. এর মত বলে প্রচার করা হয়েছে! অথচ ইমাম রাযি রহ. তার *তাফসিরে কাবিরে* বলেছেন, 'কুরআনুল কারিমের আয়াত থেকে যদিও বাহ্যত বোঝা যায় যে, আদম আলাইহিস সালাম অবাধ্য ছিলেন, কিন্তু কারও এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, বাস্তবে তিনি অবাধ্য ছিলেন।'

এরপর তিনি তার এ দাবির স্বপক্ষে কয়েকটি দলিলও পেশ করেছেন।[১]

---

১. *আত-তাফসিরুল কাবির*, ইমাম রাযি রাহি.: ২২/১২৮

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি

পির-মুরিদি : কিছু ভ্রান্তি, কিছু বিভ্রান্তি

এক. কুরআনে কারিমে সুরা শামসের ৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قد افلح من زكها

'যে নফসকে পবিত্র (শুদ্ধ) করেছে, সে সফলকাম।'

হযরত নোমান ইবনে বশির রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

'শুনে রেখো! মানব শরীরে একটি গোশতের টুকরো আছে, যা ঠিক হয়ে গেলে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যায়। আর তা নষ্ট হয়ে গেলে পুরো শরীরটাই নষ্ট হয়ে যায়। শুনে রেখো! সেই টুকরোটি হচ্ছে কলব।'[১]

লক্ষ করুন, কুরআনুল কারিমের আয়াত এবং উপরোক্ত হাদিসে নফস বা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে! অপর দিকে কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাকওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর এই আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের লক্ষ্যে নেককার ও মুত্তাকি লোকদের সোহবত-সংশ্রব অবলম্বনের অপর নামই আমাদের কাছে 'পির-মুরিদি' বা 'তাসাওউফ' নামে পরিচিত।

দুই. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তায়ালা তিনটি দায়িত্ব দিয়েছেন। সুরা বাকারার ১৫১ আয়াতে আল্লাহ বলেন,

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ أَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

---

১. *সহিহ বুখারি: ৫২; সহিহ মুসলিম: ১৫৯৯*

‘যেমন আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসুল, যিনি তোমাদের কাছে আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের তাযকিয়া তথা তোমাদেরকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করবেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ)।’

উপরোক্ত আয়াত, সুরা বাকারার ১২৯ নং আয়াত, সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত এবং সুরা জুমুআর ২ নং আয়াতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত ও রিসালাতের তিনটি গুরুদায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক. তোমাদেরকে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে শোনাবেন (অর্থাৎ কুরআন শরিফের আয়াতসমূহ যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, হুবহু সহিহ-শুদ্ধভাবে তা তেলাওয়াত করা শিক্ষা দেবেন)।

খ. তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ)।

গ. তৃতীয় গুরুদায়িত্বটি হচ্ছে তাযকিয়া।

তাযকিয়া কী? তাযকিয়ার অর্থ অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মানুষের আত্মাকে পবিত্র করা। অর্থাৎ শিরক, কুফর এবং ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাস থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। অহংকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের মোহ ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্র করা। এসব পরিহারপূর্বক আল্লাহর একত্ববাদ এবং সঠিক আকিদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা, বিনয়, যুহদ ও দুনিয়াবিমুখতা, আল্লাহর মহব্বত ইত্যাদি গুণাবলি দ্বারা অন্তরকে সুসজ্জিত করা।

তিন. পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট— সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন-সুন্নাহর তালিমের পাশাপাশি তাদেরকে আত্মিকভাবে শুদ্ধির কাজ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই করতেন। প্রশ্ন হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী সময়ে এই দায়িত্বগুলো কে পালন করবে? তার উম্মতকে এগুলো কে শিক্ষা দেবে? বলাবাহুল্য, নবিজির উত্তরসূরীরাই এই দায়িত্ব পালন করবে।

আলহামদুলিল্লাহ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিসগণ সেই দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন করেছেন। তারা উম্মতকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি সুচারুরূপে কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা এবং তাযকিয়ার কাজটিও করেছেন।

কিন্তু সাহাবি, তাবেয়িন ও সালফে-সালেহিনের যুগে কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষার জন্য আজকের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না। বরং কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিশাল মজমা হত। এ দুটির জ্ঞান অর্জনের

জন্য কোনো কোনো আলেমের দরসে লক্ষাধিক মানুষও জড়ো হত। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। সেখানে সহিহ-শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি কিতাব ও হিকমত তথা কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

কিন্তু নবিজির তৃতীয় গুরুদায়িত্ব 'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধির জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। তাই অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে অনেক আল্লাহওয়ালা, মুত্তাকি আলেম ও ওলিদের মাধ্যমেই সেই গুরুদায়িত্ব পালন হচ্ছে। আর সেটাই আমাদের কাছে তাসাওউফ ও পির-মুরিদি হিসেবে পরিচিত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরবর্তী কালে কুরআন-সুন্নাহর উপর আমলকারী যে ব্যক্তি এই তৃতীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দেন, তাকেই আমরা পির বলি।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা এবং কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান শিক্ষার জন্য যে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে এক শ্রেণির অসাধু লোকেরা যেমন তাদের দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের আত্মিক শুদ্ধির জন্য যে পির-মুরিদির আবির্ভাব, এটাকেও অনেকে তাদের ব্যাবসা বানিয়ে নিয়েছে। পির-মুরিদির নামে তারা বিভিন্ন ধরনের শিরক-বেদআতের প্রচার করছেন।[১]

তাই বলে আমরা আত্মশুদ্ধির মেহনত এবং পির-মুরিদি ছাড়তে পারি না। বরং কুরআন তেলাওয়াত এবং কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান আহরণের জন্য আমরা যেমন যাচাইবাছাই করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই, তেমনিভাবে তাযকিয়ার জন্যও হকপন্থি কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে (পির) খুঁজে তার কাছে সোপর্দ হয়ে আত্মশুদ্ধির মেহনত করতে হবে।

চার. কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা সাদিকিনদের সংস্পর্শ গ্রহণ করার আদেশ করেছেন। সুরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।'

সাদিকিন হচ্ছেন তারাই, যারা তাদের কথায়, কাজে এবং নিয়তে সাদিক বা সত্যনিষ্ঠ। সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াত এবং সুরা আহযাবের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ সাদিকিনের যে পরিচয় দিয়েছেন, তদানুযায়ী এক কথায় মুত্তাকিগণই হচ্ছেন সাদিক।

---

১. পির-মুরিদির নামে কী পরিমাণ বাড়াবাড়ি হয়, সামনে এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে।

আল্লাহ তায়ালা সাদিকিন তথা নেককার লোকের সংস্পর্শ গ্রহণ করার আদেশ দেওয়ার কারণ হল, তাদের সংস্পর্শের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়। সুরা তাওবার ১১৯ নং আয়াতে তিনি প্রথমে তাকওয়া অর্জনের কথা বলেছেন, এরপর সাদিকিনদের সংস্পর্শ অর্জনের কথা বলেছেন। মুফাসসিরগণ বলেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে— সাদিকিনদের সংস্পর্শের মাধ্যমে তাকওয়া অর্জিত হয়।

এ ছাড়াও অসংখ্য হাদিসে নেককারদের সংস্পর্শ গ্রহণের তাগিদ এসেছে। যেমন আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِ.

'সৎ সঙ্গের উপমা হল মেশকবহনকারীর ন্যায়। যদি মেশক না-ও পাও, ঘ্রাণ তো অবশ্যই পাবে।'[১]

পাঁচ. আয়াত ও হাদিসে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্যে নেককার, মুত্তাকি লোকদের সংস্পর্শ গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। তবে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে— আত্মশুদ্ধি যদিও ফরজ, কিন্তু পিরের মুরিদ হওয়া ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত কোনোটিই নয়। কেউ যদি নিজে নিজে আত্মশুদ্ধি এবং তাকওয়া অর্জন করে ফেলে, তাহলে তো হলই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে— নিজে নিজে এ কাজ সমাধা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। এজন্য একজন মুরুব্বি অর্থাৎ দিকনির্দেশক প্রয়োজন, যিনি নিজে কুরআন-সুন্নাহর উপরে পুরোপুরি আমল করেন। তাই কোনো আল্লাহওয়ালার সাহচর্য গ্রহণ করা জরুরি।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যেতে পারে। দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করা ফরজ, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সকল ফর্মালিটি রক্ষা করা ফরজ নয়। যেমন ভর্তি হতে হবে, প্রতি বছর এতগুলো কিতাব পড়তে হবে, পাশ করলে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে ইত্যাদি কোনোটিই ফরজ নয়। ঠিক তেমনি 'তাযকিয়ায়ে নফস' বা আত্মশুদ্ধি ফরজ হলেও কোনো পিরের মুরিদ হওয়া ফরজ, ওয়াজিব কোনোটিই নয়। মুরিদ হওয়ার বিষয়টি কেবল ফর্মালিটি রক্ষা; শিক্ষা অর্জনের জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার মতো। প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এবং সেখানকার ফর্মালিটি রক্ষা করা যেমন বেদআত নয়, তেমনিভাবে কারও মুরিদ হওয়া এবং এ সংক্রান্ত ফর্মালিটি রক্ষা করাও বেদআত নয়। বাইয়াত বা মুরিদ হওয়া বেদআত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ খোদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত করেছেন। সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে।

---

১. *সুনানে আবু দাউদ: ৪৮২৯; সহিহ বুখারিতেও* (৫৫৩৪) এ মর্মে হাদিস রয়েছে। এ ছাড়াও এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস রয়েছে।

বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কবলে তাসাওউফ ও পির-মুরিদি

আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে একটি মধ্যপন্থি উম্মত বানিয়েছেন। কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

'এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থি উম্মত বানিয়েছি, যাতে তোমরা অন্যান্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসুল হন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।' (সুরা বাকারা, আয়াত ১৪২)

অর্থাৎ অন্যান্য উম্মতের তুলনায় এই উম্মতকে সর্বাপেক্ষা মধ্যপন্থি এবং ভারসাম্যপূর্ণ উম্মত বানিয়েছেন। তাই এই উম্মতকে এমন বাস্তবসম্মত বিধানাবলি দেওয়া হয়েছে, যা কেয়ামত পর্যন্ত মানবতার সঠিক দিকনির্দেশনা করতে সক্ষম। অন্যান্য উম্মতের মতো মুসলমানদের এমন বিধান দেওয়া হয়নি, যা অতি কঠিন কিংবা অতি শিথিল। এই উম্মত বিশ্বাসে, কর্মে, ইবাদতে, মোটকথা সর্বক্ষেত্রেই ভারসাম্যপূর্ণ। এই উম্মত পূর্ববর্তী উম্মতের মতো আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করেনি, নবিদের হত্যা করেনি, আল্লাহর কিতাব পরিবর্তন করেনি। বোঝা গেল— সর্বক্ষেত্রেই ভারসাম্যতার পরিচয় দেওয়া এই উম্মতের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং ধর্মীয় সকল বিধান পালনের ক্ষেত্রে এ কথা ভুলা যাবে না— আমরা হলাম মধ্যপন্থি জাতি। তাই আমাদের থেকে যেন কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি কিংবা শিথিলতা প্রকাশ না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, আমাদের কিছু ভাই এক দিকে যেমন বিভিন্ন ইবাদতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত, অপর দিকে কিছু ভাই ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতায় অভ্যস্ত। তাসাওউফ ও পির-মুরিদির বিষয়টিও অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত হতে পারেনি।

উদাহরণস্বরূপ— কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন, কোনো পির সাহেবের হাতে বাইয়াত হওয়া বা কারও মুরিদ হওয়ার নামই তাসাওউফ ও পির-মুরিদি। আবার কেউ কেউ মনে করেন, নির্ধারিত কিছু ওযিফা আদায় করা, কিছু জিকির-আজকার করা এবং নির্জনতার নামই তাসাওউফ। তাই কোনো শায়খের মুরিদ হওয়ার পর ফরজ, ওয়াজিবে ত্রুটি, আর্থিক খেয়ানত, বান্দার হক নষ্টসহ অসংখ্য বড় বড় কবিরা গুনাহ করার পরও এমন লোককে অনেক বড় বুজুর্গ মনে করা হয়। এমনও লোককে পির মনে করা হয়— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

সুন্নতের উপর যার কোনো আমল নেই। মুখে দাড়ি নেই। পর্দার হুকুম অমান্য করে। মহিলাদের সরাসরি বাইয়াত করে। সুন্নাহর অনুসারী না হয়েও কাশফ ও অলৌকিক কিছু দেখাতে পারা বুজুর্গির আলামত মনে করা হয়। লেনদেন পরিষ্কার নয়, হারাম ভক্ষণেও কোনো দ্বিধা নেই—এমন ব্যক্তিকেও পির মনে করা হয়। স্বপ্ন, কাশফ, ইলহামকে শরিয়তের দলিল মনে করা হয়। পির সাহেবের কথা এবং কাজকেও দ্বীনের স্বতন্ত্র দলিল মনে করা হয়। তার সকল কথা ও কাজকে অনুসরণীয় মনে করা হয়। কেউ পির সাহেবের 'খেলাফত' পেলে মনে করা হয়— তিনি কামেল, এখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চললেও তিনি বুজুর্গ। কেননা তিনি অমুক পিরের খলিফা।

পির-মুরিদির নামে এ ধরনের আরও অনেক বাড়াবাড়ি রয়েছে আমাদের সমাজে। এটি তাসাওউফ ও পির-মুরিদির প্রকৃতি নয়। এরচেয়ে আরও মারাত্মক হল, পির-মুরিদির নামে আজ মানুষ ঈমানহারা হচ্ছে। পির সাহেবকে লাভ-ক্ষতি সাধনের মালিক, উদ্ধারকর্তা ও ত্রাণকর্তা মনে করা হচ্ছে। কিংবা তার মাজারে স্বীয় প্রয়োজনাদি কামনা করা হচ্ছে এবং বিপদাপদে তাকে যপা হচ্ছে। তার নামে মানত ও পশু জবাই করা হচ্ছে। তাকে মনে করা হচ্ছে হেদায়াতের মালিক। পির সাহেব নিজ ক্ষমতায় মুরিদকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারেন—এই বিশ্বাস রাখা হচ্ছে। তার ব্যাপারে 'হুলুল' তথা আল্লাহর সত্তা পিরের মধ্যে বিলীন হয়ে একাকার হয়ে যাওয়ার আকিদা পোষণ করা হচ্ছে। পিরের কবর তওয়াফ করা, সিজদা করা, কবরকে উপলক্ষ্য করে বার্ষিক ঈদ উদ্‌যাপন করা, হজের ন্যায় জীবজন্তু সঙ্গে নিয়ে সেখানে সফর করা —পির-মুরিদির নামে এ সবকিছুই হচ্ছে। অথচ এগুলো সুস্পষ্ট শিরক। এ ধরনের আরও অনেক শিরক ও কুফর প্রচার করা হচ্ছে পির মুরিদির নামে। আটরশি, রাজারবাগী, দেওয়ানবাগী, কুতুববাগীসহ মানুষের ঈমান লুণ্ঠন করার জন্য এরকম আরও অনেক বাগী রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এগুলো থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

এ হল তাসাওউফ ও পির-মুরিদির নামে বাড়াবাড়ির খতিয়ান। বেদআত এবং শিরক প্রচারের আলোচনা—যা সম্পূর্ণ ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়। প্রকৃত পির-মুরিদির সাথে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। এর বিপরীত আমাদের কিছু ভাই উক্ত বিষয়টি নিয়ে ছাড়াছাড়ি ও শিথিলতার ভ্রান্তিতে রয়েছেন। তারা উপরোক্ত বাড়াবাড়ি দেখে তাসাওউফ এবং পির-মুরিদির বিষয়টিই অস্বীকার করে বসে আছেন। তাদের দাবি— পির-মুরিদির কথা কুরআন হাদিসে নেই। এসব সম্পূর্ণ বেদআত! পির-মুরিদি একটি ধান্ধা!

আমার দ্বীনি ভাই, একটু থামুন! একটু ধীরে সিদ্ধান্ত নিন। পির এবং মুরিদ শব্দ দুটো কুরআন-হাদিসে নেই, তা আমরাও জানি। কিন্তু হকপন্থিগণ যে তাসাওউফের কথা বলেন, এবং তারা পির-মুরিদির নামে যা করেন, এগুলো কি কুরআন-হাদিসে নেই? তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির কথা কি কুরআন-হাদিসে নেই? ইখলাস ও সৎগুণাবলি (যেমন তাকওয়া, সবর, বিনয়, নামাজে একাগ্রতা, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত, লেনদেন পরিষ্কার করা, সততা, আমানতদারী, বান্দার হক আদায় ইত্যাদি) অর্জন করা এবং দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা (যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া, সম্পদের লোভ, মান-সম্মানের মোহ অন্যান্য আত্মিক রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া, কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে দূরে থাকা) এগুলোর কথা কি কুরআন-হাদিসে নেই?

অবশ্যই আছে। হকপন্থিগণ যে তাসাওউফের কথা বলেন, তা ওই জিনিসগুলো অর্জন ও বর্জনেরই নাম। অর্থাৎ সকল ভালো গুণ অর্জন এবং সকল খারাপ দোষ বর্জনের ট্রেনিংয়ের নামই তাসাওউফ ও পির-মুরিদি।

পির শব্দের ক্ষেত্রে আপত্তি থাকলে আপনি পির না বলে দিকনির্দেশক, পথপ্রদর্শক, আত্মশুদ্ধিতে সাহায্যকারী ইত্যাদি যে কোনো শব্দ বলতে পারেন। পির এবং মুরিদ শব্দ দুটো কুরআন-হাদিসে না থাকার কারণে যদি এ বিষয়টিই অস্বীকার করেন, তাহলে কি নামাজ-রোজাও অস্বীকার করবেন? কেননা কুরআন শরিফের কোথাও নামাজ-রোজা শব্দ নেই। আর থাকবে কীভাবে? দুটি শব্দই তো ফার্সি। হয়ত বলবেন—না থাক, এর পরিবর্তে সালাত এবং সাওম শব্দ তো আছে। আমার ভাই! পির-মুরিদির ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা কুরআন-হাদিসে পির-মুরিদ শব্দ না থাকলেও তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি এবং সৎগুণ অর্জন করা এবং সকল দোষ বর্জন করার আলোচনা রয়েছে। আর এটাকেই হকপন্থিগণ পির-মুরিদি নাম দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সঠিক বিষয়টি বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

* * *

প্রচলিত বাইয়াত কি বেদআত?

অনেকে মনে করেন, পির ও সুফিদের মধ্যে প্রচলিত বাইয়াতের শরয়ি কোনো ভিত্তি নেই। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। প্রথমত মনে রাখতে হবে, তাসাওউফের প্রসিদ্ধ বাইয়াত, খেলাফত—এ জাতীয় বিষয়গুলো শরিয়তে কোনো জরুরি বিষয় নয়। শরিয়তের মূল দাবি হচ্ছে—আত্মশুদ্ধি। কেউ যদি কারও কাছে বাইয়াত না হয়েই যে কোনোভাবে আত্মশুদ্ধি করে নেয়, তাহলে তো হলই। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রচলিত বাইয়াত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ হাদিস শরিফে এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট দলিল পাওয়া যায়।

একটি হাদিস দেখুন। সাহাবি মুজাশি রাযি. বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ أُبَايِعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ.

‘আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের জন্য বাইয়াত হতে এলাম। তিনি বললেন, সুনির্দিষ্টভাবে মদিনায় হিজরতের বিধান শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইসলাম, জিহাদ এবং কল্যাণের কাজের জন্য বাইয়াত করার সুযোগ রয়েছে।’[১]

লক্ষ করুন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাইয়াতের পাশাপাশি আরেকটি বাইয়াতের কথা বলেছেন। সেটি হচ্ছে, কল্যাণের কাজের জন্য বাইয়াত। পির-সুফিদের বাইয়াত এই প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাদের বাইয়াতের মূল বক্তব্যই হচ্ছে ‘সৎকাজ করব, অসৎ কাজ করব না।’ আর এটিই হাদিসের বক্তব্য। *সহিহ মুসলিমের* ব্যাখ্যাকার শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. বলেন, “এই হাদিসে খায়র তথা ভালো কাজ করা এবং গুনাহের কাজ না করার উপর বাইয়াত গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। আর এর দ্বারা সুফিদের নিকট পরিচিত ‘বাইয়াতুস-সুলুক’র বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম ও জিহাদের জন্য বাইয়াতের পাশাপাশি ‘খায়র’ তথা কল্যাণের উপর বাইয়াতের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন।”[২]

তবে মনে রাখতে হবে, এই বাইয়াত ফরজ-ওয়াজিবের মতো কোনো বিষয় নয়। এ প্রসঙ্গে থানভি রহ. বলেন, ‘এটি (বাইয়াত) ফরজ, ওয়াজিব বা সুন্নতে

---

১. *সহিহ বুখারি:* ৪৩০৮, *সহিহ মুসলিম:* ৪৭৯০
২. *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম:* ৩/৩০৮

মুয়াক্কাদা হওয়ার কোনো দলিল নেই। তবে কতিপয় হাদিসে এ ধরনের বাইয়াতের কথা আছে, যার দ্বারা এই বাইয়াত মুস্তাহাব পর্যায়ের সুন্নত প্রমাণিত হয়। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের বাইয়াতের ব্যাপারে মুদাওয়ামাত (সব সময়) করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তা ছাড়া তার যুগে হাজারো মুমিন এমন পাওয়া যাবে, যারা তার হাতে এই বিশেষ পদ্ধতির বাইয়াত হননি।'

তিনি আরও বলেন, 'মোটকথা এই যে, সুফিদের নিকট প্রচলিত বাইয়াতের বাস্তবতা মুস্তাহাবের বেশি কিছু নয় এবং তার বিশেষ রূপ ও অবস্থা মুবাহ বা বৈধতার চেয়ে বেশি নয়। কাজেই এটাকে কাজে-বিশ্বাসে অধিক মর্যাদা দেওয়া, যেমন বাইয়াতকে নাজাতের শর্ত মনে করা অথবা এর পরিত্যাগকারীকে তিরষ্কার করা—এ সবই বেদআত এবং দ্বীনি বিষয়ে সীমালঙ্ঘন।'

কেউ যদি জীবনে কখনও প্রচলিত পদ্ধতিতে কারও হাতে বাইয়াত না হয়, বরং নিজেই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে, অথবা ওলামায়ে কেরামের নিকট থেকে জেনে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে শরিয়তের বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করে, তা হলে সে-ও মুক্তিপ্রাপ্ত, মাকবুল ও নৈকট্য অর্জনকারীদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গিয়েছে— আমল ও ইসলাহের যে স্তর শরিয়তে কাম্য, তা কোনো কামেল বুজুর্গের তরবিয়ত ব্যতীত সচরাচর হাসিল হয় না; কিন্তু তার জন্য প্রচলিত বাইয়াত শর্ত নয়। প্রয়োজন হল কোনো কামেল বুজুর্গের সংশ্রব ও সাহচর্য। তার মহব্বত, অনুসরণ-অনুকরণ। তৎসঙ্গে ইসলাহ ও তরবিয়তের চিন্তাফিকির ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা।[১]

মুহতারাম উস্তাদ মাওলানা আব্দুল মালেক দা. বা. বলেন, "এ কথা সুস্পষ্ট—খেলাফত ও ইজাযতের মধ্যে কোনো বুজুর্গি নেই, বরং হাক্কানি বুজুর্গগণ যার মধ্যে মুসলেহ ও মুরশেদ, তথা সংশোধক ও পথপ্রদর্শক হওয়ার শর্ত ও গুণাবলি দেখতে পান, তাকে খেলাফত ও ইজাযত দানে ধন্য করেন। সুতরাং খেলাফত মুসলেহের যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, খেলাফত ও ইজাযত যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। যেমন পড়াশুনা শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এই সার্টিফিকেট ছাত্রের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে না, বরং যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতেই সার্টিফিকেট পেয়ে থাকে। খেলাফত ও ইজাযতের বিষয়টিও তদ্রূপ। আর খেলাফতদাতা বুজুর্গগণ যেহেতু গায়েব জানেন না যে, তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সুন্নত ও শরিয়তের উপর অটল থাকবেন, নাকি তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে,

---

১. *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*, পৃ. ৭৬

তাই উনারা সাধারণত উপস্থিত বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ করে ইজাযত ও খেলাফত প্রদান করে থাকেন। আর এ বিষয়টি তাদের নিকট স্বীকৃত—পির সাহেবের মাঝে কামেল পিরের শর্তাবলি আছে কিনা, তার খোঁজ নেওয়া ওই ব্যক্তির জিম্মায় জরুরি, যে বাইয়াত হবে।

হাকিমুল উম্মত হযরত থানভি রহ. বলেন, 'যেমন পাঠ্যবিদ্যা শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সার্টিফিকেট প্রদান করায় এখন তার মধ্যে বিদ্যার পূর্ণতা অর্জিত হল; বরং কেবল এই ধারণার ভিত্তিতে সনদ, তথা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় যে, এসব বিদ্যার সাথে তার এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যদি এখন থেকে সে নিয়মিত অধ্যয়নে মশগুল থাকে, তাহলে আশা করা যায় তার পূর্ণতা অর্জন হবে।"[1]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, সুলুকের বাইয়াতকে ভিত্তিহীন বলার যেমন সুযোগ নেই, তেমনিভাবে এটিকে ফরজ-ওয়াজিবের মতো আবশ্যক কোনো বিষয় মনে করারও সুযোগ নেই।

* * *

তওবা কি করানোর বিষয়?

আমাদের সমাজে তওবা করানোর একটি প্রথা চালু আছে। অন্তিম শয্যায় শায়িত অথবা অচিরেই ফাঁসি হবে—এমন ব্যক্তিকে তওবা করানোর বিষয়টি আমাদের সমাজে বেশ প্রচলিত। এই যে তওবা করানো বা তাওবা পড়ানো, এর কোনো ভিত্তি আছে কি?

তওবার হাকিকত যারা বুঝেন, তওবা কাকে বলে—এটা যারা জানেন, তাদের কাছে এ কথা সুস্পষ্ট— তওবা করানো বা পড়ানোর মতো কোনো বিষয় নয়। বরং তওবা হল কৃত অপরাধের ব্যাপারে বান্দার অনুশোচনা তৈরি হওয়া। বর্তমানে অপরাধ ত্যাগ করা, নিজের অতীত কর্মের উপর লজ্জিত হওয়া, ভবিষ্যতে অপরাধ না করার সংকল্প করা। এই তো হল তওবা। কেউ আপনাকে পুথির মতো কিছু শিখিয়ে দিল, আর আপনি তার শিখিয়ে দেওয়া বুলি শুনে শুনে পাঠ করলেন, কিন্তু মনের মধ্যে কোনো অনুশোচনাই তৈরি হল না, এটা কোনো তওবা নয়। কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় এটাকে তওবা বলা যায় না।

---

১. *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*: ১৫৩-১৫৪

এ ক্ষেত্রে আমাদের তওবার হাকিকত বুঝতে হবে। জানতে হবে তওবার ফজিলত। মন থেকে অপরাধের প্রতি ঘৃণা তৈরি করতে হবে, অতীতের অপরাধের উপর লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাহলেই ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যেতে পারে, আল্লাহর কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা যেতে পারে। নতুবা অন্তরের অনুশোচনা ছাড়া কেবল প্রচলিত এই সামাজিক প্রথার পিছনে পড়ে কাঙ্ক্ষিত তওবা অর্জন হবে না।

অবশ্য কেউ তার মৃত্যুশয্যায় বাস্তবেই যদি আল্লাহর ভয়ে নিজের অপরাধের পরিণাম ভেবে তওবার প্রয়োজন বোধ করে (কেবল সামাজিক প্রথা হিসেবে নয়), আর এ জন্য কোনো আলেমকে ডেকে এনে তওবা করানোর আবেদন করে, তাহলে এটিও একটি প্রশংসনীয় কাজ বলেই বিবেচিত হবে। কারণ তার দ্বীনের জ্ঞান না থাকার কারণে যদিও সে তওবার হাকিকত বুঝতে পারেনি, কিন্তু আল্লাহকে ভয় পেয়েছে। সে তার অপরাধের কারণে লজ্জিত হয়েছে এবং পরিণাম ভেবে শঙ্কিত হয়েছে। আর তওবা তো মূলত অপরাধের কারণে লজ্জিত হওয়া এবং অনুশোচনারই নাম।

তবে মসজিদের ইমাম কিংবা যে কোনো আলেমকে যখন কেউ তওবা করানোর জন্য ডাকে, তখন তাকে তওবার হকিকত বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। যেন কেবল সামাজিক প্রথা হিসেবেই তওবা না করা হয়। বাস্তবেই যেন তার অন্তরে অপরাধের জন্য অনুশোচনা আসে এবং প্রকৃত অর্থেই তওবা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে সঠিক অর্থে তওবা করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

* * *

ধর্মীয় বিষয়ে স্বপ্ন এবং কাশফ কি গ্রহণযোগ্য?

ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক ভাই স্বপ্ন এবং কাশফকে দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন। কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত বিষয়ের উপরও স্বপ্ন এবং কাশফ দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আবার কেউ কেউ মুখে না বললেও কার্যত এগুলোকেই অগ্রগণ্য মনে করেন। কোথাও হয়ত পেয়েছেন— অমুক বুজুর্গ এই দোয়া বা এই দরুদটি স্বপ্নে পেয়েছেন। ব্যস, এটা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে গেছেন। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত

যেসব দোয়া ও দরুদ সহিহ সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং বেশিরভাগ সময় সেগুলোই পড়া যুক্তির দাবি।

এ কথা বলছি না— কাশফ ইত্যাদির দ্বারা প্রকাশিত বিষয়গুলোর উপর আমল করা যাবে না। মূল কথা হল, এগুলোতে শরিয়তবিরোধী কোনো কিছু থাকলে তার উপর আমল করার প্রশ্নই উঠে না। আর যদি শরিয়তবিরোধী কোনো কিছু না থাকে, তাহলে আমল করতে বাধা নেই। তবে এখানেও দুটি বিষয় মনে রাখতে হবে—

এক. আমরা বিভিন্ন বুজুর্গের দিকে সম্বন্ধিত এ সকল ঘটনাকে অস্বীকার করি না। তবে এ সকল ঘটনা কিংবা কাশফ যে বাস্তবে হয়েছে, এর নিশ্চয়তা তো থাকতে হবে। তাই এগুলোর সনদ যাচাই করতে হবে। এর অর্থ এই নয়—যে সকল বুজুর্গ বা ওলির ক্ষেত্রে এসব ঘটনা ঘটেছে, তারা নিজেরা এগুলো বানিয়ে নিয়েছেন! বরং আমাদের সন্দেহের কারণ হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.

'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'[১]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এমন কঠিন সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও যখন তারই উম্মতের একদল লোক তার নামে জাল হাদিস তৈরি করতে দ্বিধা করল না, সেখানে কেউ কোনো বুজুর্গ বা ওলির নামে (বিশেষ কোনো আমলের ফজিলত প্রমাণ করার জন্য এ ধরনের কোনো জাল ঘটনা তৈরি করা কি অসম্ভব?

এর মানে এই নয় যে, এ সকল ঘটনা কিংবা কাশফ বর্ণনা করা ঠিক নয়, বা এগুলো সব জাল। আলোচনার উদ্দেশ্য হল, বর্তমানে আমাদের মধ্যে এই প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে, আমরা বিভিন্ন আমলের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন জাল হাদিস এবং এ ধরনের ঘটনাগুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে থাকি। আর সাধারণ মানুষকেও এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগী হতে দেখা যায়। অথচ আমলের ফজিলত বর্ণনা করার জন্য এবং মানুষকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. *সহিহ বুখারি:* ১০৭

ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদিস রয়েছে। আরও আছে নবিজির সিরাত, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও সালফে সালেহিনের জীবনী। এগুলো পড়ে আমরা নিজেরাও উদ্বুদ্ধ হতে পারি এবং অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু আমরা এগুলোকে ততটুকু গুরুত্ব দিই না, যতটুকু পূর্বোক্ত বিষয়গুলোকে দিয়ে থাকি। অথচ একদিকে এগুলোর সনদ আমরা যাচাই করি না, অপর দিকে এ সকল ঘটনার মধ্যে শয়তানের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কারও হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে— অনেক ঘটনাই তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে এভাবে করতে বলেছেন বা কিছু পড়তে বলেছেন। আর শয়তান নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকৃতি ধারণ করতে পারে না। সুতরাং তার হস্তক্ষেপের সুযোগ কোথায়?

এ কথা সঠিক। কেননা সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে—'শয়তান নবিজির আকৃতি ধারণ করতে পারে না।'[১] কিন্তু এই হাদিসে কেবল আকৃতি ধারণ করতে পারবে না, এ কথা বলা হয়েছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এ কথা বলা হয়নি। যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে কাউকে বললেন—মদ পান করো না, কিন্তু শয়তান শোনাল—পান করো। এমনটি হওয়া অসম্ভব নয়; বরং এ ধরনের ঘটনা বাস্তবে ঘটেছে।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি রহ. উল্লেখ করেন— এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল— রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন, اشرب الخمر। 'তুমি মদ পান করো।' তখন আলি মুত্তাকি রহ. জীবিত ছিলেন। তার নিকট স্বপ্নের তাবির (ব্যাখ্যা) জানতে চাইলে তিনি বললেন, অবশ্যই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لا تشرب الخمر 'মদ পান করো না।' আর শয়তান তোমার নিকট ব্যাপারটি পালটে দিয়েছে। তা ছাড়া ঘুমের সময় ইন্দ্রীয় ও অনুভূতি শক্তি লোপ পায়। জাগ্রত অবস্থায়ই যেহেতু কোনো বহিরাগত কারণ বা শ্রোতার নিজের কারণে বক্তার বক্তব্যের বিপরীত শ্রবণ করার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং নিদ্রাবস্থায় তো এটি আরও স্বাভাবিক।

---

১. *সহিহ বুখারি:* ৬৯৯৩; *সহিহ মুসলিম:* ২২৬৬

দুই. এ সকল ঘটনা যদি সহিহ সূত্রে বর্ণিত হয়েও থাকে, তাহলেও এর গুরুত্ব কখনও নির্ভরযোগ্য হাদিসে বর্ণিত ফজিলতের চেয়ে অগ্রগণ্য তো দূরের কথা, সমানও হতে পারে না। এই বিষয়গুলো খেয়াল রেখে স্বপ্ন, কাশফ ইত্যাদি গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

* * *

'ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম' —হাদিসটি কি সহিহ?

সাধারণত তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বোঝাতে এ কথাটি বেশ জোরেশোরে প্রচার করা হয়—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নফসের জিহাদ তথা আত্মশুদ্ধিকে বড় জিহাদ বলেছেন। বলেছেন—'ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম।' বড় জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—নফসের সাথে জিহাদ, আর ছোট জিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে—কাফেরদের সাথে জিহাদ।

এমনকি কেউ কেউ আরেকটু অগ্রসর হয়ে আত্মশুদ্ধির চেষ্টাকারী ব্যক্তিকে 'মুজাহিদ' নামে আখ্যায়িত করেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী মুজাহিদের যত ফজিলত হাদিসে উল্লেখ হয়েছে, সেগুলোকে আত্মশুদ্ধির চেষ্টাকারী 'মুজাহিদ' ব্যক্তির জন্য প্রয়োগ করেন। কারও কারও কথা থেকে অনুমিত হয়—জিহাদ ছেড়ে কেবল তাসাওউফে লেগে থাকাই শ্রেয়, আর এ কথাটিই যেন হাদিসের উদ্দেশ্য। অথচ উপরোক্ত কথাটি বাস্তবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস কিনা, আর হাদিস হলেও এর উদ্দেশ্য এবং ব্যাখ্যা কী, আমরা তা জানার প্রয়োজন বোধ করি না। কাজেই এ বিষয়ক কিছু অস্পষ্টতা নিরসন করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথম কথা হল, হাদিসের প্রসিদ্ধ কোনো গ্রন্থে এ হাদিসটি পাওয়া যায় না। তবে ইমাম বাইহাকি রহ. তার *আয-যুহদুল কাবির* গ্রন্থে (পৃ. ১৬৫) উল্লেখ করেছেন, হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একদল মুজাহিদ এলে তিনি বললেন, 'তোমাদের আগমন শুভ হয়েছে। তোমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এসেছ।'

জিজ্ঞেস করা হল, 'বড় জিহাদ কোনটি?' নবিজি উত্তরে বললেন— 'কুপ্রবৃত্তির সাথে জিহাদ করা।'[১]

একই সূত্রে খতিব বাগদাদি রহ. তার *তারিখু বাগদাদ* (১৫/৬৮৫) এবং ইবনে জাওযি রহ. তার *যাম্মুল হাওয়া* গ্রন্থে (পৃ. ৬৩-৬৪) হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু হাদিসটির সনদে ইয়াহইয়া ইবনে আলা (يحي بن العلاء)[২] নামক বর্ণনাকারী নেহায়েত দুর্বল। কেউ কেউ তার ব্যাপারে মিথ্যা বলার অভিযোগও করেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন— 'সে একজন মিথ্যাবাদী, সে জাল হাদিস বর্ণনা করত।' আর ইবনে আদি রহ. বলেছেন—'তার হাদিসসমূহ জাল।'[৩]

একদিকে হাদিসটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য নয়, উপরন্তু হাদিসের বক্তব্যও অন্যান্য সহিহ হাদিস ও কুরআনের আয়াতের বিপরীত। তাই অসংখ্য মুহাদ্দিস উল্লিখিত হাদিসকে জাল ও ভিত্তিহীন বলেছেন। এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের কয়েকটি বক্তব্য তুলে ধরা হল,

---

১. ولفظه: قَدِمَ النَّبِيُّ، مِنْ غَزَاةٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ: قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ، وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الأَكْبَرِ". قَالُوا: وَمَا الْجِهَادُ الأَكْبَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ.

২. *তারিখু বাগদাদ* ও *যাম্মুল হাওয়া* গ্রন্থে লাইস ইবনে আবু সুলাইম থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তির নাম এসেছে ইয়াহইয়া ইবনে আলা, যিনি একজন মিথ্যাবাদী রাবি। কিন্তু বাইহাকির *আয-যুহদুল কাবির* (পৃ. ১৬৫) এবং আবু বকর আশ-শাফিয়ি রাহি. এর *আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত* গ্রন্থে (যেমনটা আলবানি রাহি. তার *আস-সিলসিলাতুয যয়িফা* গ্রন্থের ৫/৪৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন) ইয়াহইয়া ইবনে আলা (يحي بن العلاء) এর পরিবর্তে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা (يحي بن يعلى) এসেছে। ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা একজন নির্ভরযোগ্য রাবি। ইবনে মাঈন রাহি. তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান রাহি. *আস-সিকাত* গ্রন্থে তার নাম উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইয়াহইয়া ইবনে আলা (يحي بن العلاء) একজন মিথ্যাবাদী।

এখন আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হব? বিষয়টির সমাধানের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে— হাদিসটি কেবল 'লাইস ইবনে আবি সুলাইম' এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'লাইস' থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তি কে? ইয়াহইয়া ইবনে আলা (يحي بن العلاء), নাকি ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালা? —উভয় রকমই বর্ণিত হয়েছে। আর ইয়ালা (يعلى) এবং আলা (العلاء) কাছাকাছি শব্দ। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে— বর্ণনাকারী মূলত দুজনের একজন হবেন। কাছাকাছি শব্দ হওয়ার কারণে কিতাবের অনুলিপিকারী অথবা নিচের দিকের কোনো বর্ণনাকারী হয়তো ভুলবশত একটির জায়গায় আরেকটি বলে ফেলেছেন।

তবে যতটুকু মনে হয়— 'লাইস' থেকে বর্ণনাকারী ব্যক্তি (يحي بن العلاء) ইয়াহইয়া ইবনে আলা-ই হবে, যে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। কারণ তার হাদিসটি যদি নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিস হতই, তাহলে সেটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হত এবং তার সূত্র ছাড়াও অন্য সূত্রেও বর্ণিত হত। তদ্রুপ মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসের ব্যাপারে বলতেন না যে, এটি ভিত্তিহীন। তা ছাড়া হাদিসটির মতনও মুনকার ও আপত্তিজনক এবং বাহ্যত কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত। সুতরাং এমন রেওয়ায়াত (يحي بن يعلى) ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ালার মতো নির্ভরযোগ্য রাবির বর্ণনা হতে পারে না; বরং (يحي بن العلاء) ইয়াহইয়া ইবনে আলার মতো নেহায়েত দুর্বল ও মিথ্যাবাদী রাবির বর্ণনা হবে, এটাই স্বাভাবিক।

৩. বিস্তারিত দেখুন, *তাহযিবুত তাহযিব*, ইবনে হাজার: ৪/৩৮০

* ইবনে তাইমিয়া রহ. তার *মাজমুউল ফাতাওয়া* গ্রন্থে (১১/১১১) বলেন, 'হাদিসটির কোনো ভিত্তি নেই। কোনো আলেমই এটাকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা হিসাবে উল্লেখ করেননি।'[১]

* আল্লামা সুয়ুতি রহ. বলেন, 'মারফু হিসেবে (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হিসেবে) এটি আমার জানা নেই।'[২]

* মোল্লা আলি কারি রহ. তার জাল হাদিসের গ্রন্থ *আল-আসরারুল মারফুআয়* (১/২০৬) হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। আর জানা কথা, তিনি তার কিতাবে ওই সকল হাদিসই উল্লেখ করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে—'এর কোনো ভিত্তি নেই', অথবা যেগুলো মূলত জাল। যেমনটা তিনি তার কিতাবের ভূমিকায় (১/১) উল্লেখ করেছেন।

* আবুল মুজাফফার সামআনি রহ. তার *তাফসিরুল কুরআন* গ্রন্থে (৩/৪৫৮) বলেন, এটি 'গারাইবুল আখবার' (বিরল হাদিসসমূহ) এর মধ্যে একটি।

* মাহমুদ আলুসি রহ. তার *তাফসির রুহুল মাআনি* গ্রন্থে সুরা নিসার ৯৬ নং আয়াতের আলোচনায় বলেন, 'মুহাদ্দিসিনে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী হাদিসটি ভিত্তিহীন।'

* যাইলায়ি রহ. *তাখরিজুল কাশশাফ* গ্রন্থে (২/৩৯৫) বলেন, হাদিসটি অত্যন্ত বিরল।

* হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার *তাসদিদুল কাওস* গ্রন্থে এটাকে ইবরাহিম ইবনে আবলা তাবিয়ির বক্তব্য বলেছেন।[৩] একইভাবে নাসায়ি রহ.-ও তার *আল কুনা* গ্রন্থে ইবরাহিম ইবনে আবলার বক্তব্য হিসেবে কথাটি উল্লেখ করেছেন।[৪] আর *এহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে (৬/৩৯৭ মাআ ইতহাফিস সাদাহ) কথাটি সাহাবাদের বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে।

---

১. ولفظه: أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك {رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر} فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال: بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان

২. সুয়ুতি রহ. এর এই বক্তব্যটি মুনাবি রহ. তার তাফসিরে বায়যাবির তাখরিজের গ্রন্থ 'আল ফাতহুস সামাওয়ি'তে (১/৫১৪) উদ্ধৃত করেছেন।

৩. *আদ-দুরারুল মুনতাছিরা*, আল্লামা সুয়ুতি: ১২৫

৪. *মাজমুউল ফাতাওয়া*: ১১/১১১; *তাহযিবুল কামাল*, ২/১৪৪

এ ছাড়াও অনেক মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসকে নিতান্তই দুর্বল বলেছেন। আর কেউ কেউ তো সুস্পষ্ট ভিত্তিহীন বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হিসেবে এর কোনো ভিত্তি নেই। বরং কারও কারও মতে এটি ইবরাহিম ইবনে আবলা নামক শামের এক তাবেয়ির বক্তব্য। আর কারও মতে এটি কোনো সাহাবির বক্তব্য।

যদি এই বক্তব্যটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য হিসেবে ধরেও নেওয়া হয়, তবুও যে অর্থে বক্তব্যটি পেশ করা হয়, সেটি কখনও হাদিসের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে—

ক. কুরআন কারিমে সুরা নিসার ৯৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট বলেছেন— যারা জিহাদ করে, আর যারা ঘরে বসে থাকে, উভয়ে সমান হতে পারে না। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীদের 'দারাজাহ' বা মর্যাদা অনেক উঁচু।

ইবনে তাইমিয়া রহ. উক্ত হাদিসকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে বলেন, 'জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল।' এরপর অন্যান্য ইবাদতের চেয়ে জিহাদের ফজিলত বেশি হওয়াসংক্রান্ত আয়াত ও হাদিস পেশ করেন।[১] সুতরাং আত্মশুদ্ধি যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ, তথাপি জিহাদের সাথে এর কোনো তুলনা হয় না।

খ. এক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় হল, নফসের সাথে মুজাহাদা করার প্রয়োজন সাধারণত নফসের অপছন্দনীয় বস্তুর ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। নফস চায় সেগুলো করতে, তখন খুবই কষ্ট করে নফসকে বারণ করতে হয়। আর জিহাদ হচ্ছে নফসের কাছে খুবই অপছন্দনীয় এবং অপ্রিয় একটি বিষয়। আল্লাহ তায়ালা সুরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, অথচ এটি তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়।' আর যারা যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের সাথে জিহাদ করে, একই সাথে তাদের নফসের সাথেও জিহাদ হয়, আবার কাফেরদের সাথেও শারীরিক জিহাদ হয়। সুতরাং যারা কাফেরদের সাথে জিহাদে যায়নি, তাদের তো এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, যারা জিহাদে রয়েছে তাদের তুলনায় আমরা বড় জিহাদ নিয়ে বসে আছি।

---

১. ولفظه: أما الحديث الذي يرويه بعضهم أنه قال في غزوة تبوك {رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر} فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل المعرفة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وجهاد الكفار من أعظم الأعمال: بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم...

হ্যাঁ, যারা কাফেরদের সাথে ময়দানে জিহাদ করে, আবার জিহাদ শেষে বাড়িতে এসেও নিজের নফসের সাথে মুজাহাদায় মগ্ন থাকে, কখনও নফসের ইচ্ছাকে পূরণ হতে দেয় না, এমন ব্যক্তি তার দুই অবস্থার মাঝে তুলনা করে বলতে পারে—ময়দানে গিয়ে জিহাদের চেয়ে সব সময় নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বারণ করাই বেশি কষ্টদায়ক। এটিই বেশি বড় জিহাদ। তবে তা প্রতিদানের দিক দিয়ে নয়; বরং কষ্টের দিক দিয়ে বেশি বড়। কেননা জিহাদ হয় অল্প সময়ের জন্য। আর নির্ধারিত একটি সময়ে কোনো কাজ সম্পাদন করার তুলনায় সর্বদা কোনো কাজে লেগে থাকা অনেক কঠিন। তাছাড়া জিহাদ যদিও আল্লাহর বিধান হিসেবে নফসের কাছে অপছন্দনীয়, তথাপি দুশমনকে পরাজিত করার জন্য নফসের একটা আগ্রহ থাকে, যা সব সময় নামাজ-রোজা ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রে থাকে না। তাই ময়দানের জিহাদের চেয়ে সব সময় নফসের সাথে মুজাহাদা করা তুলনামূলক কঠিন।

গ. কথাটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই সকল সাহাবিকে বলেছিলেন, যারা জিহাদ থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন। যারা একই সাথে কাফেরদের সাথেও জিহাদ করেছেন, আবার নফসের সাথেও জিহাদ করেছেন। সুতরাং আমরা যারা জিহাদে না গিয়ে কেবল নফসের জিহাদে বসে আছি, আমাদের জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি কখনও প্রযোজ্য নয়।

ঘ. এসব ব্যাখ্যার প্রয়োজন তখনই হবে, যখন কথাটিকে বাস্তবেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ধরে নেওয়া হবে। অথচ ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—মুহাদ্দিসিনে কেরাম এটাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। সুতরাং এসব ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নেই।

* * *

ফাযায়েল

এক জন আলেম চল্লিশ জনের এবং এক জন হাফেজ দশ জনের সুপারিশ করবে, কথাটির বাস্তবতা কতটুকু?

আলেম এবং হাফেজের ফজিলত অস্বীকার করার উপায় নেই। কুরআন এবং হাদিসে আলেম ও হাফেজের অসংখ্য ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আলেমের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কুরআন কারিমের এই একটি আয়াতই যথেষ্ট—

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ.

'আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, উভয়ে কি সমান হতে পারে?' (সুরা যুমার, আয়াত ৯)

হাফেজের মর্যাদা ঘোষণা করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এমতাবস্থায় যে, সে কুরআনের হাফেজ, সে লিপিকার সম্মানিত ফেরেশতার মতো। আর যে ব্যক্তি খুব কষ্টদায়ক হওয়া সত্ত্বেও বার বার কুরআন মাজিদ পাঠ করে, সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাবে।'[১]

হাফেজ এবং আলেমের ফজিলত অনস্বীকার্য। এখানে তাদের ফজিলত বর্ণনা করা আমার মূল উদ্দেশ্য নয়। আলোচনার বিষয় হল, কুরআনের হাফেজ এবং আলেমের শাফাআত বা সুপারিশ করা নিয়ে।

প্রথম কথা হল, শাফাআত বা সুপারিশ শরিয়তে হক (সত্য) ও প্রমাণিত একটি বিষয়। এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তবে এর মানে এই নয়—যে কোনো ব্যক্তি যে কারও ব্যাপারে শাফাআত বা সুপারিশ করতে পারবে। বরং আল্লাহ তায়ালা যাদের শাফাআত করার অনুমতি দেবেন কেবল তারাই শাফাআত করতে পারবেন, আর যাদের জন্য শাফাআতের অনুমতি দেবেন, শুধু তাদের ব্যাপারেই সুপারিশ করতে পারবেন।

---

১. *সহিহ বুখারি: ৪৯৩৭; সহিহ মুসলিম: ৮০০*

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিশেষ কিছু সুপারিশ করার অধিকার রয়েছে। এই অনুমতি আল্লাহ তায়ালা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কাউকে দেননি। যেমন কেয়ামতের দিবসে ফয়সালা শুরু করা, জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশের শাফাআত। এসব ব্যাপারে হাদিসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। আর গুনাহ মাফ করা, ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করা এবং মর্যাদা সুউচ্চ করার জন্য শাফাআতের অধিকার আল্লাহ তায়ালা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও দান করেছেন। ফেরেশতাদের, শহিদদের এবং আল্লাহর কিছু নেক বান্দাকে সেই অধিকার দিয়েছেন। হাদিস শরিফে এমনও বর্ণিত হয়েছে— 'আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশের মাধ্যমে বনি তামিম গোত্রের (যারা সংখ্যায় অনেক বেশি) লোকদের সংখ্যার চেয়েও বেশি লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১]

হাসান বসরি রহ. এর মতে একজন মুমিন, মুত্তাকি নেক বন্ধুও সুপারিশকারী হবে। দলিল হিসেবে তিনি সুরা শুআরার ১০১ এবং ১০২ নং আয়াত উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.

'অতএব, আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই এবং কোনো সহৃদয় বন্ধুও নেই।'

মোটকথা, অনেকেই শাফাআতের অনুমতি পাবে। তবে বিশেষভাবে আলেমের সুপারিশসংক্রান্ত কিছু হাদিস পাওয়া যায়, যেগুলো নিতান্তই দুর্বল। অবশ্য যেখানে মুমিন-মুত্তাকি অনেকেই সুপারিশকারী হতে পারবে, সেখানে একজন মুত্তাকি আলেম সুপারিশকারী হতে পারাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে— প্রসিদ্ধ সেই কথাটি নিয়ে। অর্থাৎ একজন আলেম কি তার গোত্রের চল্লিশজনের ব্যাপারে সুপারিশকারী হবে?

এ সম্পর্কে কোনো একটি হাদিস কিংবা কোনো প্রকারের দলিল পাওয়া যায় না। সুতরাং ভিত্তিহীন কোনো কথা প্রচার করা আমাদের জন্য কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না। আর যদি এমন ভিত্তিহীন কথা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হিসেবে প্রচার করা হয়, তাহলে নবিজির ভাষ্য অনুযায়ী উক্ত প্রচারকারীর ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তাই এ ধরনের জাল ও ভিত্তিহীন কথা পরিহার করা আবশ্যক।

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ২৪৩৮

তবে কুরআনের হাফেজদের শাফাআত করার ব্যাপারে হযরত আলি রাযি. এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তা হেফজ রেখেছে, কুরআনের হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মেনেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার শাফাআত কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য ছিল।'[১]

উপরোক্ত হাদিসটি নেহায়েত দুর্বল। হাদিসের একজন রাবি হচ্ছেন—হাফস ইবনে সুলাইমান। তিনি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম বুখারি, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসায়ি-সহ অনেকেই তাকে 'মাতরুক' তথা পরিত্যাজ্য বর্ণনাকারী (অত্যন্ত দুর্বল রাবি) বলেছেন। আর ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. ও ইবনে খিরাশ রহ. তাকে 'মিথ্যাবাদী' বলেছেন। আরও বলেছেন—সে হাদিস জাল করত। হাকিম আবু আহমদ বলেন, তার হাদিসগুলো নিতান্তই দুর্বল।[2]

এই হচ্ছে উল্লিখিত হাদিসের একজন বর্ণনাকারীর অবস্থা। উপরন্তু কাসির ইবনে যাযান নামক আরেকজন মাজহুল তথা অপরিচিত বর্ণনাকারীও উপরোক্ত হাদিসের সনদে রয়েছেন।

ইমাম তিরমিজি রহ. উপরোক্ত হাদিস সম্পর্কে কী বলেছেন। তিনি বলেন, 'হাদিসটি গরিব (বিরল)। উল্লিখিত সূত্র ছাড়া এই হাদিসের অন্য কোনো সূত্র আমাদের জানা নেই। এর সনদ সহিহ নয়। হাফস ইবনে সুলাইমান হাদিস শাস্ত্রে দুর্বল।'

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল, দুর্বল হাদিস যদিও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু মুহাদ্দিসিনে কেরাম তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত দিয়েছেন। একটি শর্ত হল, হাদিসটি নেহায়েত দুর্বল না হওয়া। উপরে উক্ত হাদিসের সনদ সম্পর্কে যে পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে, এর আলোকে এ কথা সুস্পষ্ট—আলোচিত হাদিসটি ফাজায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতো মানের নয়।

---

১. *মুসনাদে আহমদ*: ২/৪১৬; *সুনানে তিরমিজি*: ২৯০৫

২. *তাহযিবুত তাহযিব*: ১/৪১২

সারকথা হল, একজন আলেম তার গোত্রের চল্লিশজনের ব্যাপারে সুপারিশ করবে, এ কথার নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য কোনো ভিত্তিই নেই। আর হাফেজের দশজনের ব্যাপারে সুপারিশ করার হাদিসটিও নেহায়েত দুর্বল হওয়ার কারণে অনুল্লেখযোগ্য। অথচ আলেম এবং হাফেজের সুপারিশের ব্যাপারটি মানুষের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন বিষয়টি সহিহ হাদিস এবং অকাট্য দলিলের দ্বারা সুপ্রমাণিত।

সহিহ হাদিসে আলেম এবং হাফেজের ফজিলতের অনেক বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং আলেম ও হাফেজের ফজিলত প্রমাণের জন্য এ ধরনের নেহায়েত দুর্বল কথা প্রচারের কোনো প্রয়োজন নেই। তদ্রুপ হাফেজ ও আলেমের পিতামাতা এবং তাদের অভিভাবকের ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টিও স্বীকৃত। তাদের ফজিলত প্রমাণের জন্য এমন কথা প্রচারের প্রয়োজন নেই। পিতামাতা ও অভিভাবকের ফজিলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে— তারা নিজেদের সন্তানকে ইলম অর্জন এবং কুরআন হিফজের সুযোগ করে দিয়েছেন। হতে পেরেছেন তাদের ইলম শিখার মাধ্যম। তাই হাফেজ এবং আলেমগণ কুরআন হিফজ করে এবং ইলম অর্জন করে যে সাওয়াব পাবেন, তাদের পিতামাতা এবং অভিভাবকগণও তেমন সাওয়াব পাবেন।

এক্ষেত্রে আরও কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় রয়েছে—

ক. শাফাআত ও সুপারিশ যে হক ও প্রমাণিত বিষয়, আখেরাতে শাফাআতের কারণে কিছু লোক যে নাজাত পাবে এবং কারও কারও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এর অর্থ কি এই—আমরা সেই শাফাআতের উপর নির্ভর করে বসে থাকব এবং অহরহ আল্লাহর আদেশ অমান্য করতে থাকব আর মনে মনে বলব—আখেরাতে অমুকের সুপারিশে পার পেয়ে যাব! এমনটা কখনও কাম্য নয়। কারণ, শাফাআত যদিও প্রমাণিত বিষয়, কিন্তু যে কারও ব্যাপারেই যে শাফাআত করা যাবে, বিষয়টি এমন নয়। বরং ওই সকল লোকেরাই শাফাআতপ্রাপ্ত হবে, যাদের আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেছেন। কুরআনে কারিমে সুরা আম্বিয়ার ২৮ নং আয়াতে বলেন,

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى.

‘রাসুলগণ শুধু তাদের ব্যাপারেই সুপারিশ করবে, যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেছেন।’

সুতরাং উপরোক্ত হাদিসকে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য ধরে নিয়ে যদি বলা হয়—একজন হাফেজ তার পরিবারের দশজনের ব্যাপারে সুপারিশ করবে, তথাপি অহরহ আল্লাহর আদেশ অমান্য করে শাফাআত প্রাপ্তির আশা করার কোনো সুযোগ নেই। বরং শাফাআতের আশা কেবল সে-ই করতে পারে, যে আল্লাহর সকল আদেশ-নিষেধ মান্য করার পাশাপাশি এই ভয়ে থাকে যে, কখনও আল্লাহর ইচ্ছার খেলাফ কাজ প্রকাশ পেয়ে গেল কিনা! কোনো অপরাধের কারণে পাকড়াও করে ফেলেন কিনা!

খ. এমন কিছু ধারনা করারও অবকাশ নেই—তিরমিজির আলোচিত হাদিসটি জাল ও পরিত্যাজ্য। ফজিলত বর্ণনা এবং মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বা আশা জাগানোর জন্যও হাদিসটি উল্লেখ করা যাবে না। তবে খেয়াল রাখতে হবে— এ জাতীয় কথা বেশি বেশি প্রচার করার কারণে সাধারণ মানুষ এগুলোকে সহিহ হাদিস এবং অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের মতো মনে করে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ না মেনে গুনাহের কাজে জড়ানো সত্ত্বেও কেবল এক ছেলেকে হাফেজ বানিয়েছে কিংবা আলেম বানিয়েছে—এর উপর নির্ভর করে বসে থাকে। আর আশা করতে থাকে—যতই গুনাহ করি না কেন, নিজের ছেলে বা আত্মীয়ের সুপারিশে আমি পার পেয়ে যাব। এ ধরনের ভুল চিন্তা দূর করাই এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

গ. লক্ষ করুন, হাফেজের সুপারিশসংক্রান্ত হাদিসটিতেই এ কথা এসেছে—তার নিজের জান্নাতে যাওয়াটাও হালাল-হারাম মেনে চলার উপর নির্ভরশীল। সেখানে আপনি-আমি হালাল-হারামের কোনো তোয়াক্কা না করে কীভাবে তার সুপারিশে জান্নাত লাভের আশা করে বসে থাকতে পারি!

ঘ. যদি আমল ছাড়া শুধু শাফাআতের মাধ্যমেই নাজাত পাওয়া যেত, তাহলে রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম কন্যা ফাতেমাই এর বেশি হকদার হতেন। অথচ তিনি তার প্রিয়তম কন্যাকে বলেছেন,

يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك ضرا ولا نفعا.

'হে ফাতিমা, জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কেননা, আমি উপকার কিংবা অপকারের মালিক নই।'[১]

১. *সহিহ মুসলিম: ২/১১৪*

ঙ. এ বিষয়টি তো একেবারে অযৌক্তিকও বটে— একজন সর্বদা আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থেকে, সর্বদা তার আদেশ-নিষেধ পালনে সচেষ্ট থেকেও আখেরাতে নাজাতপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা পেল না, আর কেউ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের কোনো পরোয়া না করেই কেবল শাফাআতের অপেক্ষায় বসে থাকবে! মনে মনে ভাববে— কোনো আমল না করলেও চলবে!

বস্তুত আল্লাহর সব আদেশ-নিষেধ মানার পাশাপাশি এই আশাও রাখা যাবে— কখনও কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ে গেলে হয়ত আল্লাহ তায়ালা ছেলেকে হাফেজ কিংবা আলেম বানানোর উসিলায় মাফ করে দিবেন।

* * *

রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কি কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়?

'রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়'—এ কথাটি বেশ প্রসিদ্ধ। প্রায় সকলের নিকটই পরিচিত। এত বেশি প্রসিদ্ধ যে, এ বিষয়ে কারও কোনো সংশয়-সন্দেহ পর্যন্ত নেই। কারও ভাবনাতেও এ ব্যাপারে কোনো সংশয় আসে না। বরং সবাই এটাকে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত বিষয় হিসেবেই জানেন। কিন্তু বাস্তবেই কি তা-ই? বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রথম কথা হল, রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়— এ সম্পর্কে হাদিসের প্রসিদ্ধ কোনো কিতাবে একটি রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না। ফিকহ-ফাতোয়ার কিতাবসহ যে সকল কিতাবে এ বিষয়ক আলোচনা রয়েছে, সেগুলোর কোনোটিতেই এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট একটি রেওয়ায়াতও পাওয়া যায় না। অবশ্য কেউ কেউ একটি হাদিস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। হাদিসটি হচ্ছে, হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ.

'রমজান মাসের আগমনে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলে দেওয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়।'[১]

---

১. *সহিহ বুখারি: ৩২৭৭; সহিহ মুসলিম, ১০৭৯*

উপরোক্ত হাদিসে রমজানে জান্নাতের দরজা খুলে যাওয়া এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা থাকলে কোথাও এ কথা বলা হয়নি—রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে!

এ ক্ষেত্রে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসিনে কেরাম বিভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন—

ক. হতে পারে বাক্যটি হাকিকি (প্রকৃত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের জন্য রমজান মাস প্রবেশের আলামত এবং এর পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলামত হিসেবে, এ মাসে জান্নাতের দরজা খুলে দেন এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেন।

খ. কথাটি রূপক অর্থেও হতে পারে। রূপক অর্থে হলে জান্নাতের দরজা খোলে দেওয়ার অর্থ হবে—বেশি বেশি সাওয়াব লিখে দেওয়া, আর জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ হবে—অধিকহারে ক্ষমা করা। এই অর্থটি সমর্থিত হয় অপর একটি রেওয়ায়াত দ্বারা। অপর রেওয়ায়াতটিতে বিবৃত হয়েছে— فتحت أبواب الرحمة (রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়)।

গ. অথবা রূপক অর্থ এরকমও হতে পারে—এই মাসে আল্লাহ তায়ালা বান্দার জন্য রোজা, কিয়ামুল লাইল ও অন্যান্য যে নেক কাজের তাওফিক রেখেছেন, তাকে বলা হয়েছে 'জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।' আর যেগুলো থেকে বিরত থাকার তাওফিক দেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকার অর্থ হল 'জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।' কেননা এসব নেক কাজ করা এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই হল জান্নাতে প্রবেশ করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির অবলম্বন।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়— হাদিসের হাকিকি অর্থ গ্রহণ করা হোক কিংবা রূপক অর্থ গ্রহণ করা হোক; কবরের আযাব মাফ হওয়ার সাথে এই হাদিসের কোনো সম্পর্ক নেই।

কেউ কেউ রমজানে মৃত্যুর ফজিলত প্রমাণের জন্য হযরত আনাস রাযি. এর একটি বক্তব্যকে দলিল হিসেবে পেশ করে থাকেন। বক্তবটি হল, 'রমজান মাসে মৃত ব্যক্তি থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়।'

কিন্তু হাদিসের প্রসিদ্ধ কোনো কিতাবে এই বক্তব্যের খোঁজ নেই। যতটুকু খোঁজ আছে, তা হল, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলি রহ. তার রচিত *আহওয়ালুল*

---

১. *ইকমালুল মু'লিম: ৪/৫; ফাতহুল বারি: ৫/২৩০*

কুবুর ওয়া আহওয়ালু আহলিহা ইলান নুশুর গ্রন্থে (পৃ. ১০৫) উল্লেখ করেছেন— 'হযরত আনাস রাযি. থেকে দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— রমজান মাসে মৃত ব্যক্তি থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়।'[১]

ইবনে রজব হাম্বলি রহ. উপরোক্ত রেওয়ায়াতের কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। আবার হাদিসটি কোন কিতাবের, তা-ও বলেননি। অথচ এই বক্তব্য উল্লেখের একটু পরেই তিনি জুমুআর দিনে মৃত্যুসংক্রান্ত হাদিসটি *মুসনাদে আহমদ* ও *সুনানুত তিরমিজি*র উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন। এটি যদি হাদিসের কোনো কিতাবে থাকত, তাহলে অবশ্যই এরও সূত্র তিনি উল্লেখ করতেন।

আর হাদিসটি যে সহিহ নয়, তা তো ইবনে রজব রহ. নিজেই উল্লেখ করে দিয়েছেন। আর কোনো সনদ উল্লেখ না থাকায় সনদের মান জানাও সম্ভব নয়। সনদটি কোন পর্যায়ের দুর্বল; সাধারণ দুর্বল, নাকি অতি দুর্বল, নাকি জাল। আর এই তিন পর্যায়ের যে পর্যায়েরই হোক না কেন, ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এমন হাদিস অগ্রহণযোগ্য।

তা ছাড়া হাদিসের প্রসিদ্ধ কোনো কিতাবে যদি রেওয়ায়াতটি পাওয়া যেত, তাহলে ফিকহ-ফাতোয়ার কিতাবাদিসহ যেসব কিতাবে রমজানে মৃত্যুর আলোচিত ফজিলতের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেসব কিতাবে এ হাদিসটি সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হত। কিন্তু কেউই এমন কোনো বর্ণনাকে দলিল হিসেবে পেশ করেননি। বরং তারা প্রথম হাদিস অর্থাৎ রমজানে জান্নাতের দরজা, রহমতের দরজা খুলে দেওয়া, আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মাসে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের ঢল নামা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় কেবল আশা ব্যক্ত করেছেন— রমজানে মৃত্যুবরণ করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা কবরের আযাব মাফ করে দেবেন।

আকিদা শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে সালেম ইবনে সুলাইমান আস-সাফারিনি রহ. ইবনে রজব হাম্বলি রহ. এর পূর্বোক্ত কথা অর্থাৎ রমজানে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায় এবং কালাম শাস্ত্রের ইমাম নাসাফি রহ. এর এ জাতীয় একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, 'এটা ধারণামাত্র। এর স্বপক্ষে কোনো দলিল নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসুলের হাদিসের সামান্য স্বাদও আস্বাদন করেছে, সে যেন এ ধরনের কথার দিকে কর্ণপাত না করে।'[২]

---

১. ولفظه: روى باسناد ضعيف عن انس بن مالك ان عذاب القبر يرفع عن الموتي في شهر رمضان

২. *আল বুহরুয যাখিরাহ*, সাফারিনি: ১/২৪৬

কেউ কেউ হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত এই হাদিসের মাধ্যমে বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। বর্ণিত হয়েছে—

من وافق موته عند انقضاء رمضان دخل الجنة.

'রমজান সমাপ্তির সময়ে যার মৃত্যু সংঘটিত হয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১] কিন্তু আলোচ্য বিষয়টি এই হাদিস থেকে প্রমাণের চেষ্টা ঠিক নয়। কারণ—

ক. হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন নাসর ইবনে হাম্মাদ। তিনি নিতান্তই দুর্বল। এমনকি ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আর আবুল ফাতাহ আযদি রহ. বলেন, সে একটি হাদিস জাল করেছে।

খ. তা ছাড়া হাদিসটি প্রমাণিত হলেও হাদিস থেকে আলোচ্য বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। কারণ জান্নাতে প্রবেশ করা আর কবরের আযাব মাফ হয়ে যাওয়া—দুটো এক বিষয় নয়। এমন অনেক লোক থাকবেন, যারা বিভিন্ন অপরাধের শাস্তিভোগ শেষ করে পরে জান্নাতে যাবেন।

কিছু নিবেদন

এক. কবরের আযাব সত্য। কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই আযাব থেকে মুক্তির প্রথম শর্ত—ঈমান। দ্বিতীয় শর্ত—ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবনযাপন করা। বিশেষত যেসব গুনাহের কারণে কবরের আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে সর্বোতভাবে বেঁচে থাকা। যেসব আমলের দ্বারা কবরের আযাব থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে, ওইসব আমল গুরুত্বের সাথে করা। আর কবর ও আখেরাতকে সর্বোচ্চ সুন্দর বানানোর চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা।

দুই. আল্লাহ তায়ালা পরকালে নাজাত এবং শাস্তি থেকে মুক্তির বিষয়টি আমলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। বিশেষ কোনো দিনে বা রাতে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। তা ছাড়া এটি একটি অনিচ্ছাধীন কাজ। সুতরাং এর সাথে কবরের আযাব মাফ হওয়ার বিষয়টি অযৌক্তিক।

তিন. আল্লাহর রাসুলের কত সাহাবি, যাদের জান্নাতি হওয়ার ব্যাপারে আমরা আশা রাখি, তারাও সেই কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাননি।[২] অথচ রমজান মাসে কত ফাসেক ও পাপাচারী লোকের মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তি সারা জীবন হারামের

---

১. *আবু নুআইম আসফাহানি*, হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৫/২৩

২. এর সুস্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে—প্রস্রাব থেকে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে সাহাবির কবরে আযাব হওয়ার হাদিস।

উপর কাটিয়েছে, কেবল অনিচ্ছাকৃত এক আমল, অর্থাৎ শুধু রমজানে মৃত্যুবরণের কারণে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, বিষয়টি একটু সরলীকরণ হয়ে গেল না!

চার. গুনাহগারের জন্য কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এর বিপরীত যদি কারও ক্ষেত্রে কবরের আজাব মাফ হওয়ার দাবি করতে হয়, তাহলে এর স্বপক্ষে সুস্পষ্ট অকাট্য প্রমাণ থাকতে হবে। অথচ উপরে আমরা আলোচনা করেছি—এ প্রসঙ্গে কোনো নির্ভরযোগ্য দলিলই পাওয়া যায় না।[১]

পাঁচ. যদি মেনেও নেওয়া হয়—রমজানে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব মাফ হবে, কিন্তু দুর্বল-সবল কোনো রেওয়ায়াত দ্বারাই কেয়ামত পর্যন্ত মাফ হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না।

সুতরাং রমজান মাসে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আজাব মাফ হয়ে যায়, এটি সুস্পষ্ট প্রমাণিত কোনো কথা নয়। এমন কথা প্রচার না করাই কাম্য।

* * *

শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করলে কি কেয়ামত পর্যন্ত কবরের আযাব বন্ধ থাকে?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

‘কোনো মুসলমান যদি জুমুআর দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন।[২]

---

১. এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকিহ মোল্লা আলি কারির বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি *ফিকহুল আকবারের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবু মুয়িনের রমজান ও শুক্রবারে কবরের আযাব মাফসংক্রান্ত আলোচনাটি উল্লেখ করে বলেন, এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, আকিদার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হল ইয়াকিনি তথা সুনিশ্চিত দলিল। হাদিসে আহাদ (যে হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি) যদি প্রমাণিতও হয়, তবে তা যন্নি তথা সুনিশ্চিত দলিল নয়। দেখুন, *মিনাহুর রওদিল আযহার ফি শারহি ফিকহিল আকবার:* ২৯৫-২৯৬

২. *মুসনাদে আহমদ:* ১১/১৪৭; *সুনানে তিরমিজি:* ১০৭৪

উপরোক্ত হাদিসের উপর ভিত্তি করেই এ কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার লাভ করেছে—জুমুআর দিনে মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যাবে। ফলে অনেকে মনে করেন— যে যত অপরাধী ও গুনাহগার হোক, শুক্রবার দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করলে তার কবরে কোনো আযাব হবে না। অনেকে মনে করেন—কেয়ামত পর্যন্ত আযাব বন্ধ থাকবে। আসলেই কি তা-ই? বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

প্রথমেই আমরা হাদিসটি নিয়ে আলোচনা করব।

হাদিসটি ইমাম তিরমিজি রহ. নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেন—

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن أَبِي هِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

ইমাম তিরমিজি রহ. বলেন, 'হাদিসটি গরিব। হাদিসের সনদ মুত্তাসিল নয়। রাবিয়া ইবনে সাইফ (সরাসরি) আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই।'

ইমাম তিরমিজির কথা থেকে বোঝা গেল—হাদিসটি মুত্তাসিল নয়। অর্থাৎ এর সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে। রাবিয়া ও আবদুল্লাহর মধ্যে কোনো এক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন। কিন্তু রাবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. এর মাঝে বাদ পড়া সেই বর্ণনাকারী কে? বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ *শরহু মুশকিলিল আসারে* (১/২৫০) উল্লেখ হয়েছে। সেখানে রাবিয়া ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. এর মাঝখানে তিনজন বর্ণনাকারীর কথা এসেছে—আবদুর রহমান ইবনে কাহযাম, ইয়ায ইবনে উকবা, 'সদফ' এলাকার এক ব্যক্তি। তাদের মধ্যে ইয়ায ইবনে উকবা একজন তাবিয়ি ছিলেন।[1] আর 'ইবনে কাহযাম' সম্পর্কে শায়েখ শুআইব আল-আরনাউত রহ. বলেন, তিনি 'মাজহুলুল হাল' (তিনি নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য—এ ব্যাপারে ইমামদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না)। আর 'সদফ' এর জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, লোকটি 'মুবহাম' (যার নাম জানা যায় না)।[2]

অবশ্য আবদুল্লাহ ইবনে আমরের উপরোক্ত সনদ ছাড়া হাদিসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন *মুসনাদে আহমদে* (১১/২২৫) নিম্নোক্ত সনদে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে—

---

১. *রিয়াযুন নুফুস*, আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-মালেকি, পৃষ্ঠা: ১৩২

২. *মুসনাদে আহমদ*: ১১/১৫০

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدٍ التُّجِيبِيُّ سَمِعْتُ أَبَا قَبِيلٍ الْمِصْرِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ.

সনদের বর্ণনাকারী মুআবিয়া ইবনে সাঈদ আত-তুজিবিকে ইবনে হিব্বান রহ. ছাড়া অন্য কেউ তাওসিক (নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত) করেননি। আর আবু কাবিল আল-মিসরিকে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার *তাজিলুল মানফাআহ* গ্রন্থে 'দুর্বল' বলেছেন।

হাদিসটি ইমাম বাইহাকি রহ. তার *ইসবাতু আযাবিল কবর* গ্রন্থে (৮২) আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে নিম্নোক্ত সনদে 'মওকুফান' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বক্তব্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، نَا مُحَمَّدٌ، نَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، كَانَ يَقُولُ " :مَنْ تُوُفِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ الْفَتَّانَ ".وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا

এ ছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনে আমরের উপরোক্ত হাদিসটির 'শাহিদ' তথা সমার্থক আরও কয়েকটি হাদিস রয়েছে।

এক. হযরত আনাস রাযি. এর হাদিস, যা *মুসনাদে আবু ইয়ালায়* নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে—

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَلامَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ :مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ عَذَابَ الْقَبْرِ.

এই সনদে বর্ণনাকারী ওয়াকিদ ইবনে সালামাহ এবং ইয়াযিদ আর-রাকাশি—দুজনই দুর্বল রাবি।

দুই. হযরত জাবির রাযি. এর হাদিস। হাদিসটি *হিলইয়াতুল আউলিয়া* গ্রন্থে (৩/১১৫) নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে।

حدثنا عبد الرحمن بن العباس الوراق ثنا أحمد بن داود السجستاني ثنا الحسن بن سوار أبو العلاء ثنا عمر بن موسى بن الوجيه عن محمد بن المنكدر عن جابر

قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة عليه طابع الشهداء.

হাদিসের সনদে উমর ইবনে মুসা নামক বর্ণনাকারী হাদিস জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত।[১]

প্রশ্ন হল, উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে আমরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হব? হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়া এবং এর কয়েকটি শাওয়াহিদ তথা সমর্থক হাদিস থাকার কারণে এটাকে সহিহ কিংবা হাসান বলব? নাকি এ কথা বলব যে, যদিও অনেক সনদ এবং শাওয়াহিদ রয়েছে, কিন্তু এই সকল সনদ এবং শাওয়াহিদগুলো এই পর্যায়ের নয় যে, সবগুলো মিলে হাদিসটি হাসান কিংবা সহিহের পর্যায়ে পৌঁছে যাবে? এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনে কেরামের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটাকে 'হাসান' কিংবা 'সহিহ' মনে করেন। যেমন মুনযিরি রহ. তার *আত-তারগিব* গ্রন্থে (পৃ. ১২৮৬) এবং সুয়ুতি রহ. *আল-জামিউস সগির* গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।[২] এ ছাড়াও সামসময়িক আলেমদের মধ্যে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. তার *আহকামুল জানাইয* গ্রন্থে (পৃ. ৫০) হাদিসটিকে 'হাসান' অথবা 'সহিহ' বলেছেন।

এর বিপরীত অনেক মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসকে সহিহ মনে করেন না। যেমন—

ক. ইমাম তাহাবি রহ. তার *শরহু মুশকিলিল আসার* গ্রন্থে (১/২৫০) প্রথমে হযরত আয়িশা রাযি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত এই হাদিসটি উল্লেখ করেন—

إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا، نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ.

'কবরের একটি চাপ রয়েছে। কারও পক্ষে যদি সেই চাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হত, তা হলে অবশ্যই সাদ ইবনে মুআয সেই চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতেন।'

এই হাদিসের পরে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসটি উল্লেখ করেন—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ إِلا بَرِئَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ.

'কোনো মুসলমান যদি জুমুআর দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করে, সে কবরের ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে।'

---

১. *লিসানুল মিযান: ৬/১৪৮*
২. *ফয়জুল কাদির: ৫/৪৯৯*

উভয় হাদিস উল্লেখ করে তিনি বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, দুটি হাদিস পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল! এরপর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আমরের হাদিসের সনদে কী দুর্বলতা আছে, তা তুলে ধরে বলেন।

এর দ্বারা হাদিসের সনদ যে সঠিক নয়, তা সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম। আরও জানতে পারলাম— বর্ণনাকারী রাবিয়ার জন্য এমন কিছু বর্ণনা করা বৈধ নয়, যা হযরত আয়িশা রাযি. এর পূর্বোক্ত হাদিসের বিরোধী হয়।

তার কথার সারাংশ হচ্ছে, জুমুআর দিন মৃত্যুর ফজিলতসংক্রান্ত হাদিসটি আয়েশা রাযি. এর হাদিসের বিরোধী হওয়ার কারণে এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. হাফেয যাহাবি রহ. তার *মিযানুল ইতিদাল* গ্রন্থে (৭/৮১) হাদিসটিকে 'মুনকার' তথা আপত্তিজনক (এমন হাদিস, যা ফাযায়েলের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য নয়) বলেছেন।

গ. আল্লামা কাশমিরি রহ. *সুনানে তিরমিজির* ব্যাখ্যাগ্রন্থ *আল-আরফুশ শাযি* (২/৩৫১) গ্রন্থে বলেন, 'জুমুআর দিনে মৃত্যবরণের ফজিলতসংক্রান্ত হাদিসটি সঠিক নয়।'

ঘ. সামসময়িক আলেম ও মুহাক্কিক শায়খ শুআইব আল-আরনাউত রহ. *মুসনাদে আহমদ* (১১/১৫০) এর টীকায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের হাদিসের 'শাওয়াহিদ' তথা সমবক্তব্যের কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, "এ সকল 'শাওয়াহিদ' হাদিসকে শক্তিশালী করার যোগ্যতা রাখে না। শায়খ আলবানি তার *আল-জানাইয* গ্রন্থে (পৃ. ৩৫) মুবারকপুরি রহ. এর *তুহফাতুল আহওয়াযির* অনুসরণে হাদিসটিকে 'হাসান' কিংবা 'সহিহ' বলে ভুল করেছেন।"

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যাচ্ছে— হাদিসটি সহিহ কি সহিহ নয়, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসিনে কেরাম একমত নন। তাহলে আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হব? যারা হাদিসকে সহিহ বলেছেন, তাদের কথা অনুযায়ী কবরের আযাব মাফ মনে করব? নাকি যারা হাদিসটি অগ্রহণযোগ্য বলেছেন, তাদের বক্তব্য গ্রহণ করব? এ বিষয়ে সমাধানে পৌঁছতে আমাদের কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। বিষয়গুলো হল,

ক. কবরের আযাব সত্য। কুরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এই আযাব থেকে মুক্তির প্রথম শর্ত হচ্ছে—ঈমান। দ্বিতীয় শর্ত—ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবনযাপন করা। বিশেষত যেসব গুনাহের কারণে কবরে আযাব হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা এবং যেসব আমলের দ্বারা কবরের আযাব থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে, সেসব আমল গুরুত্বের

সাথে সম্পাদন করা। আর কবর ও আখেরাতকে সর্বোচ্চ সুন্দর বানানোর চেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা।

খ. আল্লাহ তায়ালা পরকালে নাজাত এবং শাস্তি থেকে মুক্তির বিষয়টি আমলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। বিশেষ কোনো দিনে বা রাতে মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করেননি। তাছাড়া মৃত্যু একটি অনিচ্ছাধীন কাজ। সুতরাং এর সাথে কবরের আযাব মাফ হওয়ার বিষয়টি বাহ্যত অযৌক্তিক।

গ. যদি বিশেষ কোনো দিনে মৃত্যুবরণ করা ফজিলতপূর্ণ হত, এবং এ কারণেই কবরের আযাব মাফ হয়ে যেত, তবে সেই দিনটি সোমবার হওয়াই বেশি যুক্তিসংগত। কেননা সোমবার এমন একটি দিন, সহিহ হাদিসের আলোকে যেদিন আল্লাহ তায়ালা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এদিন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। *সহিহ মুসলিমে* (২৫৬৬) হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ...

'সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর মুশরিক ব্যতীত সকল বান্দাকেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার অপর ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ রয়েছে...।'

তাছাড়া নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কারণে সাহাবিগণ সোমবারে মৃত্যুর কামনা করতেন। আল্লাহর রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবি হযরত আবু বকর রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ সোমবারে নিজের মৃত্যুর কামনা করেছেন। আর বাস্তবে হয়েছেও তা-ই।[১]

কিন্তু কোনো হাদিস বা আছারে একজন সাহাবিরও শুক্রবারে মৃত্যু কামনা করার কথা পাওয়া যায় না। সাহাবায়ে কেরাম সবসময় আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। জাহান্নাম ও কবরের শাস্তি থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই চিন্তায় বিভোর থাকতেন। যদি শুক্রবারে মৃত্যুর ফলে কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাওয়া যেত, তা হলে সেই কামনা তারা অবশ্যই করতেন। কিন্তু কেউ-ই শুক্রবারে মৃত্যুর কামনা করেননি।

---

১. *সহিহ বুখারি:* ১৩৮৭

ঘ. ইমাম তাহাবি রহ. জুমুআর দিনে মৃত্যুবরণের ফজিলতসংক্রান্ত হাদিসটিকে হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস—'কবরের একটি চাপ[১] রয়েছে। কারও পক্ষে যদি সেই চাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হত, তা হলে অবশ্যই সাদ ইবনে মুআয সেই চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতেন'[২]—এই হাদিসের বিরোধী মনে করেন। আর এই হাদিসের কারণেই তিনি জুমুআর দিনের ফজিলতসংক্রান্ত হাদিসকে সহিহ মনে করেন না।

হযরত সাদ ইবনে মুআযের আযাবের কারণ কী? এ সম্পর্কে হাকিম তিরমিজি রহ. বলেন, প্রত্যেকের কিছু-না কিছু গুনাহ তো আছেই। তাই কবরের এই 'যাগতা' তথা চাপের মাধ্যমে সেই অপরাধ মাফ হয়। এটি হয় অপরাধের শাস্তি হিসেবে। ঠিক তেমনিভাবেই হযরত সাদ ইবনে মুআযের কবরেও চাপ হয়েছে, প্রশ্রাব থেকে বেঁচে থাকার মধ্যে ত্রুটির কারণে।[৩]

লক্ষ করুন, সাদ ইবনে মুআয এমন একজন সাহাবি, *সুনানে নাসায়ির* বর্ণনা (২০৫৫) অনুযায়ী যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপেছে। আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা যার জানাজায় শরিক হয়েছেন।

ঘ. গুনাহগারের জন্য কবরের আযাবের বিষয়টি কুরআন-হাদিসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এর বিপরীতে কারও জন্য কবরের আযাব মাফ হওয়ার দাবি করতে হলে, এর স্বপক্ষে মজবুত দলিল থাকতে হবে।[৪] কিন্তু এখানে সেই মজবুত দলিল পাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলি কারি রহ. এর বক্তব্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। তিনি তার *মিনাহুর রওদিল আযহার ফি শরহি ফিকহিল আকবার* (পৃ. ২৯৫-২৯৬) গ্রন্থে বলেন, 'জুমুআর দিনে বা রাতে যে মারা যাবে, তার থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নেওয়া হবে—এ কথা মোটামুটি প্রমাণিত। তবে কেয়ামত পর্যন্ত আর (আযাব) ফিরে আসবে না—এমন কথার কোনো ভিত্তি আমার জানা নেই।'

* * *

---

১. কবরের চাপ বা যাগতা হচ্ছে—কবরের দুপাশ মৃত ব্যক্তির শরীরের সাথে মিলে যাওয়া।

২. ولفظه: إِنَّ لِلْقَبْرِ لَضَغْطَةً لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا، نَجَا مِنْهَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ

৩. *শরহুস সুয়ুতি আলান নাসায়ি,* পরিচ্ছেদ: যাম্মাতুল কাবরি ওয়া আযাবুহু

৪. এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলি কারি রাহি. এর বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি *ফিকহুল আকবারের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে আবু মুয়িনের রমজান এবং শুক্রবারে কবরের আযাব মাফসংক্রান্ত আলোচনাটি উল্লেখ করে বলেন, এটা সুস্পষ্ট বিষয় যে, আকিদার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হল ইয়াকিনি তথা সুনিশ্চিত দলিল। হাদিসে আহাদ (যে হাদিসটি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছায়নি) যদি প্রমাণিতও হয়, তবে তা যন্নি তথা সুনিশ্চিত দলিল নয়। *মিনাহুর-রওদিল-আযহার ফি শরহে ফিকহুল-আকবার:* ২৯৫-২৯৬

জুমুআর দিন সুরা কাহফ তেলাওয়াতের সময়

হাদিসে জুমুআর দিন সুরা কাহফ তেলাওয়াতের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

ক. হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

'যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা হতে মুক্তি পাবে।'[১]

খ. নাওয়াস ইবনে সামআন রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন,

إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ.

'আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতে যদি সে আসে, তবে তোমাদের পক্ষ হতে আমিই তার প্রতিপক্ষ হব। আর আমি তোমাদের মাঝে না থাকা অবস্থায় যদি সে আসে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজেই তার প্রতিপক্ষ হতে হবে। আর আল্লাহ হবেন প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার পক্ষের দায়িত্বশীল। তোমাদের মাঝে যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন সুরা কাহফের প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করে। কারণ এটাই হবে তার ফিতনা থেকে নিরাপত্তা লাভের প্রধান উপায়।'[২]

গ. আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

'যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে সুরা কাহফ তেলাওয়াত করবে, তার জন্য দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ে নুর আলোকিত হবে।'[৩]

---

১. *সহিহ মুসলিম: ৮০৯; সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২৩*

২. *সহিহ মুসলিম: ২৯৩৯; সুনানে আবু দাউদ: ৪৩২১*

৩. *মুসতাদরাকে হাকিম: ২/৩৬৮; আস-সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি: ৩/২৪৯

ঘ. আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَّالُ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ.

'কেউ যদি জুমুআর দিনে সুরা কাহফ তেলাওয়াত করে; যেভাবে তা নাযিল হয়েছে সেভাবে, তা হলে কেয়ামতের দিন তার স্থান থেকে মক্কা শরিফ পর্যন্ত নুর আলোকিত হবে। আর কেউ যদি সুরা কাহফের শেষ দশ আয়াত পড়ে, তাহলে দাজ্জাল বের হলে তার উপর বিজয়ী হতে পারবে না।'[১]

এ ধরনের অনেক ফজিলতের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। জানার বিষয় হল, উক্ত ফজিলত পাওয়ার জন্য সুরা কাহফ কখন তেলাওয়াত করব? জুমুআর আগে, নাকি জুমুআর পরে করলেও হবে? জুমুআর দিন যে কোনো সময় তেলাওয়াত করলে হাদিসে বর্ণিত এসব ফজিলত পাওয়া যাবে কি?

অনেকের ধারনা অনুযায়ী উক্ত ফজিলত পাওয়ার জন্য সুরা কাহফ জুমুআর আগেই তেলাওয়াত করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ এমন নয়। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ।

- কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে সুরা কাহফ তেলাওয়াত করবে ...।
- আবার কোনো কোনো রেওয়ায়াতে উল্লেখ হয়েছে— مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করবে।

আলেমগণ এ সকল রেওয়ায়াতের মধ্যে সমন্বয় করে বলেছেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে, অর্থাৎ মাগরিবের পর থেকে শুক্রবার মাগরিবের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে সুরাটি তেলাওয়াত করে নিলে প্রতি জুমুআয় সুরা কাহাফ তেলাওয়াতের নির্দেশ পালিত হবে এবং উপরোক্ত ফজিলতসমূহও অর্জিত হয়ে যাবে। যেসব হাদিসে জুমুআর রাতে সুরা কাহফ তেলাওয়াতের কথা উল্লেখ হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য দিনসহ রাত। তদ্রুপ যে সকল হাদিসে জুমুআর দিনে সুরা কাহফ তেলাওয়াতের কথা এসেছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাতসহ দিন। বলাবাহুল্য, হিজরি তারিখে রাত আগে আসে, দিন পরে আসে। সুতরাং জুমুআর

---

১. *নাসায়ি, কুবরা:* ৯/৩৪৮; *তাবারানি, আওসাত:* ২/১২২; *মুসতাদরাকে হাকিম:* ১/৫৬৪

রাত হচ্ছে—বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত। তাই বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার মাগরিবের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময়ই তা পাঠ করা যায়।[১]

উল্লেখ্য, অনেকের ভেতর জুমুআর আগে আগেই পড়ে নেওয়ার ধারণাটি তৈরি হয়েছে *ফাতওয়ায়ে শামির* একটি বক্তব্য থেকে। ফাতওয়ায়ে শামিতে উল্লেখ হয়েছে (২/১৫৪)—'কল্যাণের কাজ যেন দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং (দেরি করার কারণে) যেন তা ছুটে না যায়, এজন্য উত্তম হল জুমুআর দিন বা রাতের শুরুর দিকে পড়া।'

সারকথা: বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত থেকে, অর্থাৎ মাগরিবের পর থেকে শুক্রবার মাগরিবের আগ পর্যন্ত যে কোনো সময়ে সুরাটি তেলাওয়াত করলে শুক্রবারে সুরা কাহফ তেলাওয়াতের ফজিলত অর্জিত হয়ে যাবে। তবে উত্তম হল রাতে অথবা দিনের শুরুর দিকে পড়া।

* * *

সুরা ইখলাস তিন বার পাঠ করলে কি একবার কুরআন খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়?

আমাদের সমাজে বেশ প্রসিদ্ধ একটি কথা হল, সুরা ইখলাস তিন বার তেলাওয়াত করলে এক বার কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায়। জানার বিষয় হল, হাদিসে এমন কোনো ফজিলত বর্ণিত হয়েছে? শরিয়তে এমন কথার কোনো ভিত্তি আছে?

প্রথম কথা হল, কোনো হাদিসেই সুস্পষ্টভাবে এ ধরনের কথা বর্ণিত হয়নি। তবে *সহিহ বুখারির* এক হাদিসে হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।'[২]

আবু সাঈদ খুদরি থেকে বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে—

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

'সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।'[৩]

---

১. ফয়জুল কাদির: ৬/২৫৭, ২৫৮
২. *সহিহ বুখারি:* ৪৮২৬
৩. *সহিহ বুখারি:* ৪৮২৪

সহিহ মুসলিম গ্রন্থেও হযরত আবুদ দারদা রাযি. এবং আবু হোরায়রা রাযি. থেকে অনুরূপ একটি হাদিসের বর্ণনা রয়েছে।[১]

এ সকল বর্ণনা থেকে অনেকে হিসাব মিলিয়ে নিয়েছেন— এক বার সুরা ইখলাস তেলাওয়াত করলে যেহেতু কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান হয়, সুতরাং তিন বার সুরাটি পাঠ করলে পুরো কুরআন এক বার খতম করার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে। এমন ধারণার পেছনে কারণ হল, তাদের ধারনা মতে তেলাওয়াতের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে সাওয়াব লাভ করা।

তবে বাস্তবতা তা বলে না। কেবল সাওয়াব প্রাপ্তিই তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য নয়। বরং কুরআনে কারিম তেলাওয়াতে ঈমান, ইলম ও আমল-গত নানাবিধ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রয়েছে। আর এ সকল হাদিসে 'সুরা ইখলাস' কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান তো বলা হয়েছে ঠিক, কিন্তু সাওয়াবের ক্ষেত্রে না অন্য ক্ষেত্রে, তা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। অর্থাৎ সুরা ইখলাস তিন বার পাঠ করলে এক খতমের সাওয়াব পাওয়া যাবে—এ কথাটি হাদিস থেকে সুস্পষ্ট হয় না। এ কারণেই অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন, হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—সুরা ইখলাসের গুরুত্ব অনেক, কিন্তু এক তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার অর্থ কী, তা কেবল আল্লাহই ভালো জানেন।

আবার মুহাদ্দিসগণ হাদিসটির মর্ম বর্ণনায় বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন,

* কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন: ক. বিধানাবলি, খ. ঘটনাবলি, গ. আল্লাহর সিফাত (গুণাবলি)। আর যেহেতু সুরা ইখলাসের মধ্যে এগুলোর একটি, অর্থাৎ আল্লাহর সিফাতের আলোচনা রয়েছে, এজন্য এই সুরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

* কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনের তিন ভাগ হচ্ছে: ক. ইলমুত তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদের জ্ঞান) খ. ইলমুশ শারাঈ (শরিয়তের জ্ঞান) গ. ইলমু তাহযীবিল আখলাক ওয়া তাযকিয়াতিন নাফস (চরিত্র গঠন ও আত্মশুদ্ধির জ্ঞান)। আর সুরা ইখলাসে যেহেতু তিন ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ইলমুত তাওহিদ রয়েছে, তাই সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।

কেউ কেউ আবার অন্য ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তবে কুরআনের তিন ভাগের ব্যাখ্যা যাই হোক, এ বিষয়ে প্রায় সবাই একমত—তিন ভাগের এক ভাগ সুরায়ে ইখলাসের মধ্যে আছে বলেই এই সুরাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

---

১. *সহিহ মুসলিম: ৮১১, ৮১২*

হাদিস থেকেও এমনটিই বোঝা যায়। *সহিহ মুসলিমে* হযরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তায়ালা কুরআনকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। আর ‘কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ’কে কুরআনের এক ভাগ বানিয়েছেন।’’[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়—সুরা ইখলাস সাওয়াবের দিক বিবেচনায় কুরআনের এক তৃতীয়াংশ নয়, বরং বিষয়বস্তুর বিবেচনায় এই সুরাকে এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে।

* কেউ কেউ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাওয়াবের ক্ষেত্রে সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান; কিন্তু কুরতুবি এবং হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন—এটি এমন দাবি, যার স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবুও এই ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেই সমাজে এই ধারণা তৈরি হয়েছে। আর এ ধারণা থেকেই আমাদের সমাজে তিন বার সুরা ইখলাস পাঠের প্রচলন রয়েছে।

ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. সুস্পষ্ট বলেছেন, সুরা ইখলাস তিন বার এমনকি দুশো বারের অধিক পড়লেও কুরআন খতমের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। ইমাম আহমদ রহ.-ও অনুরূপ বলেছেন।[২]

আলোচ্য দাবিটি অবাস্তবও। যেখানে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তিন বার তেলাওয়াত করলে পুরো কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যায় না, সেখানে তিন বার সুরা ইখলাস পাঠ করে পুরো কুরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার দাবি কি অযৌক্তিক নয়?

অনেকে যদিও বলেছেন, এক বার সুরা ইখলাস পাঠ করলে এক তৃতীয়াংশের সমান লাভ হবে, তবে তিন বার পাঠ করলে পুরো কুরআন পাঠের সাওয়াব পাওয়া যাবে—এমন কথা কেউ বলেননি। তবে তাদের কেউ কেউ বলেছেন—এক বার এই সুরা পাঠ করলে এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের সাওয়াব পাওয়ার বিষয়টি সবার জন্য ব্যাপক নয়। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথাটি বিশেষ সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। যিনি এক রাতে বার বার কেবল সুরা ইখলাস পাঠ করেছিলেন। অর্থাৎ তেলাওয়াতকারী সাহাবি যেন ওই লোকের সমান, যে পুনরাবৃত্তি ছাড়া পুরো রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াত করেছে। কাবিসি রহ. বলেন, লোকটি হয়ত এই সুরা ব্যতীত অন্য কোনো সুরা জানত না, এজন্য সে তার এই আমলকে কম মনে করেছিল। তাই

---

১. *সহিহ মুসলিম:* ৮১১
২. *মিরকাতুল মাফাতিহ:* ৫/২৫-২৬

কল্যাণের কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কথাটি বলেছিলেন।[1]

অনেকের মতে সুরা ইখলাস তেলাওয়াতের মূল সাওয়াব ও বর্ধিত সাওয়াব[2] মিলে এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের মূল সাওয়াবের বরাবর। যদি তাই হয়, তাহলে কুরআনে কারিমের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের সাথে তার বর্ধিত সাওয়াবকে যোগ করা হলে সুরা ইখলাস তেলাওয়াতের (মূল ও বর্ধিত) সাওয়াব থেকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সাওয়াব অনেক বেশি হবে। সুতরাং এক বার পাঠ করলে এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের সমান হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.। তার ব্যাখ্যাটি বুঝতে হলে একটি বিষয় বুঝতে হবে। আরবিতে জাযা (جزاء) এবং ইজযা (اجزاء) শব্দ দুটির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। 'জাযা' বলা হয়—আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে কোনো কাজের সাওয়াব বা প্রতিদানকে, আর 'ইজযা' বলা হয়—কোনো কাজ অন্য কাজ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেওয়া এবং অন্য কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়াকে।

হাদিসের শেষোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী (অর্থাৎ সুরা ইখলাস সাওয়াবের ক্ষেত্রে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান) যদিও সুরা ইখলাসের জাযা বা সাওয়াব কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান বলা হয়েছে; কিন্তু এ কথা বলা হয়নি—সুরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়া থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেবে, বা এক তৃতীয়াংশের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

একটি উদাহরণ দিলে সুস্পষ্ট হবে। মনে করুন, কেউ হারাম শরিফে এক রাকাত নামাজ পড়লে এক হাজার নামাজের সাওয়াব পাবে। তাই বলে কেউ কি এই মনে করে বসে থাকবে—এক হাজার নামাজের সাওয়াব যেহেতু পেয়েছি, সুতরাং আগামী দশ বছর আর নামাজ না পড়লেও চলবে!

মূলত কেউই এমন মনে করবে না। সুরা ইখলাসের বিষয়টিও এমনি। অর্থাৎ এই সুরা তেলাওয়াতের মাধ্যমে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের

---

১. *সহিহ বুখারির* রেওয়ায়াত (৪৮২৪) থেকেও এই ব্যাখ্যাটি সমর্থিত। কেননা ওই রেওয়ায়াতে এসেছে, এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। সে বার বার তা উচ্চারণ করছিল। পর দিন সকালে তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বিষয়টি বললেন। যেন তিনি এটিকে কম মনে করলেন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন, এ সুরা হচ্ছে সমগ্র কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

২. প্রতিটি নেক আমলের সওয়াব দশগুণ বৃদ্ধি করা হয়। সেই দশগুণ হচ্ছে বর্ধিত সওয়াব।

সাওয়াব পাওয়া গেলেও কুরআন তেলাওয়াত থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেয় না এবং এক বার সুরা ইখলাসের তেলাওয়াত এক তৃতীয়াংশ তেলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হয় না।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, 'সম্পদ যেমন বিভিন্ন প্রকারের হয়, তেমনি সাওয়াবও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সম্পদের বিভিন্ন প্রকার যেমন খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, বাসস্থান, নগদ টাকা ইত্যাদি। কারও কাছে যদি এগুলোর কোনো এক প্রকার থাকে, তবুও সে অন্যগুলো থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। কারও কাছে খাদ্য থাকলে সে বস্ত্র ও বাসস্থানের মুখাপেক্ষী থাকবে, আর শুধু নগদ টাকা থাকলে অন্যান্য সবগুলোর মুখাপেক্ষী থাকবে। তেমনিভাবে সুরায়ে ফাতেহার মধ্যে যে উপকারিতা রয়েছে; ছানা, দোয়া ইত্যাদি যা মানুষের প্রয়োজন, সুরা ইখলাস পাঠের দ্বারা তা অর্জিত হবে না।'

সারকথা: সুরা ইখলাসের গুরুত্ব অন্যান্য সুরার তুলনায় অনেক বেশি। কেননা এতে আল্লাহর একত্ববাদ এবং গুণাবলীর আলোচনা রয়েছে। উল্লিখিত হাদিস এবং অন্যান্য হাদিস থেকে এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট বোঝা যায়। তবে তিন বার সুরা ইখলাস পড়লে পুরো কুরআন খতম করার সাওয়াব পাওয়া যাবে—এ কথা সুস্পষ্টভাবে কোনো হাদিসেই বর্ণিত হয়নি।[১]

* * *

সুরা ইয়াসিন এক বার পাঠ করলে কি দশ খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়?

সমাজে প্রসিদ্ধ আরেকটি ফজিলতের কথা হল, এক বার সুরা ইয়াসিন পাঠ করলে দশ খতমের সাওয়াব পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কথাটির উৎসমূল আলোচনা করার মতো একটি বিষয়।

হযরত আনাস রাযি. এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। হাদিসটি হল[২]—

---

১. *ইকমালুল মুলিম*, কাযী ইয়ায: ৩/১৭৯-১৮০; *আল-মিনহাজ*, নববি: ৬/৯৪-৯৫; *মাজমুউল-ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া: ১৭/৭৪-৭৫; *ফাতহুল বারি*: ৮/৬৯০-৬৯১; *উমদাতুল কারি*: ২০/৪৬-৪৭; *মিরকাতুল মাফাতিহ*: ৫/২৫-২৬; *ফয়জুল কাদির*; ১/৪৭১; *তুহফাতুল আহওয়াযি*: ৮/২০৭-২০৮; *আউনুল মাবুদ*, আযিমাবাদি: ৪/৩৩৫-৩৩৬; *আহসানুল ফাতাওয়া*: ৯/১১-১৫

٢. وإسناده كما يلي: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ مُقَاتِلِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس، وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَاءَتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

'কুরআনের কলব হচ্ছে সুরা ইয়াসিন। যে ব্যক্তি এই সুরা এক বার পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা এর পরিবর্তে তার জন্য দশ বার কুরআন পাঠের সমান সাওয়াব লিখে দেবেন।'[১]

ইমাম তিরমিজি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন,[২] এ হাদিসটি গরিব। এর বর্ণনাকারী আবু মুহাম্মদ হারুন একজন মজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী। অপর দিকে হাফেজ যাহাবি রহ. বর্ণনাকারী হারুনের জীবনীতে লিখেন,[৩] কুযায়ি রহ. তার মুসনাদুশ শিহাব গ্রন্থে যা বর্ণনা করেছেন (অর্থাৎ হারুনের সূত্রে আলোচিত হাদিস), তার উপর ভিত্তি করে আমি তাকে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করছি।[৪] এরপর তিনি হারুনের সূত্রে বর্ণিত উপরোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।

এই হাদিসের আরেকজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন মুকাতিল। এই মুকাতিলের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রায় সকল উৎস গ্রন্থে বলা হয়েছে—মুকাতিল ইবনে হাইয়ান, কিন্তু হাফেজ যাহাবি রহ. *মিযানুল ইতিদাল* (৪/১৭২) গ্রন্থে বলেছেন, সে হচ্ছে মুকাতিল ইবনে সুলাইমান, এটিই সুস্পষ্ট। আবি হাতিম রহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেন, আমি এই হাদিসকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের জালকৃত একটি কিতাবের শুরুতে দেখেছি। হাদিসটি বাতিল। এর কোনো ভিত্তি নেই।[৫] আর ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, এটি একটি মওযু (জাল) কথা।[৬]

মুসতাগফিরি রহ. তার *ফাযাইলুল কুরআনে* (হাদিস নং ৮৬৫) ভিন্ন একটি সনদে আনাস রাযি. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৭] কিন্তু তার রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী হলেন—আব্দুল হাকাম আল-কাসমালি। ইমাম বুখারি, আবু

---

১. *সুনানে দারিমি*, হাদিস - ৩৪৫৯; *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস - ২৮৮৭; *শুআবুল ঈমান*, বায়হাকি, হাদিস - ২৪৬০; *মুসনাদুশ শিহাব*: ২/১৩০

২. لفظه : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَبِالْبَصْرَةِ لَا يَعْرِفُونَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ. وَهَارُونُ أَبُو مُحَمَّدٍ شَيْخٌ مَجْهُولٌ

৩. ولفظه: أنا أتهمه بما رواه القضاعى في شهابه

৪. *মিযানুল ইতিদাল*: ৪/২৮৮

৫. *আল-ইলাল*, ইবনে আবি হাতেম: ৪/৫৭৮

৬. *আল-মুন্তাখাব মিনাল ইলাল*, খাল্লাল, পৃ. ১১৭

৭. من طريق إبراهيم بن سليمان الزيات، حَدَّثَنا عبد الحكم عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن لكل شيء قلبا، وإن قلب القرآن (يس) فمن قرأها مرة واحدة كما أنزلت فكأنما قرأ القرآن عشر مرات ، وَمن قرأها عند الميت وهو ينزع كان أهون لنزعه.

হাতেম রহ. প্রমুখ ইমাগণ তাকে 'মুনকারুল হাদিস' বলেছেন। আর ইবনে আদি রহ. বলেন, তার অধিকাংশ রেওয়ায়াতই এমন যে, অন্য কেউ এরূপ বর্ণনা করে না। আর আবু হাতিম রহ. তাকে দুর্বল বলেছেন। আবু নুআইম আসবাহানি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে আনাস রাযি. থেকে একটি মুনকার ও আপত্তিজন নুসখা বর্ণনা করেছে। সে কোনো কিছুই নয়।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, আনাস রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত এই হাদিসের মজবুত কোনো ভিত্তি নেই।

তবে বাইহাকি রহ. তার *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে (হাদিস নং ২৪৬৬) স্বীয় সনদে[২] আবু হোরায়রা রাযি. থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ওই রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী হলেন সুয়াইদ, যাকে নাসায়ি, সাজি, ইবনে আদি প্রমুখ ইমামগণ দুর্বল বলেছেন। আর ইবনে হিব্বান রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে জাল হাদিস বর্ণনা করত।[৩] তা ছাড়া আবু হাতিম রহ. তার এই হাদিসকে 'মুনকার' (আপত্তিজনক ও অতি দুর্বল) বলেছেন।[৪]

মুসতাগফিরি রহ. তার *ফাযাইলুল কুরআন* গ্রন্থে (হাদিস নং ৮৬৬) বারা রাযি. থেকেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[৫] কিন্তু ওই রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী হলেন সাওয়ার ইবনে মুসআব, যিনি 'মাতরুক' তথা পরিত্যাজ্য ও নিতান্ত দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, বুখারি, নাসায়ি ও আবু দাউদ রহ. তাকে মাতরুক সাব্যস্ত করেছেন। আর হাকিম আবু আবদুল্লাহ রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে আমাশ এবং ইবনে খালিদ থেকে অনেক মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করত এবং আতিয়া থেকেও জাল রেওয়ায়াত বর্ণনা করত।

ইবনে আদি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, সে যা বর্ণনা করে, সেগুলোর অধিকাংশই মাহফুজ (ত্রুটিমুক্ত) নয়। সে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।[৬]

---

১. *মিযানুল ইতিদাল*: ২/৫৩৬; *তাহযিবুত তাহযিব*: ২/৪৭১

২. من طريق سُويد أبي حَاتِمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: مَنْ قَرَأَ يس مَرَّةً فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ

৩. *মিযানুল ইতিদাল*: ৩/৩৪৪; *তাহযিবুত তাহযিব*: ২/১৩২

৪. *আল-ইলাল*, ইবনে আবি হাতিম: ৪/৬৩১

৫. من طريق سوار بن مصعب، عَن أبي إسحاق عن البراء مرفوعا بلفظ : إن لكل شيء قلبا ، وإن قلب القرآن يس ، من قرأها في ليلة أضعفت له على سائر القرآن عشرا ، وَمن قرأها في صدر النهار بين يدي حاجته قضيت له حاجته.

৬. *লিসানুল মিযান*: ৩/১২৮

ইমাম বাইহাকি রহ. *শুআবুল ঈমান* গ্রন্থে (হাদিস নং ২৪৫৯) স্বীয় সনদে হাসসান ইবনে আতিয়ার সূত্রে এই মর্মে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।[১] কিন্তু হাসসান ইবনে আতিয়া তাবে তাবিয়িন হওয়ার কারণে তার বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতটি মুযাল (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যার ধারাবাহিক সনদ নেই)।

কোনো কোনো বর্ণনায় এক বার সুরা ইয়াসিন পাঠ করা, বার বার কুরআন তেলাওয়াত করার সমতুল্য বলা হয়েছে। যেমন কুযায়ি রহ. তার *মুসনাদুশ শিহাবে* (২/১৩০) উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।[২] তার রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী মাখলাদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ 'ওয়াহি', তথা নিতান্তই দুর্বল। ইবনে হিব্বান রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন—সে খুবই মুনকারুল হাদিস (তার হাদিস অত্যন্ত মুনকার)।[৩]

আহমদ ইবনে মানি রহ. তার *মুসনাদ*[৪] গ্রন্থে উবাই ইবনে কাব রাযি. এর উপরোক্ত হাদিসকে ভিন্ন আরেকটি সূত্রে উল্লেখ করেছেন।[৫] কিন্তু তার রেওয়ায়াতে ইউসুফ ইবনে আতিয়া নামক একজন বর্ণনাকারী 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য ও নিতান্তই দুর্বল)। ইমাম বুখারি রহ. তাকে মাতরুক সাব্যস্ত করেছেন। তেমনিভাবে নাসায়ি, দুলাবি, দারা কুতনি প্রমুখ ইমামগণও তাকে মাতরুক (পরিত্যাজ্য) বলেছেন। তা ছাড়া ইবনে আদি রহ. বলেন, তার অধিকাংশ হাদিস মাহফুজ নয়।[৬] একইভাবে তার শায়খ হারুন ইবনে কাসিরও একজন মাজহুল (বা অপরিচিত) রাবি।[৭]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, হাদিসটি যদিও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এর মজবুত কোনো ভিত্তি নেই। এ কারণেই ইবনে আবি হাতিম

---

১. ولفظه : أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَخْبَرَنا أَبُو مَنصُورٍ النَّضْرَوِيُّ ، حدثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنصُورٍ، حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَثْعَمِيِّ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَرَأَ يس فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ .

২. من طريق مَخْلَد بن عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مرفوعا بلفظ : إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ يس ، وَمَنْ قَرَأَ يس وَهُوَ يُرِيدُ بِهَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، وَأُعْطِي مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً.

৩. *মিযানুল ইতিদাল*: ৪/৮৩

৪. *আল-মাতালিবুল আলিয়া*: ১৫/১৩৬

৫ ولفظه: حدثنا يُوسُفُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنه ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ " يَس " يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تعالى غُفِرَ لَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ " يَس " فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً.

৬. *মিযানুল ইতিদাল*: ৪/৪৭০; *তাহযিবুত তাহযিব*: ৪/৪৫৮

৭. *মিযানুল ইতিদাল*: ৪/২৮৪

রহ. বলেছেন, 'হাদিসটি বাতিল ও মুনকার। এর কোনো ভিত্তি নেই।'[১] আর ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, 'এটি একটি মওযু (জাল) কথা।'[২]

বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে যদি ধরেও নেওয়া হয়, হাদিসটি ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, তথাপি যে অর্থে সাধারণত এই হাদিসকে উল্লেখ করা হয়, সেটি হাদিসের উদ্দেশ্য নয়। কারণ সাওয়াব লাভ করা তেলাওয়াতের একটিমাত্র ফায়েদা, একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কুরআন কারিম তেলাওয়াতের ঈমান, ইলম ও আমল-গত নানাবিধ উদ্দেশ্য ও উপকারিতা রয়েছে। তা ছাড়া যে কোনো নেক আমল ও ইবাদতের সাওয়াব দুই ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমত আমলের মূল সাওয়াব; দ্বিতীয়ত—আমলের তাযয়িফ বা বর্ধিত সাওয়াব, যা আল্লাহ তায়ালা অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে মূল সাওয়াব থেকে বাড়িয়ে দেন। সুতরাং সুরা ইয়াসিনের তেলাওয়াতকে দশ বার পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াতের বরাবর বলার উদ্দেশ্য সর্বদিক থেকে পুরোপুরি বরাবর হওয়া নয়। কোন দিক থেকে বরাবর, সে বিষয়ে একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা অনুসারে সাওয়াবের দিকটি ধরা হলে তার উদ্দেশ্য হবে—সুরা ইয়াসিনের মূল সাওয়াব ও বর্ধিত সাওয়াব মিলে পুরো কুরআন তেলাওয়াতের মূল সাওয়াবের বরাবর। সুতরাং যদি পুরো কুরআন তেলাওয়াতের মূল সাওয়াবের সাথে বর্ধিত সাওয়াবকেও যোগ করা হয়, তখন তো সুরা ইয়াসিনের তেলাওয়াতের (মূল ও বর্ধিত) সাওয়াব থেকে অনেক বেশি হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না—কুরআনে কারিমের প্রতিটি সুরা, প্রতিটি আয়াতের রয়েছে নিজস্ব হেদায়াত, শিক্ষা, বিধান এবং ঈমানি ও আমলি বহু ফায়েদা। তাই এসব ফায়েদা অর্জনের জন্য কুরআনের সব সুরা ও আয়াত তেলাওয়াত করা অত্যাবশ্যক।

* * *

মাতা-পিতার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজের সাওয়াব পাওয়া যায়!

জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই শুনে আসছি, মাতা-পিতার দিকে ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে নাকি কবুল হজের সাওয়াব পাওয়া যায়! বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে খ্যাতিমান বক্তাদের মুখেও কথাটি শোনা যায়। যখনই কথাটি শুনতাম,

---

১. *আল-ইলাল*, ইবনে আবি হাতেম: ৪/৫৭৮
২. *আল-মুন্তাখাব মিনাল ইলাল,* খাল্লাল, পৃ. ১১৭

কেমন যেন মনে হত। কেন যেন বিষয়টি 'মুনকার' (আপত্তিজনক) মনে হত। কিন্তু খোদ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এমন বলেছেন শুনে চুপ হয়ে যেতাম।

এ সম্পর্কে একটি হাদিস রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَتِهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلا كَانَ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، قَالُوا: وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ؟ قَالَ : نَعَمْ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطْيَبُ.

"যে কোনো নেক সন্তান যখন তার মায়ের দিকে রহমতের (দয়া ও মহব্বতের) দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার জন্য একটি মাবরুর (মাকবুল নফল) হজের সাওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. জিজ্ঞেস করলেন—'যদি প্রতিদিন একশবার তাকায়?' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—'হ্যাঁ, প্রতিদিন যদি শতবারও তাকায়। আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বড় ও পবিত্র।'"[১]

হাদিসটি বাইহাকি রহ. নাহশাল ইবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন।[২] কিন্তু নাহশাল অত্যন্ত দুর্বল একজন বর্ণনাকারী। ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ রহ. তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইবনে মাঈন এবং আবু দাউদ রহ. বলেন, সে কোনো কিছুই নয়। আবু সাঈদ আন-নাক্কাশ রহ. বলেন, সে জাহহাকের কাছ থেকে অনেক জাল বর্ণনা রেওয়ায়াত করেছে।[৩]

বাইহাকি রহ. মুহাম্মদ বিন হুমাইদের সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে—

مَا مِنْ وَلَدٍ يَنْظُرُ إِلَى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلا كَتَبَ اللهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورَةً...

'কোনো নেক সন্তান যদি তার মাতা-পিতার দিকে রহমতের (দয়া ও মহব্বতের) দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার জন্য একটি মাবরুর (মাকবুল নফল) হজের সাওয়াব লিখে দেন...।'[৪]

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কল্পনার চেয়েও বড় এবং তার কল্যাণ অসীম। আর তিনি কুদরত তথা শক্তি-সামর্থ্যের অক্ষমতা এবং ইচ্ছা ও ইরাদার ত্রুটি থেকে পবিত্র। সুতরাং একশবার তাকালে একশ মাবরুর হজের সওয়াব লিখে দিতে তিনি অক্ষম নন

২. *শুআবুল ঈমান*: ৭৪৭৫

৩. *তাহযিবুত তাহযিব*, হাফেজ ইবনে হাজার: ৪/২৪৪

৪. *শুআবুল ঈমান*, হাদিস ৭৪৭২, ১০/২৬৫

এই রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে হুমাইদ অত্যন্ত দুর্বল। হাফেজ যাহাবি রহ. তার সম্পর্কে বলেন, ইমামদের এক জামাত যদিও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন, তবে তাকে পরিত্যাগ করাই উত্তম। ইমাম ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ রহ. বলেন, সে অনেক আপত্তিজনক রেওয়ায়াত বর্ণনা করত। ইমাম বুখারি বলেন, তার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। আর ইমাম নাসায়ির মতে—সে নির্ভরযোগ্য নয়।[১]

তেমনিভাবে খতিব বাগদাদি রহ.-ও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারী 'বাহরুস সাক্কা' এর সূত্রে।[২] কিন্তু বর্ণনাকারী হিসেবে বাহরুস সাক্কা অত্যন্ত দুর্বল। হাফেজ যাহাবি রহ. বলেন, ইমামগণ তাকে 'ওয়াহি' (অত্যন্ত দুর্বল) সাব্যস্ত করেছেন। আর দারা কুতনি রহ. তাকে 'মাতরুক' (পরিত্যাজ্য) বলেছেন।[৩]

আলোচ্য হাদিসের বর্ণনাকারী সম্পর্কে এই হল মুহাদ্দিসদের বক্তব্য। হাদিসটি সম্পর্কে হাদিসের ইমামদের নানাবিধ বক্তব্য রয়েছে।

হাফেজ যাহাবি রহ. উপরোক্ত হাদিসকে 'মুনকার' (আপত্তিজনক) বলেছেন।[৪] আর জানা কথা, জাল কিংবা নিতান্ত দুর্বল হাদিসকেই 'মুনকার' বলা হয়। আর ফজিলতের ক্ষেত্রে যদিও দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য; কিন্তু জাল কিংবা মুনকার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা: মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণের ফজিলত এবং অসদাচরণের পরিণাম সম্পর্কে অনেক সহিহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে। কুরআন-হাদিসে মাতা-পিতাকে কষ্ট দিতে বারণ করা হয়েছে। আমরা এ কথাও জানি—কারও প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালে সে খুশি হয়, ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে সে কষ্ট পায়। সুতরাং মাতা-পিতার প্রতি দয়া ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকানোই কাম্য। এতেই সন্তানের কল্যাণ রয়েছে। তাই বলে এর ফজিলত প্রমাণে প্রশ্নবিদ্ধ কথার ব্যাপক প্রচার উচিত নয়।

* * *

---

১. *আল-কাশিফ*: ১/২৬৬
২. *তালখিসুল মুতাশাবিহ ফির-রাসমি*: ২/৮১৫
৩. *আল-কাশিফ*: ১/২৬৪; *মিযানুল ইতিদাল*: ২/৫; *তাহযিবুত তাহযিব*: ১/২১২
৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*: ১৯/২০৮

তেত্রিশ আয়াতের ফজিলতের কি কোনো ভিত্তি নেই?

এ সম্পর্কে ইবনে নাজ্জার রহ. হতে বর্ণিত রয়েছে—ইবনে সিরিন রহ. বলেছেন,[১] আমরা 'নাহরে তাইরি' নামক জায়গায় অবতরণ করলাম। সেখানকার লোকেরা আমাদেরকে বলল, 'তোমরা চলে যাও! কেননা এখানে যারাই অবস্থান করেছে, তাদের মাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।' আমার সকল সাথি চলে গেল। কিন্তু আমি হযরত ইবনে উমর রাযি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদিসটির কারণে থেকে গেলাম। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من قرأ في ليلة ثلاثا وثلاثين آية لم يضره في تلك الليلة سبع ضارى ولا طارى، وعوفي في نفسه تأهله وماله حتى يصبح.

'যে ব্যক্তি রাতের বেলা তেত্রিশ আয়াত পাঠ করবে, তাকে কোনো হিংস্র জন্তু অথবা কোনো আগন্তুক চোর ক্ষতি করতে পারবে না। আর সকাল পর্যন্ত তাকে, তার পরিবার-পরিজন ও তার মালামালকে রক্ষা করা হবে।'[২]

---

১. ولفظه: عن محمد بن سيرين قال: نزلنا نهر تيرى فأتانا أهل ذلك المنزل فقالوا: ادخلوا فانه لم ينزل هذا المنزل احد الا اخذ متاعه، فرحل اصحابي وتخلفت للحديث الذى حدثنى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ في ليلة ثلاثا وثلاثين آية لم يضره في تلك الليلة سبع ضارى ولا طارى، وعوفي في نفسه ئأهله وما له حتى يصبح فلما امسينا لم أنم حتى رأيتهم قد جاؤا أكثر من ثلاثين مرة مخترطين سيوفهم، فما يصلون الى، فلما اصبحت رحلت فلقينى شيخ منهم على فرس ذنوب منتكبا قوسا عربيا، فقال لى، يا هذا ! إنسى أم جنى ؟ قال قلت: بل إنسى من ولد آدم، قال: فما بالك لقد أتيناك أكثر من سبعين مرة كل ذلك يحال بيننا وبينك بسور من حديد ؟ قلت: حديث حدثنى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ ثلاثا وثلاثين آية في ليلة لم يضره في تلك الليلة لص طارى ولا سبع ضارى، وعوفي في نفسه وأهله وماله حتى يصبح ! قال: فنزل عن فرسه وكسر قوسه وأعطى الله تبارك وتعالى أن لا يعود فيها، والثلاث والثلاثون آية: أول آيات من أول البقرة إلى قوله: (المفلحون) وآية الكرسي واثنتان بعدها إلى قوله (خالدون) وثلاث آيات من آخر البقرة إلى آخرها وثلاث آيات من الاعراف: (إن ربكم الله) إلى قوله: (من المحسنين) وآخر بنى اسرائيل (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) إلى آخرها وعشر آيات من أول الصافات إلى قوله: (لازب) واثنتان من الرحمن (يا معشر الجن والانس أن استطعتم) إلى قوله: (فلا تنتصرون) ومن آخر الحشر (لو أنزلنا هذا القران) إلى آخرها واثنتان من (قل أوحى) إلى (وأنه تعالى جد ربنا) الى قوله: (شططا).
هذا الحديث لشعيب بن حرب فقال لى: كنا نسمها آيات الحرز، ويقال: إن فيها شفاء من مائة داء فعد على الجنون والجذام والبرص وغير ذلك فلم أحفظ، قال محمد ابن على فقرأتها على شيخ لنا قد فلج حتى أذهب الله عزوجل عنه ذلك.

২. হাদিসটি সনদের বিচারে দুর্বল। তবে ফজিলতের ক্ষেত্রে যেহেতু মুহাদ্দিসিনে কেরামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছু শর্ত সাপেক্ষে দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য। তাই উপরোক্ত হাদিসের উপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই।

সেই রাতে আমি ঘুমালাম না। এরপর দেখতে পেলাম তারা তলোয়ার খাপমুক্ত করে আমার কাছে ত্রিশবারেরও অধিক আসার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার কাছে পৌঁছাতে পারেনি। সকালবেলা আমি যখন চলতে শুরু করলাম, তখন তাদের এক সর্দার আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, 'তুমি মানুষ না জিন?' আমি বললাম, 'মানুষ।' সে বলল, 'আমরা সত্তরবারের বেশি তোমার কাছে আসলাম, যখনই এসেছি তোমার এবং আমাদের মাঝে লোহার একটি দেওয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তখন আমি তাকে উল্লিখিত হাদিসটি শোনালাম।

তেত্রিশ আয়াত হল, সুরা বাকারার ১-৫ ও ২৫৫-২৫৭ এবং ২৮৪-২৮৬ আয়াত; সুরা আরাফের ৫৪-৫৬; সুরা ইসরার ১১০-১১১; সুরা সাফফাতের ১-১১; সুরা আর-রাহমানের ৩৩-৩৫; সুরা হাশরের ২১-২৪ এবং সুরা জিনের ১-৪ আয়াতাবলি।

ইবনে সিরিন রহ. বলেন, আমি এই হাদিস সম্পর্কে শুআইব ইবনে হারবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমরা এটাকে 'আয়াতুল হিরয' বলি। বলা হয়, এতে একশ অসুখ থেকে মুক্তি রয়েছে। এরপর তিনি এগুলোর মধ্যে পাগলামি, কুষ্ঠরোগ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করলেন।'

হাদিসের একজন বর্ণনাকারী আবু মুহাম্মদ ইবনে আলি রহ. বলেন, আমাদের এক শায়খের অর্ধাঙ্গ হলে আমি তা পাঠ করলাম। আল্লাহ তায়ালা এর উসিলায় তার রোগ দূর করে দিলেন।[১]

তেত্রিশ আয়াত বা 'আয়াতুল-হিরযে'র ফজিলত সম্পর্কে এতটুকুই পাওয়া যায়। এ ছাড়া অভিজ্ঞতার আলোকেও এর অনেক উপকারিতা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে। যেমন *আমালে কোরআনি* গ্রন্থে আছে, এগুলো যথারীতি পাঠ করলে জাদুটোনা, ভূত, দেওদানব, চোর-ডাকাত এবং সকল প্রকার আপদ-বিপদ দূর হয়। তা ছাড়া এই তেত্রিশ আয়াতের মধ্যে আয়াতুল কুরসিও রয়েছে। রাতে শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পাঠ করার কথা বলেছেন, যা সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[2] সুতরাং শয়তান, জিন, জাদুটোনা ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য তেত্রিশ আয়াত পড়তে কোনো অসুবিধা নেই।

---

১. *যাইলু তারিখি বাগদাদ*, ইবনে নাজ্জার: ৩/২৫৩-২৫৫, *আদ-দুররুল মানসুর*, সুয়ুতি: ১/১৫০-১৫২; *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*: ৫/১৩৪

২. *সহিহ বুখারি*, ৩২৭৫

উল্লেখ্য, তেত্রিশ আয়াতের শুরুতে সুরা ফাতেহা এবং শেষে চার কুল (সুরা কাফিরুন, সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক, সুরা নাস) পড়া তেত্রিশ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে শাহ ওলিউল্লাহ রহ. এগুলো মিলিয়ে পড়তে পছন্দ করতেন, যেমনটি *শিফাউল আলিল* গ্রন্থে রয়েছে। তাই এগুলোও পড়ে নেওয়া ভালো। কেননা হাদিস শরিফে এগুলোরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

* * *

নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণ কি অবৈধ?

নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণের বৈধতা আলেমদের নিকট স্বীকৃত একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন। দ্বিমত পোষণকারীগণ এটিকে বৈধই মনে করেন না। অথচ বাস্তবতা হল, সাহাবিগণ যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওযুর পানি, তার চুল, তার ঘাম, তার ব্যবহৃত পাত্র ইত্যাদি দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন, তেমনিভাবে নবিজির পরবর্তী কালেও নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণের ধারাবাহিকতা আলেমদের মধ্যে চালু ছিল।

নবি ও নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণের বৈধতা অসংখ্য রেওয়ায়াত থেকে প্রমাণিত। নিচে দুটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হল,

ক. আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব রহ. বলেন, আমাকে আমার পরিবারের লোকেরা এক পেয়ালা পানিসহ উম্মে সালামা রহ. এর কাছে পাঠাল। (উম্মে সালামার কাছে রক্ষিত) একটি পানির পাত্র হতে (আনাসের পুত্র) ইসরাঈল তিন আঙুল দিয়ে ধরে তুললেন। ওই পাত্রের মধ্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি চুল ছিল। কারও চোখ লাগলে (নজর লাগলে) কিংবা কোনো রোগ দেখা দিলে উম্মে সালামার নিকট হতে পানি আনার জন্য একটি পাত্র পাঠিয়ে দিত। আমি সে পাত্রের মধ্যে এক বার তাকালাম। দেখলাম তাতে লাল রং এর কয়েকটি চুল।[১]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে— কেউ অসুস্থ হলে উম্মে সালামা রাযি. এর কাছে পাত্র দিয়ে লোক পাঠাত, আর তিনি এতে ওই চুলগুলো রাখতেন এবং চুলগুলো পাত্রে ধৌত করে সেটি পাঠিয়ে দিতেন। পাত্রের মালিক

১. *সহিহ বুখারি:* ৫৮৯৬

সুস্থতার উদ্দেশ্যে এর পানি পান করত বা এর দ্বারা গোসল করত। এভাবে সে এর বরকত পেত।[1]

খ. আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— উম্মে সুলাইম রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন, আর নবিজি ওই চামড়ার বিছানার উপর কাইলুলা (দুপুরে বিশ্রাম) করতেন। অতঃপর তিনি যখন ঘুম থেকে উঠতেন, তখন তার শরীরের কিছুটা ঘাম ও চুল সংগ্রহ করে তিনি তা বোতলের মধ্যে জমা করতেন এবং পরে 'সুক্ক' নামক সুগন্ধিতে মিশাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আনাস ইবনে মালিক রাযি. এর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি অসিয়ত করলেন— 'ওই সুক্ক থেকে কিছুটা যেন তার (কাফনের) সুগন্ধির সাথে মিলানো হয়।' অতঃপর তা তার সুগন্ধিতে মেশানো হয়েছিল।

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শঙ্কিত হয়ে জাগ্রত হলেন এবং বললেন, 'তুমি কী করছ?' তিনি বললেন, 'আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকত কামনা করছি।' তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঠিক কাজই করছ।[2]

লক্ষণীয় বিষয় হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে সুলাইম রাযি. এর কাজকে সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। এই হাদিস থেকে বরকত গ্রহণের বৈধতার বিষয়টি সুস্পষ্ট। এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত আরও অনেক রয়েছে। খোলাফায়ে রাশিদিন এবং পরবর্তী সময়ের আলেমদের নীতিও এমনই ছিল। *সহিহ বুখারিতে* (৩৯৯৮) বর্ণিত হয়েছে— রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাযি. এর নিকট ওই বর্শাটি চাইলেন, যা দিয়ে আবু যাতিল-কার্‌শকে তিনি হত্যা করেছেন। এরপর মৃত্যু অবধি এটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছেই রইল। তার মৃত্যুর পর তিনি এটি নিয়ে যান। পরবর্তীতে আবু বকর রাযি. (তার খেলাফতকালে) এটি চাইলে তিনি তাকে বর্শাটি দিয়ে দেন। আবু বকরের মৃত্যুর পর উমর রাযি. এটি চাইলেন। তিনি তাকেও বর্শাটি দিয়ে দেন। কিন্তু উমরের মৃত্যুর পর যুবাইর রাযি. পুনরায় বর্শাটি নিয়ে যান। এরপর উসমান রাযি. তার নিকট বর্শাখানা চাইলে তিনি তাকেও তা দিয়ে দেন। তবে তার শাহাদাতের পর তা আলি রাযি. এর লোকজনের হাতে যাওয়ার পর ইবনে যুবাইর রাযি. তা চেয়ে নিয়ে যান। অতঃপর শহিদ হওয়া পর্যন্ত বর্শাটি তার কাছেই ছিল।

---

১. *ফাতহুল বারি:* ১০/৩৫৩
২. *সহিহ মুসলিম:* ২৩৩৩

এই বর্ণনায় লক্ষণীয় হল, খোলাফায়ে রাশিদিনের সবাই বর্শাটির হেফাজতের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এটি শুধু এজন্য—বর্শাটি দীর্ঘকাল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল। তাই তারা এর বরকত গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

তেমনিভাবে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.-ও নবিজির নিদর্শনগুলোর হেফাজতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এজন্যই তিনি যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদসমূহ নির্মাণ করলেন, তখন লোকদেরকে তিনি সেসব মসজিদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যেগুলোতে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজ পড়েছেন। এরপর সেগুলোকে খোদাইকৃত উপযোগী পাথর দ্বারা পুণঃনির্মাণ করেন। (*তাকমিলা:* ৩/৩৬৬-৩৬৭)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নবিজির ওযুর পানি, তার চুল, ঘাম, ব্যবহৃত পাত্র ইত্যাদি দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। তাদের পরবর্তী সময়েও নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণের এরকম ধারাবাহিকতা চালু ছিল। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী রহ. এর জুব্বা দ্বারা বরকত গ্রহণ করতেন। আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া নিশাপুরী রহ. ছিলেন অত্যন্ত নেক ও ইবাদতগুজার আল্লাহর এক বান্দা। তার মৃত্যুর পর আহমদ রহ. এর কাছে তার ব্যবহৃত একটি জুব্বা নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া একজন নেক মানুষ ছিলেন। এই জুব্বা পরেই তিনি আল্লাহর আনুগত্য করেছেন। সুতরাং আমি এর দ্বারা বরকত গ্রহণ করব।[১]

বোঝা গেল— নেককারদের নিদর্শন থেকে বরকত গ্রহণ শরিয়তবিরোধী কোনো কাজ নয়।

* * *

আশুরার দিন ভালো খাবারের আয়োজন কি মুস্তাহাব?

সাধারণ মানুষের কাছে আশুরার দিনের প্রসিদ্ধ একটি আমল হল, পরিবারের লোকদের জন্য ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কে একটি হাদিসও

---

১. *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ*, ইবনে মুফলিহ: ২/২৩৫

লোকমুখে প্রসিদ্ধ রয়েছে। হযরত জাবির রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ.

'যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবার-পরিজনের জন্য সচ্ছলতার ব্যবস্থা করবে, আল্লাহপাক পূর্ণ বছর তাকে সচ্ছলতার সাথে রাখবেন।'[১]

হাদিসটি হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَزَلْ فِي سَعَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ.

'যে ব্যক্তি আশুরার দিন তার পরিবার-পরিজনের জন্য সচ্ছলতার ব্যবস্থা করবে, সে পুরো বছর সচ্ছলতার মধ্যে থাকবে।'[২]

এ ছাড়াও হযরত আবু হোরায়রা এবং আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩] এই হাদিসের প্রচার থেকেই আমাদের সমাজে আশুরার দিনে পরিবার-পরিজনের জন্য ভালো খাবার আয়োজনের প্রসার ঘটেছে। বিশেষত বক্তাদের বয়ানেও এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে শোনা যায়। কিন্তু যে হাদিসের ভিত্তিতে এই আমলের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়, সেই হাদিসটির ব্যাপারে হাদিসবিশারদগণ কী বলেছেন, তা-ও যেচে দেখা প্রয়োজন।

* ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, হাদিসটি সহিহ নয়।[৪]

* উকাইলি রহ. বলেন, এ বিষয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছুই প্রমাণিত নয়। হ্যাঁ, ইবরাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশির থেকে কথাটি বর্ণিত হয়েছে।[৫]

* ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিস সম্পর্কে উকাইলি রহ. বলেন, হাদিসের সনদে থাকা আলি ইবনে মুহাজির এবং হাইসাম (হাদিসের দুজন বর্ণনাকারী) মাজহুল (তারা নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য, তা জানা যায় না)। এবং উক্ত হাদিসটি সঠিক নয়।[৬]

---

১. *তাবারানি কাবির*: ১০০০৭; *শুআবুল ঈমান*: ৩৫১২
২. *শুআবুল ঈমান*: ৩৫১৩
৩. *শুআবুল ঈমান*: ৩৫১৪-৩৫১৫
৪. *আল-মানারুল মুনিফ*, ইবনে কাইয়িম:১১২
৫. *আয-যুআফা*: উকাইলি: ৩/২৫২
৬. *আয-যুআফা*: উকাইলি: ৩/২৫২

* হাফেয যাহাবি রহ. আলি ইবনে মুহাজির (হাদিসের রাবি) সম্পর্কে বলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আর হাদিসটি জাল।[১]

* হযরত আবু হোরায়রা রাযি. এর হাদিস সম্পর্কে উকাইলি রহ. বলেন, সুলাইমান (হাদিসের রাবি) মাজহুল (অর্থাৎ তিনি নির্ভরযোগ্য না অনির্ভরযোগ্য, তা জানা যায় না) আর হাদিসটি সঠিক নয়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো মারফু হাদিসে কথাটি বর্ণিত হয়নি।[২]

* আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. আশুরার দিনে ভালো খাবারের ব্যবস্থা করা, খেযাব লাগানো, সুরমা লাগানো ইত্যাদির কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এগুলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যারোপ করা হয়েছে। আশুরার দিনে রোজা রাখার বিষয়টি ছাড়া কোনো কিছুই সহিহভাবে প্রমাণিত হয়নি।[৩] তিনি বলেন, সর্বোচ্চ এটুকু বলা যেতে পারে—এটা মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশিরের বক্তব্য।'[৪]

* যারকাশি রহ. বলেন, এটি প্রমাণিত নয়। এটি তো মুহাম্মদ ইবনে মুনতাশিরের বক্তব্য।[৫]

* আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন, এর সনদ সহিহ নয়। হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তবে কোনোটিই সহিহ নয়।[৬]

* হাফেয ইবনে হাজার রহ. এই হাদিস সম্পর্কে বলেছেন, মুনকারুন জিদ্দান (অত্যন্ত আপত্তিজনক)।[৭]

মুহাদ্দিসিনে কেরামের উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে বোঝা যায়—হাদিসটি ভিত্তিহীন। কিন্তু এর বিপরীত অনেক মুহাদ্দিসের বক্তব্য পাওয়া যায়, যারা হাদিসটিকে যয়িফ মনে করেন; হাদিসটি জাল এ কথা মানতে তাঁরা রাজি নন।

যেমন সাখাভি রহ. *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ* গ্রন্থে (পৃ. ৪৩১), সুয়ুতি রহ. তার *আত-তাআক্কুবাত* ও *আল-লাআলিল-মাসনুআহ* গ্রন্থে (২/১১১-১১৪), ইবনে আররাক রহ. তার *তানযিহুশ শারিয়াহ* গ্রন্থে (২/১৫৭-১৫৮), মোল্লা আলি

---

১. *মিযানুল-ইতিদাল*: ৫/১৯১
২. *আল-মওযুআত*, ইবনে জাওযি: ২/৫৭৩
৩. *মিনহাজুস-সুন্নাহ*: ৭/৩৯; *মাজমুউল-ফাতাওয়া* ইবনে তাইমিয়া: ২৫/১৬৮
৪. *মাজমুউল-ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া: ২৫/১৬৮; আরও দেখুন, *আয-যুআফা*, উকাইলি: ৩/২৫২
৫. *আল-আসরারুল মারফুআহ*, মোল্লা আলি কারি রাহি.: ৩৪৫; *কাশফুল-খাফা*, আজলুনি: ২/৩৩৭
৬. *লাতাইফুল-মাআরিফ*: ১১৩
৭. *লিসানুল মিযান*: ৬/৩৩৮, ৮/৩৬৬, ৮/৫৩৯

কারি রহ. তার *আল-আসরারুল মারফুআহ* গ্রন্থে (পৃ. ৩৪৫), মুনাভি রহ. *ফাইযুল কাদির* গ্রন্থে (৬/২৩৫), আজলুনি রহ. *কাশফুল-খাফা* গ্রন্থে (২/৩৩৭-৩৩৮), লাখনৌভি রহ. *আল-আসারুল-মারফুআহ* গ্রন্থে (পৃ. ১০০) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের আলোচনার সারাংশ হল, হাদিসটি দুর্বল; জাল নয়।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, আমি ষাট বছর যাবৎ পরীক্ষা করে (অর্থাৎ ষাট বছর আশুরার দিন ভালো খাবারের ব্যবস্থা করে) এটাকে সঠিক পেয়েছি।[১]

বাইহাকি রহ. উক্ত হাদিসকে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করে বলেন, যদিও সনদগুলো যয়িফ, কিন্তু যেহেতু হাদিসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাই একটি সূত্র অপর সূত্রকে শক্তিশালী করছে।[২]

আল্লামা সুয়ুতি রহ. তার *আত-তাআক্কুবাত* গ্রন্থে যারা হাদিসটিকে ভিত্তিহীন বলেছেন, তাদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'কখনও নয়, বরং হাদিসটি সহিহ ও প্রমাণিত।'[৩]

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. মুহাদ্দিসিনে কেরামের বক্তব্যগুলো সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—হাদিসটি জাল নয়, বরং যয়িফ। এ কারণেই তিনি *আল-মানারুল মুনিফ* গ্রন্থের (শেষে) হাদিসগুলোকে দুভাগে ভাগ করেছেন:

ক. যেগুলো জাল নয়।
খ. যেগুলো জাল।

আর উক্ত হাদিসকে প্রথম প্রকারে উল্লেখ করেছেন।

আমাদের করণীয়: যেহেতু অনেক মুহাদ্দিস উল্লিখিত হাদিসকে ভিত্তিহীন এবং খুবই আপত্তিজনক বলেছেন, আর দলিলের আলোকেও তাদের কথাই বেশি সঠিক, তাই এই দিনে ভালো খাবারের আয়োজন করা মুস্তাহাব হবে না, এ কথা সুস্পষ্ট। সুতরাং এই আমলের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়া এবং আলোচ্য হাদিসের প্রচার-প্রসার না করাই উচিত। কিন্তু যেহেতু অনেক মুহাদ্দিস হাদিসটিকে ভিত্তিহীন মানতে নারাজ; বরং তাদের মতে হাদিসটি অনেক সনদের কারণে অন্তত আমলযোগ্য যয়িফ, তাই কেউ যদি তাদের অনুসরণে উক্ত হাদিসের উপর

---

১. *মাজমুউল-ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া: ২৫/১৬৮
২. *শুআবুল ঈমান:* ৫/৩৩৩
৩. *কাশফুল-খাফা*, আজলুনি: ২/৩৩৭; *আল-আসরারুল-মারফুআহ:* ৩৪৫

আমল করে, বা এর প্রচার-প্রসার করে, তা হলে এ নিয়ে ঝগড়াবিবাদ করা কোনো ক্রমেই উচিত নয়। কারণ সহিহ, যয়িফ সাব্যস্ত হওয়া একটি ইজতিহাদি বিষয়; অকাট্য কোনো বিষয় নয়।

* * *

জমজমের পানি কি দাঁড়িয়ে পান করা জরুরি?

জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার বিধান নিয়ে আমাদের মাঝে অনেক ধরনের আবেগ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করার জন্য ওয়াজিব বা ফরজ পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার গুরুত্ব ফরজ বা ওয়াজিব পর্যায়ের নয়। মুস্তাহাব কিনা, তা নিয়েও রয়েছে নানাবিধ বিশ্লেষণ।

বিভিন্ন হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোনো পানীয় দাঁড়িয়ে পান করা থেকে বারণ করেছেন। যেমন হযরত আনাস রাযি. এবং আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে পান করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন।[১]

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ.

‘তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। যে ব্যক্তি ভুলে যাবে (ভুলে দাঁড়িয়ে পান করে ফেলবে), সে যেন বমি করে নেয়।’[২]

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ، لَاسْتَقَاءَهُ.

‘যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পান করে, সে যদি জানত তার পেটে কী আছে, তা হলে বমি করে দিত।’[৩]

---

১. *সহিহ মুসলিম:* ২০২৫
২. *সহিহ মুসলিম:* ২০২৭
৩. *মুসনাদে আহমদ:* ৭৮০৮; *সহিহ ইবনে হিব্বান:* ৫৩২৪

এই হাদিসে দাঁড়িয়ে পান করার নিষেধবার্তা খুবই কঠোর বুঝা যাচ্ছে।

প্রশ্ন হল, এই নিষেধাজ্ঞাটি কোন পর্যায়ের? হারাম না মাকরুহে তাহরিমি (হারাম পর্যায়ের মাকরুহ)? হাদিসের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালে বোঝা যায়—উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞাটি মাকরুহে তানযিহি (সাধারণ মাকরুহ)। কারণ উক্ত হাদিসগুলোতে যেমন দাঁড়িয়ে পান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে অন্যান্য অনেক হাদিসে দাঁড়িয়ে পান করার অনুমতিও প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—[১] হযরত আলি রাযি. 'রাহাবাতুল কুফা'র (কুফার প্রশস্ত একটি স্থানের) ফটকে এসে দাঁড়িয়ে পান করলেন। এরপর বললেন, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ (তাহরিমি) মনে করে, অথচ আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি এমনি করেছেন (দাঁড়িয়ে পান করেছেন), যেমন তোমরা আমাকে করতে দেখেছ।'[২]

আর জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,[৩] 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দণ্ডায়মান অবস্থায় জমজমের পানি পান করিয়েছি।'[৪]

এ ধরনের আরও কিছু হাদিস ও আসার থেকে দাঁড়িয়ে পান করার বৈধতা প্রমাণিত হয়; চাই তা জমজমের পানি হোক বা অন্য পানীয় হোক।

ফকিহগণ নিষেধাজ্ঞা ও বৈধতাসংক্রান্ত হাদিসগুলোকে সামনে রেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যদিও স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়ে পান করা মাকরুহ, কিন্তু এই মাকরুহ হচ্ছে মাকরুহে তানযিহি। এই নিষেধ থেকে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান করা হারাম বা 'মাকরুহে তাহরিমি' মনে না করে, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও কখনও দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

আমাদের আলোচনা হল জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা নিয়ে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রহ. এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন,[৫] 'এই দুই

---

১. ولفظه : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ.

২. *সহিহ বুখারি:* ৫৬১৫-৫৬১৬

৩. ولفظه : سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

৪. *সহিহ বুখারি:* ১৬৩৭; *সহিহ মুসলিম:* ২০২৭

৫. ولفظه : والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائما في هذين الموضعين محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما، ولعل الاوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب، لان ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء.

স্থানে (জমজম এবং ওযু শেষে) দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব হওয়া তো দূরের কথা, মাকরুহ হবে কিনা সেটাই আলোচনার বিষয়। এরপর বলেন, মুস্তাহাব না বললেও মাকরুহ না হওয়াই সম্ভবত বেশি গ্রহণযোগ্য মত।[১]

তেমনিভাবে আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. বলেন, জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা যদিও 'বেলা-কারাহাত' (মাকরুহ হওয়া ছাড়াই) জায়েয, তথাপি এটি মুস্তাহাব নয়।[2]

প্রশ্ন হল, তা হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করলেন? এর উত্তরে আলেমদের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। যেমন—

ক. হাফেজ ইবনে হাজার রহ. আল্লামা আইনি রহ. এবং শায়খ যাকারিয়া আনসারি রহ.-সহ অনেকের বক্তব্য—জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ, এ কথা বোঝানোর জন্যই নবিজি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[৩]

খ. কারও কারও মতে—জমজমের পাশে ভিড় থাকায় এবং বসার সুযোগ না থাকায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে তা পান করেছেন।[৪]

অবশ্য কেউ কেউ জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব মনে করেন। কারণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন।[৫]

জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা জরুরি মনে করা কিংবা কেউ বসে পান করলে তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন, এ কারণে কেউ যদি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব মনে করে এবং তা পান করার সময় দাঁড়ায়, তাহলে তাকে বাধা দেওয়ারও সুযোগ নেই।

* * *

---

১. *ফতোয়ায়ে শামি*: ১/২৫৫

২. *দরসে তিরমিজি*: ৩/২৫৩

৩. *ফাতহুল বারি*: ৪/৫৭০; ৪/১২২; *উমদাতুল কারি*: ৯/৩৯৯; *মিনহাতুল বারি শরহু সহিহ বুখারি*: ৪/১২২

৪. *উমদাতুল কারি*, আল্লামা আইনি ৯/৩৯৯; *ইকমালুল মুলিম*, কাযি ইয়ায ৬/৪৯২; *তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম*, তাকি উসমানি: ৪/১৪

৫. *ফতোয়ায়ে শামি*: ১/২৫৫, *খাসাইলে নাবাওয়ি*, যাকারিয়া কান্ধলভি: ২১৩

ইবাদত

জামাত চলাকালীন ফজরের সুন্নত ও কিছু কথা

ফজরের ওয়াক্ত। একটি মসজিদে বসে আছি। একজন কুরআন তেলাওয়াত করছে; অন্য কিতাবও পড়ছে। জামাতের সময় ঘনিয়ে এলেও তার মাঝে কোনো ভাবান্তর লক্ষ করা যাচ্ছে না। ইকামত শুরু হলে ধীরে ধীরে সে দাঁড়াল। কাতারের কাছাকাছি এসে সুন্নত পড়া শুরু করল।

একটিমাত্র চিত্র তুলে ধরলাম। এটা শুধু একজনের বা একদিনের ঘটনা নয়; এ ধরনের গাফলত প্রায়ই নজরে পড়ে। কেউ কেউ হয়ত মসজিদে আগে থেকে বসা থাকেন না; জামাত শুরু হলেই উপস্থিত হন। কিন্তু জামাত চলাকালীন কাতারের সাথে ঘেঁষে সুন্নতে দাঁড়ান।

ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব অনেক। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে, তার চেয়ে উত্তম।[১]

তেমনিভাবে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নতকে অন্যান্য সুন্নত বা নফলের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতেন।[২]

ফজরের সুন্নতের গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণেই হয়ত অনেকে ইকামত শুরু হয়ে গেলেও সুন্নত পড়া শুরু করেন। কিন্তু কথা হল,শুধু সুন্নতের গুরুত্বের দিকে লক্ষ করলেই হবে না, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাতে দাঁড়ানোর পর ফরজ ব্যতীত অন্য নামাজ পড়তে নিষেধ করেছেন, সেটাও লক্ষ রাখতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জামাত দাঁড়িয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য নামাজ পড়া বৈধ নয়।[৩]

---

১. *সহিহ মুসলিম:* ৭২৫; *সুনানে তিরমিজি:* ৪১৬

২. *সহিহ বুখারি:* ১১৬৩

৩. *সহিহ মুসলিম:* ৭১১; *সুনানে আবু দাউদ:* ১২৬৬; *সুনানে তিরমিজি:* ৪২১

ফজরের সুন্নতের ফজিলত লাভের জন্য আমরা ঘর থেকেই সুন্নত পড়ে আসতে পারি। অথবা আগে আগে মসজিদে এসে জামাত শুরুর আগেই সুন্নত সম্পন্ন করতে পারি। অযথা বা অন্য কোনো নফল ইবাদতে মগ্ন হয়ে, অলসতা করে ফজরের সুন্নতকে জামাতের সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়। কোনো কারণে মসজিদে আসতে দেরি হয়ে গেলে এবং মসজিদে এসে জামাত শুরু হয়ে যেতে দেখলে যদি মনে হয়—সুন্নত পড়ে জামাতের সাথে অন্তত এক রাকাত পাওয়া যাবে, তাহলে মসজিদের বাইরে—বারান্দায় অথবা কাতার থেকে দূরে খুঁটির আড়ালে সুন্নত পড়তে হবে। একাধিক সাহাবি ও তাবেয়ি থেকে ইকামত শুরু হওয়ার পর জামাত চলাবস্থায় ফজরের সুন্নত আদায় করা প্রমাণিত আছে। যেমন—

ক. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু মুসা আশআরি ও হুযায়ফা রাযি. এক বার সাঈদ ইবনে আসের নিকট থেকে বের হলেন। ইতোমধ্যে ফজর নামাজের ইকামত হয়ে গেল। তখন ইবনে মাসউদ রাযি. দুই রাকাত সুন্নত পড়ে লোকদের সাথে নামাজে শরিক হলেন, আর আবু মুসা আশআরি ও হুযায়ফা রাযি. কাতারে প্রবেশ করলেন।[১]

খ. আবু মিজলায রহ. বলেন, আমি ফজর নামাজে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর সাথে মসজিদে এমন সময় প্রবেশ করলাম, যখন ইমাম সাহেব নামাজ পড়াচ্ছিলেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. দুই রাকাত সুন্নত পড়ে ইমামের সাথে শরিক হলেন। আর ইবনে ওমর রাযি. ইমামের সাথে নামাজে শরিক হয়ে গেলেন। ইমাম সালাম ফেরানোর পর তিনি সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থেকে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন।[২]

গ. আবু দারদা রাযি. বলেন, আমি এক বার লোকদের নিকট এমন সময় আসি, যখন তারা কাতারবদ্ধ হয়ে ফজর নামাজ আদায় করছিল। আমি তখন ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করে তাদের সাথে জামাতে শরিক হই।[৩]

সাহাবি এবং তাবেয়িদের বর্ণনা, আমল ও ঘটনাবলি থেকে এ কথা সুপ্রমাণিত—ফজরের ইকামত চলার সময় বা ইকামতের পরও মসজিদের বাইরে বা কাতার থেকে দূরে, মসজিদের বারান্দায় বা কোনায় কিংবা খুঁটির আড়ালে ফজরের সুন্নত পড়া জায়েজ আছে। তবে এ কথা সত্য—কিছুসংখ্যক সাহাবা إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ‘নামাজের ইকামত হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ আদায় করা যাবে না’—এই হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইকামত

---

১. *শরহু মাআনিল-আসার: ১/২৫৫*
২. প্রাগুক্ত ১/২৫৫
৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা: হাদিস ৬৪৮২*

শুরু হওয়ার পর ফজরের সুন্নত পড়তেন না; বরং জামাতে শরিক হয়ে যেতেন। যেমন আবু হুরায়রা রাযি., হুযায়ফা রাযি., তাবেয়িদের মধ্যে ইবনে সিরিন রহ., ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির রহ. প্রমুখ। কিন্তু যেসব সাহাবি এবং তাবেয়ি ইকামত চলাকালে বা ইকামতের পরে মসজিদে বা মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নত পড়েছেন, তাদের তারা কোনোরূপ তিরস্কার করেননি। যেমন পূর্বে উল্লেখিত ইবনে মাসউদ, আবু মুসা আশআরি ও হুযায়ফা রাযি. এর ঘটনা, আবু মিজলাযের বর্ণনায় ইবনে ওমর ও ইবনে আব্বাসের ঘটনা এবং আবু উসমান নাহদির বর্ণনায় ওমর রাযি. এর ঘটনা। এ সময় ফজরের সুন্নত পড়া যদি নাজায়েজ, হারাম বা বেদআতই হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম অবশ্যই এমন নাজায়েজ ও হারাম কাজ করতে বাধা দিতেন। কেননা তারা কোনো নাজায়েজ বা হারাম কাজকে কিছুতেই বরদাশত করতেন না।

মূলত এ মাসআলায় শুরু থেকেই সাহাবি ও তাবেয়িদের মাঝে দুই ধরনের মতামত ও আমল চালু ছিল। তাদের এক জামাত إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة— এ হাদিসের উপর ভিত্তি করে ইকামত শুরু হওয়ার পর কোনো নামাজের পূর্বে সুন্নত পড়তেন না; এমনকি ফজরের সুন্নতও না। বিপরীতে অনেক সাহাবি ও তাবেয়ি ফজরের সুন্নত অন্য সকল সুন্নত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে এবং বিভিন্ন দিক থেকে ফজরের সুন্নত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ার কারণে তারা ইকামত শুরু হওয়ার পরও তা আদায় করে নিতেন এবং إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة এ হাদিসের নিষেধাজ্ঞা থেকে ফজরের সুন্নতকে ভিন্ন মনে করতেন।

এ ক্ষেত্রে মসজিদের বাইরে অথবা কাতার থেকে দূরে খুঁটির আড়ালে জায়গা না পাওয়া গেলে তখনই সুন্নত না পড়ে সূর্যোদয়ের পরে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিতে হবে। কিন্তু জামাত চলাকালীন কাতার ঘেঁষে সুন্নত পড়া উচিত হবে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নত আদায় করতে পারেনি, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নেয়।'[১] তা ছাড়া স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও ফজরের সুন্নত ছুটে গেলে সূর্যোদয়ের পর আদায় করে নিতেন।[২]

এই মাসআলায় উপরোক্ত চরম পর্যায়ের শিথিলতা এবং ছাড়াছাড়ির পাশাপাশি বাড়াবাড়িও কম নয়। কেউ কেউ খুব জোর দিয়ে বলেন, জামাত

---

১. *জামে তিরমিজি:* ৪২৩
২. *সুনানে ইবনে মাজা:* ১১৫৫

দাঁড়ানোর পর সুন্নত পড়ার কোনো সুযোগই নেই। এটা সম্পূর্ণ নিষেধ! অথচ সাহাবায়ে কেরাম জামাত চলাকালীন মসজিদের বহিরাংশে বা খুঁটির আড়ালে বা কাতার থেকে দূরে সুন্নত পড়েছেন!

আল্লাহ তায়ালা আমাদের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে হেফজত করুন। সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন। আমিন।

* * *

ইশরাক ও চাশত কি একই নামাজের দুই নাম?

আমাদের এই অঞ্চলে সবাই ইশরাক ও চাশতের নামাজকে ভিন্ন ভিন্ন নামাজ হিসেবেই জানেন এবং এভাবেই আমল করেন। তবে অনেকে দুটিকে একই নামাজ হিসেবে প্রচার করছেন। বাস্তবে দুটি এক নামাজ নয়; বরং দুই নামাজ হওয়াই অধিক প্রমাণপুষ্ট।

শাব্দিক অর্থের বিবেচনায় ইশরাক এবং দুহা কাছাকাছি অর্থের শব্দ।[১] সূর্য উদিত হওয়ার পর মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত পুরো সময়কেই ইশরাক ও দুহা বলা হয়। তবে ফকিহদের পরিভাষায় উভয় সময়ের মাঝে একটু পার্থক্য রয়েছে। ইশরাক হল উক্ত পুরো সময়ের শুরুর অংশ, এবং দুহা হল সূর্য খুবই আলোকিত হয়ে সূর্যের তাপ খুব প্রখর হওয়ার অংশ। এ থেকেই বুঝা যায়—ইশরাক ও দুহা বা চাশত দুটি এক নামাজ নয়। তা ছাড়া সালাতুল ইশরাক ও সালাতুদ্দুহা বা চাশতের নামাজ যে ভিন্ন ভিন্ন দুটি নামাজ, সেটি দুই নামাজসংক্রান্ত হাদিসের বচনভঙ্গী এবং এর ফজিলতের দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দিলেও বুঝা যায়। আমরা উভয় নামাজসংক্রান্ত কয়েকটি করে হাদিস গভীর দৃষ্টিতে দেখব।

---

১. اشراق (ইশরাক) শব্দটি شرقت الشمس شروقا وشرقا অর্থ সূর্য উদিত হওয়া এবং أشرقت الشمس اشراقا অর্থ আলোকিত হওয়া থেকে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হিসেবে صلاة الاشراق (সালাতুল ইশরাক) এর অর্থ হবে—সূর্য উদিত হওয়া অথবা আলোকিত হওয়ার সময়ের নামাজ। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পরে মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর যে নামাজ পড়া হয়, সেটাকেই সালাতুল ইশরাক বলা হয়।
আর ضحى (দুহা) সম্পর্কে অভিধান শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব 'আস-সিহাহ'-এ বলা হয়েছে, الضحى حين تشرق الشمس। দুহা হচ্ছে—যখন সূর্য উদিত হয়, বা আলোকিত হয়। তবে অভিধান শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল-মুহকাম'-এ এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে—هو من طلوع الشمس الى أن يرتفع النهار وتبيض جدا। দুহা হচ্ছে, সূর্য উদিত হওয়া থেকে পুরোপুরি দিন প্রকাশ পাওয়া এবং সূর্য খুব আলোকিত হয়ে যাওয়া (যাতে কোনো ধরনের অন্ধকার থাকবে না) সেই সময় পর্যন্ত। —*তাজুল আরুস*: ৩৮/৪৫৪

সালাতুদ্দুহা বা চাশতের নামাজ-সংক্রান্ত হাদিস

যেসব হাদিসে সালাতুদ্দুহা তথা চাশতের নামাজের কথা এসেছে, সেগুলোর কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ—

ক. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন,

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

'আমার বন্ধু (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন: প্রতি মাসে তিন দিন করে রোজা পালন করা, দুই রাকাত সালাতুদ্দুহা পড়া এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর সালাত আদায় করা।'[১]

খ. হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

'আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর সদকা আবশ্যক করে। আর প্রতিবার সুবহানাল্লাহ বলা সদকা; আলহামদুলিল্লাহ বলাও সদকা; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলাও সদকা; আল্লাহু আকবার বলাও সদকা। সৎ কাজের আদেশ করাও একটি সদকা, অন্যায় হতে নিষেধ করাও সদকা। আর এ সবকিছুর পরিপূরক হতে পারে চাশতের দুই রাকাত নামাজ।'[২]

গ. হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার রাকাত চাশতের নামাজ পড়তেন। আবার আল্লাহর মর্জি হলে তার বেশিও পড়তেন।'[৩]

ঘ. উম্মে হানি রাযি. থেকে বর্ণিত— 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আট রাকাত চাশতের সালাত আদায় করেছেন। তিনি প্রতি দুই রাকাতে সালাম ফিরিয়েছেন।'[১]

---

১. *সহিহ বুখারি: ১৯৮১; সহিহ মুসলিম: ৭২১*

২. *সহিহ মুসলিম: ৭২০; সুনানে আবু দাউদ: ১২৮৫*

৩. *সহিহ মুসলিম: ৭১৯; সুনানে ইবনে মাজা: ১৩৮১*

ঙ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إلا أَوَّابٌ. قَالَ: وَهِيَ صَلاةُ الأَوَّابِينَ.

'চাশতের নামাজের প্রতি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিরাই যত্নশীল হয়। আর এটি হচ্ছে, সালাতুল আওয়াবিন।'[২]

চ. হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তি চাশতের বারো রাকাত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।'[৩]

ছ. হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. একদল লোককে (সূর্য উদিত হওয়ার পর, মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পরপর) চাশতের নামাজ পড়তে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, ''তারা কি জানে না, (চাশতের) নামাজ অন্য সময়ে উত্তম? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

'আওয়াবিনের নামাজের সময় হচ্ছে, যখন সূর্যের তাপ খুব প্রখর হয়।"[৪]

এই বর্ণনায় দুটি বিষয় প্রতিভাত হয়। একটি হল, সালাতুদ্দুহা তথা চাশতের নামাজ হল সালাতুল আওয়াবিন। অপরটি হল, চাশতের নামাজ যদিও সূর্য উদিত হওয়ার পর মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর থেকেই পড়া যায়, তথাপি চাশতের নামাজের উত্তম ওয়াক্ত হল সূর্যের তাপ খুব প্রখর হওয়ার সময়।

ইশরাক নামাজ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস

যেসব হাদিসে ইশরাক নামাজের কথা এসেছে, সেগুলোর কয়েকটি হাদিস নিম্নরূপ—

ক. আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

১. *সুনানে আবু দাউদ:* ১২৯০; *সহিহ মুসলিম:* ৭১৯

২. *সহিহ ইবনে খুযাইমাহ:* ২/২২৮; *মুসতাদরাকে হাকিম:* ১/৩১৪

৩. *সুনানে তিরমিজি:* ৪৭৩; *সুনানে ইবনে মাজা:* ১৩৮০

৪. *সহিহ মুসলিম:* ৭৪৮; *সহিহ ইবনে খুযাইমাহ:* ২/২২৯; *সহিহ ইবনে হিব্বান:* ২৫৩৯

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ " قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে আদায় করে সূর্য উঠা পর্যন্ত নামাজের স্থানে বসে আল্লাহ তায়ালার যিকির করতে থাকে এবং সূর্য উঠার পর (মাকরুহ সময় শেষ হয়ে গেলে) দুই রাকাত নামাজ আদায় করে, তার জন্য একটি হজ ও একটি উমরার সওয়াব রয়েছে। আনাস রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণ, পূর্ণ, পূর্ণ (হজ ও উমরার সওয়াব)।[1] হাদিসটি হযরত আবু উমামা রাযি. থেকেও নির্ভরযোগ্য সনদে *তাবারানি কাবিরে* (৮/২০৯) বর্ণিত হয়েছে।

খ. নুআইম ইবনে হাম্মার রাযি. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি— মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন,

يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تَعْجِزْ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ.

'হে আদম সন্তান, তোমরা দিনের শুরুতে চার রাকাত নামাজ আদায় করো, আমি তোমাদের জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যাব।'[২]

হযরত আবু দারদা এবং আবু যার রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩]

চাশত ও ইশরাক নামাজসংক্রান্ত উপরোক্ত হাদিসগুলোতে লক্ষণীয় বিষয় হল, চাশতের উত্তম সময় হচ্ছে যখন সূর্য খুবই আলোকিত হয় এবং সূর্যের উত্তাপ খুব বেশি হয়। এর বিপরীত দ্বিতীয় ভাগের হাদিসগুলোতে যে নামাজের কথা বলা হয়েছে, সেটি আদায় করতে হয় দিনের একেবারে শুরুর দিকে। অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর যখন মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাবে, তখনই এই নামাজ আদায় করবে।

হাদিসগুলোতে লক্ষণীয় বিষয় হল, দুই নামাজের হাদিসগুলোর বচনভঙ্গী এবং এগুলোর ফজিলতও এক নয়। যেমন সালাতুল ইশরাক-সংক্রান্ত হাদিসে বিবৃত হয়েছে, ফজরের নামাজের পর নামাজের স্থানে (মসজিদে) বসে জিকির-আযকারে মগ্ন থেকে অপেক্ষা করবে (অবশ্য মসজিদ থেকে বের হয়েও যদি জিকির-আযকারে মগ্ন থাকে, তবুও সালাতুল ইশরাকের সাওয়াব পাবে)। এরপর সূর্য উদিত হওয়ার পর (মাকরুহ ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর) দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে। আর এর ফজিলতে বলা হয়েছে, এই দুই রাকাতের কারণে এক

---

১. *সুনানে তিরমিজি:* ৫৮৬ (ইমাম তিরমিজি রাহি. বলেন, হাদিসটি হাসান)

২. *মুসনাদে আহমদ:* ৩৭/১৩৭; *সুনানে আবু দাউদ:* ১২৮৯; *সহিহ ইবনে হিব্বান:* ৬/২৭৫ (হাদিসটি সহিহ)

৩. *সুনানে তিরমিজি:* ৪৭৫ (ইমাম তিরমিজি রাহি. বলেন, হাদিসটি হাসান)

হজ এবং এক উমরার সাওয়াব পাবে। এবং দিনের শুরুর দিকে ইশরাকের চার রাকাত পড়লে আল্লাহ তায়ালা দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যাবেন (অর্থাৎ দুনিয়া আখেরাতের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন)।

পক্ষান্তরে সালাতুদ্দুহার হাদিসে ফজরের নামাজের পর নামাজের স্থানে (মসজিদে) বসে অপেক্ষা করার কথা নেই। আর এর ফজিলতে বলা হয়েছে—

ক. সদকার সাওয়াব পাবে।

খ. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজের ওসিয়ত করেছেন।

গ. এটি হচ্ছে, 'আওয়াব' তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তকারীদের নামাজ।

ঘ. যে ব্যক্তি সালাতুদ্দুহার বারো রাকাত আদায় করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন।

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট— ইশরাক এবং চাশত —উভয় নামাজের ফজিলত এক নয়।

আলোচ্য হাদিসের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার ও বিশ্লেষকের বক্তব্য

ইবনে মুলাক্কিন রহ. তার সুনানুত তিরমিজির ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'দিনের শুরুতে দুটি নামাজ প্রসিদ্ধ। প্রথমটি হচ্ছে, সূর্য উদিত হওয়ার পর যখন এক বর্শা কিংবা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যায়। এই নামাজকে সালাতুল ইশরাক বলা হয়। আর দ্বিতীয় নামাজ হচ্ছে, সূর্য দিনের এক চতুর্থাংশ পরিমাণ উপরে উঠে যাওয়ার সময় থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত। এটাকে সালাতুদ্দুহা (চাশতের নামাজ) বলা হয়।'[১]

আবুত তাইয়িব রহ. তার *সুনানে তিরমিজি*র ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন, 'হাদিসে উভয় নামাজের ক্ষেত্রে যেমন সালাতুল ইশরাক শব্দ প্রয়োগ হয়েছে, তেমনিভাবে উভয় নামাজের ক্ষেত্রে সালাতুদ্দুহাও প্রয়োগ হয়েছে। তবে কেউ কেউ ইশরাকের নামাজকে আয-যাহওয়াতুস সুগরা (ছোট দুহার নামাজ) আর চাশতের নামাজকে আয-যাহওয়াতুল কুবরা (বড় দুহার নামাজ) বলেন।'[২]

ইশরাক ও চাশত—উভয়টি আদায়ের মূল সময় যেহেতু এক (যদিও উভয়টি আদায়ের উত্তম সময় ভিন্ন ভিন্ন), অর্থাৎ সূর্য উদিত হওয়ার পর মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর থেকে দ্বিপ্রহরের আগ পর্যন্ত পুরো সময়েই ইশরাক ও চাশত উভয়টিই পড়া যায়, তাই ইশরাকের নামাজের ক্ষেত্রেও সালাতুদ্দুহা শব্দটি প্রয়োগ

---

১. *ইলাউস সুনান:* ৭/৩০

২. প্রাগুক্ত

হয়েছে। আর এ কারণেই অনেকে দুটি নামাজকে এক নামাজ বলেছেন। তবে উভয় নামাজ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার ব্যাপারে হযরত আলি রাযি. এর হাদিস খুবই সুস্পষ্ট—এরপর আর কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।[১] হযরত আলি রাযি. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজ পড়ার পর কিছুক্ষণ অবসর থাকতেন। এরপর সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পূর্বাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর অবসর থাকতেন। তারপর পশ্চিম আকাশে সূর্য যতটা উপরে থাকলে জোহরের নামাজের ওয়াক্ত থাকে, পূর্বাকাশে সূর্য ঠিক ততখানি উপরে উঠলে তিনি চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার পর তিনি জোহরের (ফরজ) নামাজের পূর্বে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন এবং জোহরের ফরজ নামাজের পরে দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন...।'[২]

আল্লামা আবদুল গনি রহ. হাদিসটির ব্যাখ্যায় লেখেন, "সারকথা হচ্ছে, সূর্য আসরের সময় পশ্চিমাকাশে যত উপরে থাকে, পুবাকাশে ঠিক ততটা উপরে উঠলে তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করতেন। এটি হচ্ছে আয-যাহওয়াতুস সুগরা তথা ছোট দুহার সময় এবং ইশরাকের সময়। আর এটিই হচ্ছে ইশরাকের মধ্যম এবং সর্বোচ্চ ওয়াক্ত। সূর্য উদিত হওয়ার পর এক বর্শা কিংবা দুই বর্শা পরিমাণ উপরে উঠে যাওয়ার এবং সূর্য প্রকাশ পেয়ে মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সময় থেকে ইশরাকের ওয়াক্ত শুরু হয় । নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এই নামাজ দুই রাকাত পড়তেন, তবে চার রাকাত পড়ার নির্দেশনাও দিয়েছেন। হাদিসে কুদসিতে বিবৃত হয়েছে—

'হে আদম সন্তান, দিনের শুরুতে চার রাকাত নামাজ আদায় করো, আমি তোমার জন্য দিনের শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট হয়ে যাব।''[৩]

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় পর্যায়ে আয-যাহওয়াতুল কুবরা তথা বড় দুহার সময় নামাজ পড়তেন। এই নামাজ তিনি কখনও পড়তেন, আবার কখনও পড়তেন না। এক হাদিসে এই নামাজের সময় বর্ণিত হয়েছে—

---

১. ولفظه: كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ أَمْهَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا، يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ هَاهُنَا، مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مِقْدَارُهَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ هَاهُنَا، يَعْنِي: مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ، قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، وَأَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا.

২. *মুসনাদে আহমদ: ২/৭৯; সুনানে তিরমিজি: ৫৯৮; সুনানে ইবনে মাজা: ১১৬১; সহিহ ইবনে খুযাইমাহ:* ২/২১৮, ২/২৩৩ (ইমাম তিরমিযি রাহি. বলেন, হাদিসটি হাসান)

৩. *ইজাহুল হাজাহ, শরহু সুনানে ইবনি মাজা:* ১১৬১

সূর্যের তাপ খুব প্রখর হওয়ার সময়। আর এই সময়টি হচ্ছে আনুমানিক দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাখানেক পূর্বে। আর এটি (চার রাকাত) হচ্ছে, চাশতের সর্বনিম্ন রাকাত। তবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও চাশতের আট রাকাত পড়তেন, আবার কখনও বারো রাকাতও পড়তেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, দুহায় রাসুল দুই ধরনের নামাজ পড়েছেন। একটি হল ফজরের জামাতের পর মাকরুহ ওয়াক্ত চলে গেলে সর্বনিম্ন দুই রাকাত, অপরটি হল যখন সূর্য আকাশের এক চতুর্থাংশ উপরে উঠে এবং সূর্যের তাপ যখন প্রখর হয়, তখন সর্বনিম্ন দুই চার রাকাত।

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, নফল নামাজের মধ্যে তাদাখুল, তথা একটির মধ্যে অন্যটি অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বীকৃত একটি বিষয়। যেমন জোহরের নামাজের সময় মসজিদে গিয়ে বসার আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করলে সুন্নতের পাশাপাশি তাহিয়াতুল মসজিদও আদায় হয়ে যায়। তদ্রুপ সকালের মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর দুই রাকাত নামাজ ইশরাক ও চাশত—উভয়টির নিয়তেই আদায় করা যেতে পারে। এতে আশা করা যায়—উভয়টিই আদায় হয়ে যাবে, এবং দুটি নামাজেরই ফজিলত অর্জিত হয়ে যাবে। আবার চাইলে ইশরাকের পরপর চাশতের নামাজ আদায় করা যেতে পারে, এতেও উভয় নামাজ আদায় হয়ে যাবে।

তবে উত্তম হচ্ছে, উভয়টিকে তার নির্ধারিত সময়ে আলাদাভাবে আদায় করা। অর্থাৎ সকালের মাকরুহ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর দুই রাকাত অথবা চার রাকাত নামাজ আদায় করা; এরপর চাশতের উত্তম সময়ে দুই, চার, ছয় বা আট, অথবা বারো রাকাত, যতটুকু সম্ভব ততটুকু আদায় করা। ইনশাআল্লাহ, এই নামাজের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফজিলতগুলো পাওয়া যাবে—

ক. সদকার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

খ. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়তের উপর আমল করা হবে।

গ. 'আওয়াব' তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যাবে।

ঘ. হজ এবং উমরার সাওয়াব পাওয়া যাবে।

ঙ. সকল গুনাহ—এমনকি তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও মাফ হবে।

চ. চার রাকাত নামাজ পুরো দিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।

ছ. জান্নাতে স্বর্ণের একটি প্রাসাদ নির্মিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

সালাতুল আওয়াবিন কোন নামাজ?

'সালাতুল আওয়াবিন' বা আওয়াবিন নামাজ বলতে আমরা মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী নামাজকেই জানি। অথচ 'সালাতুল আওয়াবিন' যে অন্য নামাজও হতে পারে—এটি কারও কল্পনায়ও আসে না। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত বক্তব্যগুলো আমরা দেখে নিই।

সহিহ ও নির্ভরযোগ্য হাদিসে চাশতের নামাজকেই আওয়াবিনের নামাজ বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে—

ক. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. বলেন,[১] আমাকে আমার বন্ধু (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখা, ঘুমানোর পূর্বে বিতরের নামাজ পড়া এবং চাশতের নামাজ পড়ার ওসিয়ত করেছেন। কেননা এটি (চাশতের নামাজ) হচ্ছে—আওয়াবিনের নামাজ।[২]

খ. হযরত কাসিম আশ-শাইবানি রহ. বলেন, যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. একদল লোককে (সূর্য উদিত হওয়ার পরপর) চাশতের নামাজ পড়তে দেখে বললেন, তারা কি জানে না—চাশতের নামাজ অন্য সময়ে উত্তম? রাসুল রাযি. বলেছেন—صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ 'আওয়াবিনের নামাজের সময় হচ্ছে, যখন সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বালুর কারণে উটের বাচ্চার পা উত্তপ্ত হতে থাকে।'[৩] অর্থাৎ আওয়াবিনের নামাজের সময় হচ্ছে, যখন সূর্যের উত্তাপ খুব বেশি হয়।[৪]

যায়েদ ইবনে আরকাম রাযি. এর বর্ণনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। একটি হল, সালাতুদ্দুহা, তথা চাশতের নামাজ হচ্ছে, সালাতুল আওয়াবিন। অপরটি হল, চাশতের নামাজ যদিও সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকেই পড়া যায়; তবুও সূর্যের উত্তাপ খুব বেশি হওয়ার সময়টি হল চাশতের নামাজের উত্তম সময়।

গ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে উল্লেখ হয়েছে—[৫] ''আওয়াব' তথা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিই চাশতের নামাজের প্রতি যত্নশীল হয়। আর এই নামাজ হচ্ছে, সালাতুল আওয়াবিন।"[১]

---

১. ولفظه: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَبِالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصَلَاةِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

২. *মুসনাদে আহমদ*: ১৬/৩২৯; *সহিহ ইবনে খুযাইমাহ*: ২/২২৭

৩. *সহিহ মুসলিম*: ৪৬৬

৪. রামায শব্দের অর্থ—সূর্যের প্রখর তাপে বালু উত্তপ্ত হওয়া। আর **فصال** শব্দটি আরবি **فصيل** এর বহুবচন। এর অর্থ—উটের ছোট বাচ্চা। অর্থাৎ আওয়াবিনের সময় হচ্ছে, যখন সূর্যের প্রখর তাপে উত্তপ্ত বালুর কারণে উটের বাচ্চার পা উত্তপ্ত হতে থাকে।

৫. ولفظه: لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاةِ الضُّحَى إِلا أَوَّابٌ. قَالَ: وَهِيَ صَلاةُ الأَوَّابِينَ

উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ থেকে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে—চাশতের নামাজকে 'সালাতুল আওয়াবিন' বলা হয়।

উপরোক্ত হাদিসসমূহ থেকে এ কথা বুঝার কারণ নেই—চাশতের নামাজকেই শুধু সালাতুল আওয়াবিন বলা যাবে, আর কোনো নামাজকে সালাতুল আওয়াবিন বলা যাবে না। বিশেষত মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী নামাজকে আওয়াবিন বলার কোনো ভিত্তিই নেই। শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. চাশতের নামাজ সম্পর্কে বলেন, এটাই আওয়াবিনের নামাজ; কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলবশত মাগরিবের পরের নামাজকে আওয়াবিনের নামাজ বলে থাকে।[২]

যদিও সহিহ হাদিসে চাশতের নামাজকে আওয়াবিনের নামাজ বলা হয়েছে, কিন্তু মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী নামাজকে 'সালাতুল আওয়াবিন' বলা একেবারে ভিত্তিহীন বা অমূলক নয়। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে এই নামাজকেও আওয়াবিনের নামাজ বলা হয়েছে। যেমন—

ক. মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৩] 'যে ব্যক্তি মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ পড়বে, তার এই নামাজ সালাতুল আওয়াবিন হিসেবে গণ্য হবে।'[৪]

খ. হযরত আমর ইবনে আস রাযি. বলেন,[৫] 'আওয়াবিনের সময় হচ্ছে, মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময়; মানুষ (এশার) নামাজে আসা পর্যন্ত।'[৬]

গ. আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. বলেন,[৭] 'মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী সময় গাফলতের সময়। আর এটিই হচ্ছে, আওয়াবিন নামাজের সময়।'[৮]

এসব হাদিস ও বর্ণনা থেকে বুঝা যায়—সহিহ হাদিসে যদিও চাশতের নামাজকে আওয়াবিনের নামাজ বলা হয়েছে, তথাপি মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী নামাজকে আওয়াবিন বলা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এমনকি শুধু মাগরিব এবং

---

১. *সহিহ ইবনে খুযাইমাহ*: ১২২৪

২. *সালাসিলে তাইয়্যিবাহ*, পৃ. ২৭

৩. ولفظه : مَنْ صَلَّى مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ

৪. *আয-যুহদ*, ইবনে মুবারক রাহি. : ৯৯৮; *মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল*, মারওয়াযি, পৃ. ৮৮ (হাদিসটি মুরসাল, তবে এর সনদ সহিহ)

৫. ولفظه : صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ الْخَلْوَةُ الَّتِي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، حَتَّى يَثُوبَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ

৬. *আয-যুহদ*, ইবনে মুবারক: ৯৯৯; *ফাজলু কিয়ামিল লাইল*, আজুরি: ৪১ (হাদিসটি মওকুফ, সনদে মুসা ইবনে উবাইদা রাবি দুর্বল। তবে ইমাম তিরমিজি রাহি. তার সম্পর্কে বলেন, হিফজ তথা স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে তার মধ্যে দুর্বলতা থাকলেও তিনি সাদুক তথা নির্ভরযোগ্য রাবি)

৭. ولفظه : هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء فإنها ساعة الغفلة وهي صلاة الأوابين

৮. *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৫/২০০

এশার মধ্যবর্তী নামাজ ছাড়াও আরও অনেক নামাজকেই হাদিসে সালাতুল আওয়াবিন নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন—

এক. মাগরিবের আজান-ইকামতের মধ্যবর্তী নামাজকে সালাতুল আওয়াবিন বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,[১] আওয়াবিনের নামাজ হচ্ছে মাগরিবের আজান-ইকামতের মধ্যবর্তী নামাজ।[২]

দুই. ঘরে প্রবেশ এবং ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকাত নামাজকে এক হাদিসে সালাতুল আওয়াবিন বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে উসমান ইবনে আবি সাওদা রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৩] সালাতুল আওয়াবিন, অথবা বলেছেন, সালাতুল আবরার হচ্ছে তোমাদের ঘরে প্রবেশকালে দুই রাকাত নামাজ এবং ঘর থেকে বের হওয়াকালে দুই রাকাত নামাজ।[৪]

তিন. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করা এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা—এগুলোকেও সালাতুল আওয়াবিন বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উরওয়া ইবনে রুয়াইম রহ. বলেন,[৫] যে ব্যক্তি ফজরের দুই রাকাত (সুন্নত) আদায় করবে, এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করবে, তার নামাজ আওয়াবিনের নামাজের মধ্যে লেখা হবে।[৬]

উপরোক্ত সকল হাদিস ও বর্ণনার আলোকে বলা যায়—সালাতুল আওয়াবিন শুধুই চাশতের নামাজের নাম নয়, বরং হাদিসে একাধিক নামাজকে সালাতুল আওয়াবিন বলা হয়েছে। যেমন—

ক. চাশতের নামাজ

খ. মাগরিব এবং এশার মধ্যবর্তী নামাজ

গ. মাগরিবের আজান-ইকামতের মধ্যবর্তী নামাজ

ঘ. ঘরে প্রবেশ ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দুই রাকাত নামাজ

ঙ. ফজরের দুই রাকাত সুন্নত আদায় করা এবং ফজরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা।

* * *

---

১. ولفظه : صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب

২. *মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল*, পৃ. ৭৩ (তিনি সনদ উল্লেখ করেননি)

৩. ولفظه : صلاة الأوابين أو قال صلاة الأبرار ركعتين إذا دخلت بيتك وركعتين إذا خرجت

৪. *আয-যুহদ*, ইবনে মুবারক, ১০১১ (হাদিসটি মুরসাল, তবে এর সনদ সহিহ)

৫. ولفظه : من صلى ركعتي الفجر وصلى الصبح في جماعة كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأوابين

৬. *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*: ৩/৫৮ (হাদিসটি মুরসাল, তবে এর সনদ নির্ভরযোগ্য)

ঈদের নামাজ ঘরে পড়ার কি সুযোগ আছে?

ইদানীং অনেকে ঘরে একাকী কিংবা জামাতের সাথে ঈদের নামাজ আদায়ের অবকাশ থাকার প্রচারণা চালাচ্ছেন। কোনো কোনো উৎসাহী এ সংক্রান্ত প্রচারের অংশ হিসেবে লিফলেটও বিতরণ করছেন। একটি লিফলেটের বক্তব্য হল, 'পরিবারের সকলে মিলে একসাথে জামাতে সালাত আদায় করুন ও ঈদের সালাত বাসায় আদায় করলে এতে কোনো খুতবা নেই।' (*সহিহ বুখারি: ৯৮৭*)

প্রশ্ন হল, বাস্তবেই কি ঈদের নামাজ ঘরে আদায়ের কোনো সুযোগ ও বৈধতা শরিয়তে আছে? কয়েকটি দিক বিবেচনায় বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোকপাতের দাবি রাখে।

এক. এ বিষয়টি আমাদের জানা থাকা দরকার—ঈদের নামাজ ওয়াজিব। কারণ— **ক.** কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

'অতএব, আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।' (সুরা কাউসার, আয়াত ২)

খ. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের বিধান আসার পর তার জীবদ্দশায় একটিবারের জন্যও ঈদের নামাজ ত্যাগ করেননি।

এজন্যই ওলামায়ে আহনাফের মতে—ঈদের নামাজ পড়া ওয়াজিব।

দুই. জুমুআর মতো ঈদের নামাজের জন্যও দুই ধরনের শর্ত রয়েছে।

ক. ওয়াজিব হওয়ার শর্ত **খ.** আদায় সঠিক হওয়ার শর্ত

ঈদের নামাজ আদায় সঠিক হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে একটি শর্ত হচ্ছে, জামাতের সাথে আদায় করা। আরেকটি শর্ত হচ্ছে শহর কিংবা শহরতলি হওয়া। কেননা হযরত আলি রাযি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, 'কেবল শহরেই জুমুআ ও ঈদের নামাজ বৈধ।'[১] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায় (৪/৪৬) এ সংক্রান্ত আরও অনেক বক্তব্য রয়েছে।

ইমাম জাস্সাস রহ. *শরহু মুখতাসারুত-তাহাবি* গ্রন্থে (২/১৬১) বলেন, "যখন এ কথা প্রমাণিত—ঈদের নামাজ শহরের সাথে সম্পৃক্ত, যেমনটি আমরা বর্ণনা করেছি, তাই এটি জুমুআর মতো জামাত এবং ইমামের সাথেই সম্পৃক্ত হবে। তা ছাড়া ঈদের নামাজ জামাত ও ইমাম ছাড়া বর্ণিতই হয়নি। সুতরাং যেভাবে তা নবি

---

১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ৪/৪৬ (হাদিসটির সনদ সহিহ)

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত, সেভাবে আদায় করলে বৈধ হবে। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে নামাজ পড়তে দেখ, সেভাবেই নামাজ পড়ো।' আর তিনি তো এভাবেই (জামাতের সাথে) পড়েছেন।"

তিন. জুমুআ এবং ঈদের নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজের মতো নয়। বরং এই দুটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো দুই একজনে মিলে ঘরে কিংবা কোথাও জড়ো হয়ে আদায় করার মতো বিষয় নয়। বিশেষত ঈদের নামাজের বিষয়টি একেবারেই ব্যতিক্রম। এটি মুসলমানদের বিশেষ উৎসব এবং ইসলামের বিশেষ একটি শিআর (নিদর্শন)। এখানে বড় জমায়েত হওয়া এবং বেশিসংখ্যক মানুষ একসাথে নামাজ পড়া বিশেষভাবে উদ্দেশ্য। এ কারণেই ঈদগাহে নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর ইসলামের প্রথম যুগে যখন মুসলমানরা সংখ্যায় কম ছিল, তখন মহিলাদেরকে পর্যন্ত ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার বৈধতা দেওয়া হয়েছিল। বলাবাহুল্য, ঘরে আদায়ের মাধ্যমে বড় জমায়েতের এই উদ্দেশ্য চরমভাবে ব্যহত হয়।

চার. আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় এক বারের জন্যও ঈদের নামাজ ঘরে একাকী কিংবা জামাতের সাথে পড়েছেন—এ মর্মে একটি হাদিসও পাওয়া যায়নি। কোনো সাহাবি অথবা তাবিয়ি ঘরে ঈদের নামাজ পড়েছেন, কিংবা ঘরে আদায় বৈধ হওয়ার ফাতোয়া দিয়েছেন, নির্ভরযোগ্য সূত্রে এই মর্মে একটি বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। এতে বোঝা গেল, ঘরে ঈদের নামাজ আদায়ের সুযোগ শরিয়তে নেই। যদি এর সুযোগ থাকত, তাহলে তাদের থেকে একটি বক্তব্য হলেও পাওয়া যেত।

পাঁচ. ঘরে ঈদের নামাজ আদায়ের বৈধতাদানকারীগণ *সহিহ বুখারির* উদ্ধৃতিতে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত এই বর্ণনাটি সামনে এনেছেন—[১] হযরত আনাস রাযি. তার গোলাম ইবনে আবি উতবাকে 'যাবিয়া'তে[২] নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তার (আনাসের) পরিবারের লোকদেরকে এবং সন্তানাদিকে একত্রিত করলেন এবং যেভাবে শহরে নামাজ হয়, সেভাবে তাকবিরসহ নামাজ আদায় করলেন।[৩]

---

১. ولفظه : وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

২. যাবিয়া বসরা থেকে দুই ফরসখ দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থান, যেখানে হযরত আনাসের বাড়ি এবং জমিজমা ছিল।

৩. রেওয়ায়াতটি মাওসুলান *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা* (৪/২৩৬) এবং বাইহাকির *আস-সুনানুল কুবরায়* (৩/৩৫০) বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু এই বর্ণনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো খুবই লক্ষণীয়—

ক. এই বর্ণনাটি *সহিহ বুখারি*র নিয়মতান্ত্রিক কোনো 'মুসনাদ' হাদিস নয়। বর্ণনাটি মূলত *সহিহ বুখারি*র শিরোনামের একটি অংশ, যা তিনি 'তালিকান'— অর্থাৎ সনদ ছাড়া উদ্ধৃত করেছেন। আর বিশেষজ্ঞদের জানা কথা— *সহিহ বুখারি*র মুসনাদ হাদিস এবং 'তালিকান' বর্ণনা এক মানের নয়।

খ. এই বর্ণনার সনদও সহিহ নয়। কারণ রেওয়ায়াতটি 'মাওসুলান' (সনদসহ) *'মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা'*[১] এবং বাইহাকির *'আস-সুনানুল কুবরা'*য়[২] বর্ণিত হয়েছে।[৩]

বাইহাকির সনদ সম্পর্কে ইবনে তারকুমানি রহ. বলেন, 'এই সনদে নুআঈম ইবনে হাম্মাদ নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন। তার সম্পর্কে নাসায়ি রহ. বলেছেন, 'সে নির্ভরযোগ্য নয়।' দারা কুতনি রহ. বলেন, 'সে অনেক ভুল করত।' আবুল ফাতাহ আযদি ও ইবনে আদি রহ. বলেন, 'সে সুন্নাহর সমর্থনে হাদিস জাল করত এবং আবু হানিফার নিন্দায় জাল ঘটনা তৈরি করত, যার সবই মিথ্যা।'[4]

সনদের আরেকজন বর্ণনাকারী হলেন হুশাইম। তিনি যদিও নির্ভরযোগ্য, তথাপি তিনি যে 'তাদলিস' করতেন, এটা প্রসিদ্ধ। উপরন্তু তিনি এই রেওয়ায়াত 'আন' দিয়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তার এই রেওয়ায়াতের উপর নির্ভর করা যায় না। এসব কারণেই শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. বাইহাকির সনদ সম্পর্কে বলেন, এর সনদ দুর্বল।[৫]

*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*র সনদে একজন বর্ণনাকারী হলেন—ইউনুস ইবনে উবাইদ ইবনে দিনার। তিনি একদিকে 'মুদাল্লিস', অপর দিকে তিনি যার থেকে বর্ণনা করেছেন, তার নামও সুস্পষ্ট বলেননি; অস্পষ্ট রেখেছেন।

গ. তৃতীয়ত এটি স্বাভাবিক অবস্থার কোনো আমল নয়। বরং কখনও যদি তিনি ওজরবশত সময়মতো ঈদের নামাজ পড়তে পারতেন না, তখন এভাবে জামাতের সাথে কাযা আদায় করতেন। *সুনানে বাইহাকি*র বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ

---

১. ولفظه : حدثني بعض آل انس ان انسا كان ربما جمع اهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين

২. ولفظه : ويذكر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ، جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ " فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ

৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ৪/২৩৬: আস সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি: ৩/৩৫০

৪. *আল-জাওহারুন নাকি: ৩/৩৫০*

৫. *ইরওয়াউল-গালিল :* ৩/১২০

হয়েছে—[১] 'হযরত আনাস রাযি. ঈদের নামাজ কাযা হয়ে গেলে তার পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইমাম যেভাবে ঈদের নামাজ পড়ান, সেভাবেই ঈদের নামাজ আদায় করতেন।'

বোঝা গেল, তিনি কোনো কারণে ইমামের সাথে পড়তে না পারলে এভাবে কাযা আদায় করতেন।

তা ছাড়া এখানে আরেকটি সম্ভাবনাও রয়েছে। আনাস রাযি. এর আমলকে কাযা না বলে দ্বিতীয় জামাতও বলা যেতে পারে। তার যেহেতু অসংখ্য সন্তানাদি ও দাস-দাসী ছিল, তাই কখনও যদি ইমামের সাথে ঈদের নামাজ আদায় না করতে পারতেন, তখন তাদের নিয়ে ঈদের নামাজের দ্বিতীয় জামাত করতেন। *সহিহ বুখারির* আলোচিত বর্ণনা এবং বাইহাকির অপর একটি 'তালিকান' বর্ণনা থেকে এমনই বুঝা যায়। *বুখারির* বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে—[২] 'হযরত আনাস রাযি. তার গোলাম ইবনে আবি উতবাকে যাবিয়াতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তার (আনাসের) পরিবারের সবাইকে একত্রিত করে যেভাবে শহরে নামাজ হয়, সেভাবে তাকবিরসহ নামাজ আদায় করলেন।'

আর বাইহাকির রেওয়ায়াতটি হল,[৩] হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত—'তিনি যখন যাবিয়াতে তার বাড়িতে থাকতেন, তখন বসরায় ঈদের জামাতে শরিক হতে পারতেন না। তার গোলাম এবং সন্তানাদিকে একত্রিত করে আবদুল্লাহ ইবনে আবি উতবাকে নামাজ পড়ানোর নির্দেশ দিতেন। তখন তিনি শহরে যেভাবে নামাজ হয়, সেভাবে তাকবিরসহ দুই রাকাত নামাজ পড়াতেন।'

ঘ. আনাস রাযি. এর রেওয়ায়াতের সনদ সহিহ হলেও এটি ছিল তার বিশেষ কারণবশত একটি আমল। অর্থাৎ তিনি যখন মূল জামাতে শরিক হতে পারতেন না, তখন এভাবে কাযা অথবা দ্বিতীয় জামাত পড়তেন। তার পরিবারে শ-খানেক সন্তানাদি ও দাস-দাসী ছিল। তাদের নিয়ে এভাবে কাযা/ঈদের দ্বিতীয় জামাত আদায় করেছেন। কিন্তু তার এই আমল থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ঘরে দুই চারজন মিলে ঈদের নামাজ আদায়ের বৈধতা মিলে না।

ঙ. তা ছাড়া একদিকে হযরত আনাস রাযি. এর এই আমলটি সব সময়ের কোনো আমল নয়, বরং কোনো এক সময় ঈদের নামাজ ইমামের সাথে পড়তে না

---

১. ولفظه: كان انس إذا فاتته صلاة العيد مع الامام جمع اهله فصلى بهم مثل صلاة الامام في العيد

২. ولفظه: وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.

৩. ولفظه : ويذكر عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَنْزِلِهِ بِالزَّاوِيَةِ، فَلَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ بِالْبَصْرَةِ، جَمَعَ مَوَالِيَهُ وَوَلَدَهُ، ثُمَّ يَأْمُرُ مَوْلاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عُتْبَةَ " فَيُصَلِّي بِهِمْ كَصَلاةِ أَهْلِ الْمِصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَيُكَبِّرُ بِهِمْ كَتَكْبِيرِهِمْ

পারায় এমনটি করেছিলেন; পরন্তু তার এই আমল সনদের দুর্বলতার কারণে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত নয়, অপর দিকে এটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত রেওয়ায়াতেরও বিপরীত।

এ সম্পর্কে শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. বলেন,[১] 'হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে এর বিপরীত বর্ণনা রয়েছে।'[২] ইবনে মাসউদের সেই রেওয়ায়াত *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায়* এভাবে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঈদের নামাজ পড়তে পারেনি, সে যেন চার রাকাত নামাজ পড়ে।'[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইবনে মাসউদ রাযি. যে চার রাকাত পড়ার কথা বলেছেন, এটি কিন্তু ঈদের নামাজের কাযা হিসেবে নয়, বরং নফল হিসেবে। কারণ কাযা হিসেবে বলা হলে দুই রাকাতের কথা বলা হত। এ কারণেই হানাফি আলেমগণ ঈদের নামাজ পড়তে না পারলে চাশতের মতো চার রাকাত নফল নামাজ পড়া মুস্তাহাব বলে থাকেন।[৪] তবে এর কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই। চাইলে দুই রাকাত কিংবা চার রাকাত নফল হিসেবে পড়তে পারে, আবার চাইলে নাও পড়তে পারে।

আবু সুলাইমান বলেন,[৫] আমি বললাম—যে ঈদের নামাজ পড়তে পারল না, তার উপর কি কোনো নামাজ পড়া আবশ্যক? তিনি (ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানি রহ.) বললেন, ইচ্ছা হলে পড়বে, না হলে পড়বে না। আমি বললাম, তাহলে কত রাকাত পড়বে? তিনি বললেন, চার রাকাতও পড়তে পারে, আবার দুই রাকাতও পড়তে পারে।'[৬]

ছয়. সরকারী নিষেধাজ্ঞা বা অন্য কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. এর মতামত হল, জুমুআ ইসলামের একটি শিআর (নিদর্শন)। এটি অন্যান্য নামাজের মতো নয়। সুতরাং তা ঘরে আদায় করা যাবে না। ঈদের নামাজের ক্ষেত্রেও একই কথা। তথাপি কেউ যদি অন্যান্য মাজহাবের অনুসরণে ঘরে আদায় করে নেয়, তাহলে যেহেতু মাসআলাটি 'মুজতাহাদ ফিহি' তাই বিশেষ পরিস্থিতিতে এভাবে আদায় করলে আশা করা যায়—আদায় হয়ে যাবে। এমনটিই বলেছেন তিনি।

---

১. ولفظه : وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك

২. *ইরওয়াউল গালিল* : ৩/১২০

৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*: ৪/২৩৫

৪. বিস্তারিত দেখুন, *রদ্দুল মুহতার*: ২/১৭৫-১৭৬

৫. ولفظه: قلت: أرأيت الرجل يفوته العيد هل عليه أن يصلي شيئا؟ قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل. قلت: فكم يصلي إن أراد أن يصلي؟ قال : إن شاء أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.

৬. *কিতাবুল আসল*: ১/৩২০

তবে এ ক্ষেত্রেও ঘরে একাকী আদায় করা যাবে না। সর্বোচ্চ সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতির জন্য চেষ্টা করতে হবে।

* * *

আরাফার রোজা জিলহজের নয় তারিখে নাকি হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিনে?

জিলহজের প্রথম দশকের অনেক ফজিলতের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত এই মাসের নয় তারিখের রোজার বিষয়ে হাদিসে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটি হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

'ইয়াওমুল আরাফার রোজার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী—তিনি এর দ্বারা আগের এক বছরের ও পরের এক বছরের গুনাহ মাফ করবেন।'[1]

হাদিসে ইয়াওমুল আরাফায় নির্দেশিত রোজা সেখানে হাজিদের অবস্থানের দিন রাখা হবে, নাকি নয় তারিখে রাখা হবে, এ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ মনে করেন—হাদিসে উল্লেখিত ইয়াওমুল আরাফার রোজার দ্বারা হাজিগণ যেদিন আরাফায় অবস্থান করেন, সেদিনের রোজা উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ধারনাটি সঠিক নয়। সঠিক বক্তব্য হল, এই রোজা দ্বারা জিলহজের নয় তারিখের রোজা উদ্দেশ্য। এর সরল কারণ হল, এই রোজা 'আরাফা' বা উকুফে আরাফার কোনো আমল নয়; বরং নয় তারিখের আমল। 'ইয়াওমে আরাফা' হচ্ছে ওই তারিখের (৯ জিলহজের) পারিভাষিক নাম।

এ ব্যাপারে সাধারণত মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা তৈরি হওয়ার বড় কারণ হল 'ইয়াওমুল আরাফা' এর নামকরণ। অনেকে মনে করেন—এই দিন হাজিগণ আরাফায় অবস্থান করেন, তাই এই দিনকে ইয়াওমুল আরাফা বা আরাফার দিন বলা হয়। কিন্তু এই ধারনাটি যথাযথ নয়। এই দিনকে কেন 'ইয়াওমুল আরাফা' বলা হয়, এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করেছেন—

---

১. *সহিহ মুসলিম: ১১৬২*

ক. আরাফা শব্দের অর্থ পরিচয় লাভ করা, অবগতি লাভ করা। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম জিলহজের আট তারিখে স্বপ্নে দেখেন—তিনি তার ছেলেকে জবাই করছেন। কিন্তু এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কিনা, এ ব্যাপারে তার সন্দেহ হল। এরপর আবারও নয় তারিখে একই স্বপ্ন তাকে দেখানো হয়। তখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায়—এই স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকেই। যেহেতু ইবরাহিম আলাইহিস সালাম জিলহজের নয় তারিখেই বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে অবগতি লাভ করেন, তাই এই দিনকে 'ইয়াওমুল আরাফা' বলা হয়।

খ. জিলহজের নয় তারিখ জিবরিল আলাইহিস সালাম ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে হজের সকল বিধানাবলি শিক্ষা দেন। যেহেতু এই দিন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম হজের সকল আমল, ইবাদত এবং কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত হন; এগুলোর পরিচিতি লাভ করেন, এজন্য এই দিনকে 'ইয়াওমুল আরাফা' বলা হয়।

গ. ৯ জিলহজ হাজিরা আরাফা ময়দানে অবস্থান করেন এজন্য এই দিনকে 'ইয়াওমুল আরাফা' বলা হয়।[১]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা গেল—ইয়াওমুল আরাফা নামকরণের একাধিক মতামত ও বিশ্লেষণ রয়েছে। এমনকি 'ইয়াওমুল আরাফা' নামকরণের শেষোক্ত কারণটিও যদি ধরে নেওয়া হয়, তবুও 'সওমু ইয়াওমিল আরাফা' দ্বারা জিলহজের নয় তারিখের রোজাই উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ হাদিসের মূল উদ্দেশ্য হল জিলহজের নয় তারিখে রোজা রাখা। কিন্তু যেহেতু ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান হজের প্রধান রোকন 'উকুফে আরাফা' ৯ জিলহজে আদায় করা হয়, তাই এ তারিখের নাম পড়ে গেছে 'ইয়াওমে আরাফা'। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান নিজ দেশের হিসাব অনুযায়ী জিলহজের নয় তারিখেই রোজা রাখবে। এর সুস্পষ্ট দুটি কারণ লক্ষণীয়—

এক. তাকবিরে তাশরিক আরাফা বা উকুফে আরাফার বিশেষ আমল নয়; বরং এটি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ দেশের হিসাব অনুযায়ী জিলহজের নয় তারিখ ফজর থেকে শুরু হয়ে তেরো তারিখ আসরের মধ্যবর্তী সময়ের আমল। অথচ যে দলিল দ্বারা নয় তারিখ থেকে তাকবিরে তাশরিক শুরু হওয়া প্রমাণিত, তাতেও ইয়াওমে আরাফা শব্দই আছে। কেননা তাতে এসেছে,[২] আলি রাযি. থেকে

---

১. *তাফসিরে বাগাবি: ৭/৪৮; মুগনি: ৩/১১২; তাবইনুল হাকাইক: ২/২৩; ইনায়া, শরহে হেদায়া: ৩/৪৫২*

২. **ولفظه: عن علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر**

বর্ণিত— তিনি ইয়াওমে আরাফার ফজরের পর থেকে তাশরিকের শেষ দিন আসর পর্যন্ত তাকবির দিতেন।[১]

সুতরাং 'ইয়াওমু আরাফা' অর্থ জিলহজের নয় তারিখ হওয়া একটি প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত বিষয়। তাই 'সওমু ইয়াওমি আরাফা' অর্থও জিলহজের নয় তারিখের রোজা হবে, এটাই সঠিক কথা।

দুই. তা ছাড়া কোনো কোনো হাদিস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নয় তারিখের কথাই বুঝে আসে। যেমন এক হাদিসে এসেছে,[2] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিলহজের নয় দিন রোজা রাখতেন।[3]

হাজিদের আরাফায় অবস্থান-দিনের রোজা পৃথিবীর সকলের জন্য রাখা অসম্ভব। কারণ—

ক. ইসলাম সকল যুগের সকল মানুষের জন্য এসেছে। কিন্তু হাজিরা কখন আরাফায় অবস্থান করবে, আজকের যুগে যেমন আমাদের পক্ষে জানা খুব সহজ, অতীতে এটি সহজ ছিল না। তখন আজকের মতো মোবাইল ও টেলিভিশনও ছিল না। তাদের পক্ষে এ কথা জানার কোনো উপায়ও ছিল না, হাজিরা কখন আরাফায় অবস্থান করবে, আর তারা আরাফার রোজা রাখবে?

খ. হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিনে একসাথে বিশ্বের সকল মুসলমানের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভবও নয়। কারণ, যেদিন হাজিরা আরাফায় অবস্থান করবে, দেখা যাবে—বিশ্বের কোনো কোনো দেশে তখন রাত চলছে। যেমন আমেরিকার কথাই ধরুন। সউদি আরবে দিন হলে আমেরিকায় রাত, তাই তাদের পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং ইয়াওমুল আরাফার এমন অর্থ গ্রহণ করতে হবে, যে অর্থ অনুযায়ী বিশ্বের সকল মুসলমানের পক্ষে ইয়াওমুল আরাফার রোজা রাখা সম্ভব হয়। আর এটা ইয়াওমুল আরাফার অর্থ '৯ জিলহজ' ধরলেই সম্ভব।

গ. আরবিতে 'ইয়াওম' বলা হয়—সূর্য উদিত হওয়া থেকে নিয়ে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত সময়কে। আর রোজা শুরু হয় ফজর উদিত হওয়ার পর থেকে। এখন যদি হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিনের প্রতি লক্ষ করে, সউদি আরবের নয় তারিখের সাথে মিল রেখে রোজা রাখতে চান, তাহলে রোজার শুরু ও শেষের

---

১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ৫৬৭৭, ৫৬৭৮ (শায়খ আওয়ামা তাহকিককৃত) (হাফিজ ইবনে হাজার রাহি. তার *আদ-দিরায়া* গ্রন্থে বলেন, এর সনদ সহিহ।)

২. ولفظه : عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ .

৩. *মুসনাদে আহমদ:* ৩৭২৪; *সুনানে আবু দাউদ:* ২৪৩৭; *সুনানে নাসায়ি:* ২৪১৭

ক্ষেত্রেও সউদি আরবের সময়ের সাথে মিল রাখতে হবে। অথচ আমাদের ফজর উদিত হওয়ার তিন ঘণ্টা পর তাদের ফজর উদিত হবে। দেখা যাবে—আমাদের রোজা রাখার সময় হয়ে গেছে, অথচ এখনো তাদের রোজা রাখার সময় শুরু হয়নি। এ ক্ষেত্রেও হাজিদের সংঙ্গে মিল রাখা সম্ভব হবে না।

ঘ. গোটা মুসলিম উম্মাহর ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে—ইয়াওমে আরাফার পরের দিনটিই ইয়াওমুন নাহর তথা কোরবানির দিন। পৃথিবীর কোনো আলেমই এ কথা বলেননি—ইয়াওমে আরাফা এবং ইয়াওমুন নাহর তথা কোরবানির দিনের মাঝে তৃতীয় কোনো দিন থাকতে পারে। এখন আমাদের বাংলাদেশের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে সউদি আরবের সাথে এখানকার অধিবাসীদের হিজরি তারিখে সাধারণত এক দিনের ব্যবধান হয়ে থাকে। আর ইয়াওমুন নাহর তথা কোরবানির দিন দশ জিলহজে হওয়াটাও নির্ধারিত। সুতরাং এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি ইয়াওমে আরাফার অর্থ—হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিন (যা আমাদের দেশের হিসাব অনুযায়ী সাধারণত জিলহজের আট তারিখ হয়) ধরে নেয়, তাহলে ইয়াওমুল আরাফা এবং ইয়াওমুন নাহর তথা কোরবানির দিনের মাঝে তৃতীয় আরেকটি দিন অতিরিক্ত হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ উদ্ভট এবং ইজমাবিরোধী।

বোঝা গেল, আরাফার রোজার অর্থ যদি হাজিদের আরাফায় অবস্থানের দিনের রোজা ধরা হয়, তাহলে এ জাতীয় বিচ্ছিন্ন চিন্তা ও বক্তব্য আরও কিছু ক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য করে তুলবে। সুতরাং হাদিসে বর্ণিত ইয়াওমুল আরাফার অর্থ জিলহজের নয় তারিখই গ্রহণ করতে হবে।

* * *

সাদাকাতুল ফিতর কি টাকা দিয়ে আদায় হয় না?

টাকা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় হওয়ার বিষয়টি একটি মীমাংসিত বিষয়। দাতা ও গ্রহীতার জন্য সহজ এবং অধিক উপকারীও বটে। আমাদের সমাজে টাকা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বহুল চর্চা থাকলেও ইদানীং অনেকে এ বিষয়ে জলঘোলা করছেন। টাকা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে না মর্মে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছেন। তাদের বক্তব্য হল, হাদিস শরিফে পাঁচটি জিনিস দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে খেজুর, যব, কিশমিশ, পনির, আটা। এ সংক্রান্ত কিছু হাদিস উল্লেখ করা হল।

ক. হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত— 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর হোক অথবা যব, এক সা পরিমাণ আদায় করা আবশ্যক করেছেন। আর ঈদের নামাজে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[১]

খ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত— 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে খেজুর, যব এক সা পরিমাণ আর গম আধা সা পরিমাণ আদায় করা আবশ্যক করেছেন।'[২]

তাদের বক্তব্য মতে— এসব হাদিসে খেজুর, যব ইত্যাদি দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার কথা বলা হয়েছে। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে দিরহাম ও দিনার প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও টাকা কিংবা মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার কথা কোথাও বলা হয়নি। যদি মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ হত, তা হলে অবশ্যই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর, যব ইত্যাদির সাথে এত দিরহাম কিংবা এত দিনার হবে— এটাও বলে দিতেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, হাদিসে পাঁচটি বস্তুর দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের কথা বলা হলেও হাদিসের উদ্দেশ্য এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। হাদিসের ব্যাপক উদ্দেশ্য বুঝার জন্য একটি উদাহরণ বুঝতে হবে।

হাদিস শরিফে উটের যাকাত উট দিয়ে, বকরির যাকাত বকরি দিয়ে, শস্যের যাকাত শস্য দিয়ে, পণ্যের যাকাত পণ্য দিয়ে দেওয়ার কথা এসেছে। হযরত মুআয ইবনে জাবালের হাদিসে বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ইয়ামানে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, 'ফসল থেকে ফসল, বকরিপাল থেকে ছাগল, উটপাল থেকে উষ্ট্রী, গরুর পাল থেকে গাভি যাকাত হিসেবে গ্রহণ করবে।'[৩]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও হযরত মুআয রাযি. সেখানে গিয়ে ইয়ামানবাসীদের বললেন, তোমরা যাকাতস্বরূপ যব ও ভুট্টার পরিবর্তে চাদর বা পরিধেয় বস্ত্র নিয়ে এসো। ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্যও উত্তম।[৪]

---

১. *সহিহ বুখারি:* ১৫০৭

২. *সুনানে দাউদ:* ১৬২২; *সুনানে নাসায়ি:* ৫৮০; *ইবনে খুযাইমা:* ২২৬০; *মুসতাদরাকে হাকিম:* ১/৪১০

৩. *সুনানে আবু দাউদ:* ১৫৯৯; *সুনানে ইবনে মাজা:* ১৮১৪; *মুসতাদরাকে হাকিম:* ১/৩৮৮

৪. দেখুন, *সহিহ বুখারিতে* (৪/২৮০) হযরত মুআয রাযি. এর বক্তব্য।

মুআয রাযি. রাসুলের নির্দেশনার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন—এখানে নবিজির নির্দেশের বাহ্যিক অর্থই[১] একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তার নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে—ওই সকল বস্তু কিংবা এর সমমূল্য আদায় করা।

সাদাকাতুল ফিতরের বিষয়টিও এমনই। অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি বস্তুর নাম বলেছেন। কিন্তু এর উদ্দেশ্য কখনও এই নয়—হুবহু এই বস্তুগুলোই আদায় করতে হবে এবং এগুলোর মূল্য অথবা সমমূল্যের বস্তু দিলে আদায় হবে না। বরং নবিজির নির্দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, হুবহু ওই বস্তুগুলো দিলে যেমন সাদাকাতুল ফিতর আদায় হবে, হিসাব করে সেগুলোর মূল্য আদায় করলেও সাদাকাতুল ফিতর আদায় হয়ে হবে।

সাহাবায়ে কেরাম সাদাকাতুল ফিতর-সংক্রান্ত নির্দেশনায় এমন আমল করেছেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. বলেন, 'আমরা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতাম এক সা খাদ্য (গম) অথবা এক সা যব অথবা এক সা খেজুর, কিংবা এক সা পনির বা এক সা কিশমিশ দ্বারা।'[২]

এই বর্ণনায় হাদিসে বর্ণিত বস্তুগুলো দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিষয়টি ফুটে উঠেছে। অপর দিকে আবু ইসহাক আস সাবিয়ির বর্ণনায় সাহাবায়ে কেরাম মূল্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, সেই বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। কেননা তিনি বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরামকে এই অবস্থায় পেয়েছি—তারা রমজানে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন খাবারের সমমূল্যের দিরহাম দিয়ে।[৩]

এই রেওয়ায়াত থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—সাহাবায়ে কেরাম দিরহাম (টাকা) দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। রেওয়ায়াতটির বর্ণনাকারী আবু ইসহাক আস-সাবিয়ি হচ্ছেন একজন শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ি। তিনি ৩৩ হিজরিতে হযরত উসমান রাযি. এর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করে ১২৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আলি রাযি.-সহ ৩৮ জন মতান্তরে ২৭ জন সাহাবিকে পেয়েছেন। এছাড়া শীর্ষস্থানীয় অসংখ্য তাবিয়িরও সোহবত পেয়েছেন।[৪]

তার রেওয়ায়াতের আরবি বক্তব্য এরকম—

---

১. অর্থাৎ হুবহু উট, বকরি, শস্যই গ্রহণ করা

২. *মুয়াত্তা মালেক* পৃ. ১২৪; *সহিহ বুখারি:* ১৪৭২; *সহিহ মুসলিম:* ৯৮৬

৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ১০৪৭২; *আল-আমওয়াল*, ইবনে যানজুইয়া: ৩৪৫৪ (হাদিসের সনদ সহিহ)

৪. বিস্তারিত দেখুন, *সিয়ারু আলামিন নুবালা:* ৫/৩৯২; *তাহযিবুল কামাল:* ২২/১০২

أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ

এই রেওয়ায়াতের একটি শব্দ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবু ইসহাক বলেছেন, أَدْرَكْتُهُمْ যার অর্থ—'আমি তাদের পেয়েছি'। এখানে তাদের মানে কাদের? এমন একজন তাবিয়ি যিনি ত্রিশের ঊর্ধ্বে সাহাবিকে পেয়েছেন, তিনি যখন বলেন, তাদের পেয়েছি, এর দ্বারা যে কোনো বিবেকবান মানুষেরই বুঝতে অসুবিধা হয় না—উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম।

এ কথাটিই বলেছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা। তিনি বলেন,[১] 'আবু ইসহাক অনেক সাহাবিকে পেয়েছেন। সুতরাং তার أَدْرَكْتُهُمْ কথাটি দ্বারা সাহাবায়ে কেরামই উদ্দেশ্য।'[২]

সালাফি শাইখ আরব বিশ্বের প্রসিদ্ধ আলেম ড. সালিহ আল-উযাইব হাফি.। বলেন, 'এই আবু ইসহাক আস-সাবিয়ি হযরত আলি রাযি.-সহ কতিপয় সাহাবিদের পেয়েছেন। সুতরাং তার أَدْرَكْتُهُمْ কথাটির দ্বারা সাহাবায়ে কেরামই উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়—টাকা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের বিষয়টি সাহাবিদের যুগেও প্রচলিত ছিল।'

সুতরাং এটা দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট—সাহাবায়ে কেরাম যাকাতের হাদিসকে যেমন বাহ্যিক অর্থে প্রয়োগ না করে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য বুঝে নির্ধারিত বস্তুর পাশাপাশি মূল্য দিয়ে যাকাত দিতেন, তেমনিভাবে সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রেও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য বুঝে হাদিসে বর্ণিত বস্তু দিয়ে যেমন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন, তেমনি এগুলোর মূল্য দিয়েও সেটি আদায় করতেন।

তাবেয়িদের সময়েও টাকা দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার প্রচলন ছিল। এমনকি তাদের সময় কেবল ব্যক্তি পর্যায়েই নয়; বরং রাষ্ট্রীয়ভাবেই সাদাকাতুল ফিতর মূল্য দিয়ে আদায় করার নিয়ম চালু হয়।

এ প্রসঙ্গে কুররা ইবনে খালিদ রহ. বলেন, 'আমাদের নিকট খলিফাতুল মুসলিমিন হযরত উমর বিন আবদুল আজিজের পক্ষ থেকে পত্র এল—প্রত্যেক

---

১. ولفظه : وأبو اسحاق أدرك كثيرا من الصحابة فقوله أدركهم يريد به الصحابة

২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ১০৪৭২

ব্যক্তি যেন আধা সা (গম) অথবা তার মূল্য আধা দিরহাম সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে প্রদান করে।'[১]

উমর ইবনে আবদুল আজিজের চিঠির বিষয়টি সহিহ সনদে আওফ রহ. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আওফ বলেন, 'আমি উমর ইবনে আবদুল আজিজের চিঠি শুনেছি। ভাতাপ্রাপ্তদের প্রত্যেকের কাছ থেকে যেন আধা দিরহাম সাদাকাতুল ফিতর গ্রহণ করা হয়।[২]

প্রসিদ্ধ তাবেয়ি হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, 'টাকা দ্বারা সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই।'[৩]

উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ. রাষ্ট্রীয় নির্দেশ জারি করলেন এমন এক সময়, যখন অসংখ্য তাবিয়ি জীবিত ছিলেন; কিন্তু একজন তাবিয়িও কোনো প্রতিবাদ করলেন না যে—না, মূল্য দিয়ে তো সাদাকাতুল ফিতর আদায় হয় না, এটি শরিয়তবিরোধী নির্দেশ। কেউই কিন্তু এমন কথা বলেননি। এর মানে কি এই নয়—বিষয়টি ওই সময় সবার জানা ছিল? এবং সবার কাছেই স্বীকৃত ছিল যে, হাদিসে বর্ণিত খাদ্য দিয়ে যেমন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়, তেমনিভাবে টাকা দিয়েও আদায় করা যায়?

আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাকাতের ক্ষেত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্ত্বেও হযরত মুআয রাযি. মূল্যের প্রতি লক্ষ করে যব এবং ভুট্টার পরিবর্তে চাদর ও পরিধেয় গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'ওটা তোমাদের পক্ষেও সহজ এবং মদিনায় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের জন্যও উত্তম।'

অর্থাৎ আদায়কারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য যেটি বেশি উপযোগী, যাকাতের ক্ষেত্রে এটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়েছে। ইয়ামানবাসীর জন্য যব ও ভুট্টার পরিবর্তে বস্ত্র দেওয়া সহজ ছিল, আবার মদিনার অধিবাসী যারা এই যাকাতের মাল ভোগ করবে, তাদের জন্যও ওই সময় যব, ভুট্টার পরিবর্তে বস্ত্রের প্রয়োজন বেশি ছিল। তাই যাকাত প্রদানকারী এবং গ্রহণকারী উভয়ের জন্য যেটা বেশি উপযোগী, সেটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রেখে হযরত মুআয রাযি. এই আদেশ জারি করেছিলেন।

---

১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ৬/৫০৮ (রেওয়ায়াতটি সহিহ, কুররা ইবনে খালিদ একজন নির্ভরযোগ্য রাবি। তার থেকে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন ওয়াকি ইবনে জাররাহ রাহি.)

২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ:* ৬/৫০৭; *আল-আমওয়াল*, ইবনে যানজুইয়া: ২৪৫৩

৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ:* ৬/৫০৮; *আল-আমওয়াল*, ইবনে যানজুইয়া: ২৪৫৪

একই কথা সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে খাদ্য-শস্য মদিনাবাসীর জন্য উপযোগী ছিল এবং এগুলোই তাদের প্রয়োজন ছিল। তাই তখন খাদ্য-শস্য দেওয়ার কথা বলেছিলেন; কিন্তু এখন মানুষের টাকার বেশি প্রয়োজন। সুতরাং এখন সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে টাকা দেওয়াই বেশি উত্তম হবে। এটি দরিদ্রদের জন্যও বেশি উপকারী হবে। সুতরাং এই প্রশ্নের কোনো অবকাশ নেই—খাদ্য-শস্যের মতো টাকা দিয়েও যদি সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা বৈধ হয়, তা হলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন দিরহাম-দিনারের কথা বললেন না?

উপরের আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—হাদিসে উল্লেখিত বস্তু দ্বারা যেমন সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়, তেমনি এগুলোর মূল্য দ্বারাও সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়।

উল্লেখ্য, কেউ যদি চাল দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করতে চায়, তা-ও করা যাবে। সেক্ষেত্রে খেজুর, কিশমিশ, পনির, যব—এগুলোর এক সা অর্থাৎ ৩ কেজি ২৭০ গ্রামের সমমূল্যের চাল সাদাকা করবে। অর্থাৎ ৩.২৭০ কেজি খেজুরের মূল্য দিয়ে যতটুকু চাল ক্রয় করা যায়, সে-পরিমাণ চাল দিতে হবে। একইভাবে কিশমিশ, পনির, যবের মূল্য হিসাব করে সমমূল্যের চাল দিতে পারবে। অবশ্য গমের হিসাবে দিলে আধা সা অর্থাৎ ১ কেজি ৬৩৫ গ্রামের মূল্য দিয়ে যতটুকু চাল ক্রয় করা যায়, সেটুকু সাদাকাতুল ফিতর হিসেবে আদায় করবে।

প্রসঙ্গত আরেকটি বিষয় বলে রাখা ভালো—হাদিসে পাঁচ ধরনের দ্রব্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে সর্বনিম্ন মূল্যের দ্রব্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের চর্চা বেশি। এ ক্ষেত্রে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দিয়ে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা কর্তব্য।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে বোঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

কুরবানি, আকিকা ও মানত

কুরবানির সাথে আকিকা কি বৈধ নয়?

কুরবানির মতো আকিকাও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে এর কথা উল্লেখ করেছেন, যা হাদিসের কিতাবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে এ কাজটি সম্পাদন করতে হয়। কোনো কারণে এই দিনে আকিকা দিতে না পারলে পরবর্তী সময়েও তা আদায় করার সুযোগ রয়েছে।

কুরবানি ও আকিকা আলাদাভাবেই করা উচিত। তবে কেউ আকিকা ও কুরবানি একসাথে আদায় করতে চাইলে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তা-ও বৈধ হবে। বিষয়টি বুঝার জন্য কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়—

এক. আকিকাও এক ধরনের কুরবানি। হাদিসে আকিকাকে কুরবানি বলা হয়েছে এবং কুরবানির জন্য যে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে, আকিকার ক্ষেত্রে সে-শব্দটিই প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন সুরা আনআমের ১৬২ আয়াতে কুরবানিকে 'নুসুক' বলা হয়েছে। তেমনিভাবে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম-সহ হাদিসের অসংখ্য কিতাবে কুরবানিকে নুসুক বলা হয়েছে। অপর দিকে কুরবানির মতো আকিকার ক্ষেত্রেও হাদিস শরিফে 'নুসুক' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, যার অর্থ কুরবানি।[১] সুতরাং বোঝা গেল, আকিকাও এক ধরনের কুরবানি।

হাসান বসরি রহ. এবং ইবনে সিরিনের মতে—আকিকা কুরবানির মর্যাদা রাখে। আকিকা আদায়কারী নিজে এর গোশত খাবে এবং অন্যকে খাওয়াবে (যেমনিভাবে কুরবানির গোশত নিজে খায়, অন্যকে খাওয়ায়)।[২] এ কারণেই এই দুজনের মতামত—নবজাতকের পক্ষ থেকে কুরবানি দিলে এটাই তার আকিকার জন্য যথেষ্ট হবে।[৩] আর এজন্যই কুরবানি এবং আকিকার গোশত, চামড়া

---

১. *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক: ৭৯৬১; মুসনাদে আহমদ: ১১/৩২০; সুনানে আবু দাউদ: ২৮৪২; সুনানে নাসায়ি: ৪২১২; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৪৭২৭, ২৪৭২২; মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিক: ১৪৪১*

২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৪৭৫০, ২৪৭৫১*

৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা: ২৪৭৪৩*

ইত্যাদির বিধান এক। এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক রহ. এর বক্তব্য খুবই সুস্পষ্ট। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্তানের আকিকা করল, তার সেই আকিকা কুরবানির পর্যায়ের। তাতে চোখের জ্যোতি ক্ষতিগ্রস্ত, শীর্ণকায়, শিং ভাঙা, অসুস্থ প্রাণী জবাই করা জায়েজ হবে না (যেমনিভাবে এগুলো দিয়ে কুরবানি জায়েজ হয় না)। এর গোশত এবং চামড়া বিক্রি করা যাবে না...।[১]

ইবনে আবদুল বার রহ. বলেন, জমহুর ফুকাহার মতও তা-ই। অর্থাৎ আকিকার প্রাণীও ওই সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে, কুরবানির পশু যে সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক।[২]

অন্যত্র বলেন, এ বিষয়ে উলামাদের ইজমা রয়েছে—যেসব গবাদি পশু দিয়ে কুরবানি জায়েজ হয়, শুধু সেসব পশু দিয়েই আকিকা জায়েয হয়।[৩]

দুই. দুই ধরনের কুরবানি (যেমন এখানে আকিকা এবং ওয়াজিব কুরবানি) একটি পশু দ্বারা আদায় করা জায়েজ আছে কিনা, এটি একটি ইজতিহাদি (গবেষণা ও বিশ্লেষণের অবকাশযোগ্য) বিষয়। এ কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে কিছু মতপার্থক্যও আছে। মতপার্থক্য থাকলেও কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট কোনো বিধানে এ বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে বলে আমাদের জানা নেই; বরং অনুমোদনের পক্ষে হাদিস-আছারের প্রমাণ রয়েছে।

যেমন বিখ্যাত তাবিয়ি ইমাম আতা ইবনে আবি রাবাহ রহ. এর ফাতোয়াটিই সম্ভবত বিজ্ঞজনের জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বলেছেন, 'উট ও গরু সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানি হতে পারে। আর এতে শরিক হতে পারে কুরবানিদাতা, তামাত্তু হজ আদায়কারী এবং হজের ইহরাম গ্রহণের পর হজ আদায়ে অপারগ ব্যক্তি।[4]

লক্ষ করুন, সালাফের যুগেই একটি পশু দ্বারা তিন ধরনের কুরবানি আদায় হওয়ার ফাতোয়া কত স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

তিন. গরু বা উটের ক্ষেত্রে একটি পশু সাতজনের সাতটি জবাইয়ের স্থলাভিষিক্ত গণ্য হয়। এ কারণেই একটি উট বা গরু সাতজনের পক্ষে যথেষ্ট হয়। 'সহিহ মুসলিমে' জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত— আমরা হজের ইহরাম বেঁধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বের হলাম। তিনি আমাদের

---

১. *মুয়াত্তায়ে মালেক:* ১৪৪৮

২. *আল-ইসতিযকার:* ১৫/৩৮৪

৩. *আল-ইসতিযকার:* ১৫/৩৮৩

৪. *সুনানে সাঈদ ইবনে মানসুর-আল কিরা লিকাসিদি উম্মিল কুরা:* পৃ. ৫৭৩

আদেশ করলেন—আমরা যেন প্রত্যেক উট ও গরুতে সাতজন করে শরিক হয়ে কুরবানি করি।[১]

অন্য বর্ণনায় আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (একটি) গরু সাতজনের পক্ষ হতে এবং (একটি) উট সাতজনের পক্ষ হতে (কুরবানি করা যাবে)।[২]

চার. সারকথা, আকিকাও এক ধরনের কুরবানি। অপর দিকে 'নুসুক' বা কুরবানির ক্ষেত্রে শরিয়তের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতি এই—ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার ক্ষেত্রে একটি পশু দ্বারা একটি কুরবানি আদায় হলেও উট ও গরুর ক্ষেত্রে একটি পশু দ্বারা সাতটি কুরবানি আদায় হতে পারে। আকিকাও যেহেতু 'নুসুক' বা কুরবানি, তাই এই মূলনীতিতে আকিকাও শামিল থাকবে। সুতরাং 'একটি পশু জবাই' করা দ্বারা যেমন আকিকা আদায় হবে, তেমনিভাবে গরু বা উটের সপ্তমাংশে শরিক হওয়ার দ্বারাও তা আদায় হয়ে যাবে।

এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই—আকিকায় তো একটি পশু জবাই করতে বলা হয়েছে। অতএব, অন্তত পূর্ণ একটি পশু জবাইয়ের দ্বারাই তা আদায় হতে পারে; পশুর সপ্তমাংশ দ্বারা নয়। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে পশু জবাইয়ের দায়িত্ব যেমন একটি পশু জবাই করার দ্বারা আদায় হয়, তেমনিভাবে নির্ধারিত পশুতে অন্যদের সাথে শরিক হওয়ার দ্বারাও আদায় হয়। আকিকার ক্ষেত্রে এই মূলনীতি প্রযোজ্য নয় বলে দাবি করলে ব্যতিক্রমের বিধানসংবলিত দলিল লাগবে। আমাদের জানামতে এমন কোনো দলিল নেই।

* * *

কুরবানির দিনে নখ-চুল কাটার আদেশ কি কেবল কুরবানিদাতার জন্য?

কুরবানিদাতার জন্য জিলহজ মাস শুরু হওয়ার পর নখ-চুল কাটা থেকে বিরত থাকা এবং কুরবানির পর তা কাটা উত্তম। এ প্রসঙ্গে সহিহ হাদিসে উম্মে সালামা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

---

১. *সহিহ মুসলিম: ১৩১৮/৩৫১*
২. *সুনানে আবু দাউদ: ২৮০৮*

‘যখন জিলহজের প্রথম দশক শুরু হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে কুরবানি করবে, সে যেন তার চুল-নখ না কাটে।’[১]

তবে এ হুকুম তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যারা জিলকদের শেষে নখ-চুল কেটেছে। অন্যথায় মুস্তাহাবের উপর আমল করতে গিয়ে নখ-চুল বেশি লম্বা হয়ে যাবে, যা সুন্নতের খেলাফ।

কুরবানিদাতার পাশাপাশি যিনি কুরবানি দেন না বা যার কুরবানি করার সামর্থ নেই, তার জন্যও এই হুকুম প্রযোজ্য। হযরত আমর ইবনে আস রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ. فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“আমাকে কুরবানির দিনে ঈদ পালনের আদেশ করা হয়েছে, যা আল্লাহ এ উম্মতের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এক সাহাবি আরজ করলেন, ‘ইয়া রাসুলাল্লাহ, যদি আমার কাছে শুধু একটি মানিহা থাকে (অর্থাৎ অন্যের থেকে নেওয়া দুগ্ধদানকারী উটনী) আমি কি তা কুরবানি করতে পারি?’ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘না। তবে তুমি চুল, নখ ও মোচ কাটবে এবং নাভির নিচের পশম পরিষ্কার করবে। এটাই আল্লাহর দরবারে তোমার পূর্ণ কুরবানি হিসেবে গণ্য হবে।”[২]

শায়খ নাসিরুদ্দিন আলবানি রহ. উক্ত হাদিসকে দুর্বল বলেছেন।[৩] তিনি বলেন, ‘এই সনদটি আমার মতে দুর্বল। হাদিসের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য কেবল সাদাফি ছাড়া। কেননা ইবনে হিব্বান ছাড়া কেউ-ই তাকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেননি।’

এই হচ্ছে তার বক্তব্য। তিনি দুর্বলতার কারণ হিসেবে ঈসা ইবনে হেলাল আস-সাদাফির জাহালতকেই দায়ী করেছেন। এটা শায়খ রহ. এর তাসামুহ (ভুল)। সম্ভবত তিনি আবু ইয়াকুব ফাসাওয়ি রহ. এর তাওসিক সম্পর্কে অবগত হতে পারেননি, নতুবা তিনি এমন বলতেন না। কেননা ফাসাওয়ি রহ. মিসরের

---

১. *সহিহ মুসলিম*: ১৯৭৭; *জামে তিরমিজি*: ১৫২৩
২. *সুনানে আবু দাউদ*: ২৭৮৯; *সুনানে নাসায়ি*: ৪৩৬৫; *মুসনাদে আহমদ*: ১১/১৩৯; *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ১৩/১৬৩; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ৪/২২৪
৩. *যয়িফু আবি দাউদ*: ৪৮২; *মিশকাতুল মাসাবিহ*: ১৪৭৯

নির্ভরযোগ্য তাবেয়িদের আলোচনা শুরু করেন এবং এক পর্যায়ে সেই নির্ভরযোগ্য তাবেয়িদের মধ্যে এই সাদাফির নামও উল্লেখ করেন।[১]

এ ছাড়া মিশরের প্রসিদ্ধ পাঁচ ব্যক্তিত্ব এই সাদাফির কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন—১. আইয়াশ ইবনে আব্বাস আল-কিতবানি, ২. কাব ইবনে আলকামা, ৩. ইয়াযিব ইবনে আবি হাবিব, ৪. দাররাজ আবুস সামাহ, ৫. আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ আত-তুজিবি।[২]

সুতরাং তাকে মাজহুল বলা ঠিক নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তার *আত-তাকরিব* গ্রন্থে এই সাদাফিকে 'সাদুক' (নির্ভরযোগ্য) বলেছেন। এ ছাড়া *ফাতহুল বারিতে* (১০/৮) অন্য এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, এ বিষয়ে আমর ইবনে আস রাযি. এর হাদিস দিয়ে দলিল দেওয়া যায়। অতঃপর উপরোক্ত হাদিসকে উল্লেখ করে ইবনে হিব্বানের তাসহিহের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

তা ছাড়া হাকিম রহ. হাদিসের সনদকে সহিহ বলেছেন, হাফেয যাহাবিও এতে একমত হয়েছেন।[৩] শায়খ আলবানির সামসময়িক আলেম শায়খ শুআইব আল-আরনাউতও উক্ত হাদিসের সনদকে *মুসনাদে আহমদে* (১১/১৩৯) হাসান বলেছেন। আর *সহিহ ইবনে হিব্বানের* তাখরিজে (১৩/১৬৩) সহিহ বলেছেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়—হাদিসটি নির্ভরযোগ্য। অতএব কুরবানিদাতার মতো সে-ও জিলহজের শুরু থেকে চুল-নখ কাটা বন্ধ রাখবে। চুল-নখ জিলহজের শুরু থেকে কাটা বন্ধ রাখার বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এমনই জানা যায়। যেমন—

ক. ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আজলানকে জিলহজের প্রথম দশকে চুল কাটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমাকে নাফে রহ. বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এক নারীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। মহিলাটি জিলহজের প্রথম দশকের ভেতর তার সন্তানের চুল কেটে দিচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, যদি ঈদের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে, তা হলে ভালো হত।[৪]

---

১. *আল-মারেফা ওয়াত তারিখ*: ২/৪৮৭; ২/৫১৫

২. *আস-সিকাত*, ইবনে হিব্বান: ৫/২১৩; *যাখিরতুল উকবা শরহুল মুজতাবা*: ৩৩/২৮৩

৩. *আল-মুসতাদরাক*: ২/২২৪

৪. *মুসতাদরাকে হাকেম*: ২/২২১

খ. মুতামির ইবনে সুলাইমান আত-তাইমি রহ. বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি—ইবনে সিরিন রহ. জিলহজের প্রথম দশকে চুল কাটা অপছন্দ করতেন। এমনকি এই দশকে ছোট বাচ্চাদের মাথা মুণ্ডন করাও অপছন্দ করতেন।[১]

এসব দলিলের আলোকে বলা যায়— কেবল কুরবানিদাতার জন্যই নয়, বরং সকলের জন্যই জিলহজ মাস শুরু হওয়ার পর থেকে কুরবানির আগ পর্যন্ত নখ, গোঁফ ও চুল না কাটা উত্তম। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই—এ বিধানটি কুরবানিদাতার জন্য অন্যের তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

* * *

মানত : কিছু অস্পষ্টতা নিরসন

আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের মানত করে থাকি। সাধারণত মনে করা হয়—মানত করলেই তা আদায় করা অপরিহার্য হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, যে কোনো মানতই শরিয়তে সহিহ সাব্যস্ত হয় না, বরং মানত সহিহ হওয়ার জন্য এবং শরিয়তের দৃষ্টিতে মানত হিসেবে ধর্তব্য হওয়ার জন্য কয়েকটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছে। এগুলো জানা না থাকার কারণে অনেকেই সমস্যার মুখোমুখি হন। তাই সংক্ষিপ্তভাবে আমরা মানত ও মানতের শর্ত এবং মানতসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য কিছু বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব।

এক. মানতকৃত বিষয়টি মৌলিক ইবাদত হতে হবে, অন্য কোনো ইবাদতের ভূমিকা বা সহায়ক হলে হবে না। যেমন নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি মৌলিক ইবাদত হতে হবে। কিন্তু ওজু করা; রোজার নিয়ত করা; হজ আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা; যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্যে খাদ্য-বস্ত্র ক্রয় করা ইত্যাদি মৌলিক ইবাদত নয়, বরং পূর্বোক্ত ইবাদতসমূহের ভূমিকা ও সহায়ক। সুতরাং এসবের মানত করলে তা সহিহ হবে না।

তেমনিভাবে মসজিদ নির্মাণের মানত করলে মানত সহিহ হবে না। কেননা মসজিদ নির্মাণ যদিও ওয়াজিব; কিন্তু তা মৌলিক ইবাদত নয়। একইভাবে কেউ যদি তাবলিগে যাওয়ার মানত করে, তাহলে সেই মানতও সহিহ হয় না এবং তার জন্য মানতের কারণে তাবলিগে যাওয়া অপরিহার্যও হয় না।

---

১. *মুসনাদে মুসাদ্দাদ-ইতহাফুল খিয়ারাহ: ৫/৩১১; আল-মাতালিবুল আলিয়া: ১০/৪৪৮*

এ কারণেই (অর্থাৎ মানতকৃত বিষয়টি মৌলিক ইবাদত হতে হবে) আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রহ. বলেন, কেউ যদি মসজিদে টাকা দেওয়ার মানত করে, আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয় মসজিদকে হেবার মাধ্যমে মালিক বানিয়ে দেওয়া, তাহলে তার মানত সহিহ হবে না। তবে যদি এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়—টাকা দিয়ে কোনো বস্তু ক্রয় করে মসজিদে ওয়াকফ করবে, তাহলে তার মানত সহিহ হয়ে যাবে এবং তার জন্য কৃত মানত পূরণ করা ওয়াজিব হবে। কেননা মসজিদে টাকা দেওয়া কোনো মৌলিক ইবাদত নয়, পক্ষান্তরে ওয়াকফ মৌলিক ইবাদত।

অর্থাৎ মসজিদে টাকা দেওয়া দ্বারা কারও যদি উদ্দেশ্য থাকে—টাকা দিয়ে মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস কিনে মসজিদে ওয়াকফ করবেন, তাহলে মানত শুদ্ধ হবে। তবে সাধারণত এই উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ মানত করে না, বা মানত করার পরেও ওয়াকফের পন্থা গ্রহণ করে না। সাধারণত অসুখবিসুখ হলে মসজিদে টাকা দেওয়ার মানত করা হয়, এবং জুমুআর দিন মসজিদের দানবক্সে মানতের সদকা দান করা হয়। হ্যাঁ, কেউ যদি মসজিদে দান করার মানত করে, তাহলে যদিও তার মানত সহিহ হবে না; কিন্তু সতর্কতা হিসবে মসজিদে সেই পরিমাণ টাকা দান করে দেওয়া উচিত।

দুই. মানত সহিহ হওয়ার জন্য মুখে উচ্চারণ করা শর্ত। নিয়ত ও সংকল্পের দ্বারা মানত হয় না। তেমনিভাবে মানতের সময় মুখে যা উচ্চারণ করা হবে, শুধু তা-ই ধর্তব্য হবে। এমনকি ভুলেও যদি কোনো কিছুর মানত মুখে উচ্চারণ করে বসে, তাহলেও তা পূর্ণ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। তাই যদি অন্তরে এক জিনিস থাকে, আর মুখে ভুলবশত অন্য কিছু উচ্চারণ করে বসে, তাহলে উচ্চারণকৃত বিষয়ই তার উপর অপরিহার্য হবে। কারণ বিয়ে, তালাক, কসম এবং মানতের ক্ষেত্রে ভুল বা দুষ্টুমির কোনো বিবেচনা করা হয় না। ভুলে বা দুষ্টুমি করে কোনো কিছু বললেও তা অবধারিত হয়ে যায়।

তিন. মানতকৃত বিষয়ের শ্রেণিভুক্ত কোনো কিছু পারিভাষিক ওয়াজিব বা ফরজে আইন হতে হবে। মানতকৃত বিষয়ের শ্রেণিভুক্ত কোনো কিছু যদি ফরজে আইন বা পারিভাষিক ওয়াজিব না হয়ে থাকে, তাহলে মানত সহিহ হবে না। যেমন কেউ শাওয়ালের ছয় রোজা রাখার মানত করল, তার এই মানত সহিহ হয়ে যাবে। কারণ শাওয়ালের ছয় রোজার শ্রেণিভুক্ত ফরজে আইন রয়েছে, আর তা হল রমজানের রোজা। সুতরাং রোজা, নামাজ, সদকা, ইতিকাফ, ওয়াকফ, তাওয়াফ, দাসমুক্তি, কুরআন তেলাওয়াত, দরুদপাঠ, তাসবিহ আদায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানত সহিহ হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি মাদরাসায় পড়ার বা পড়ানোর মানত করে, কিংবা মসজিদে প্রবেশের মানত করে, অথবা রাস্তা-ব্রিজ নির্মাণের মানত করে, কিংবা কোনো অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করার মানত করে, এসব ক্ষেত্রে তার মানত শরিয়তের দৃষ্টিতে ধর্তব্য হবে না।

তেমনিভাবে ইসালে সাওয়াবের মানতও সহিহ হয় না। কেউ যদি মানত করে—আমার অমুক কাজটি হয়ে গেলে আমি এই পরিমাণ দুস্থ ব্যক্তিকে খাইয়ে অথবা এই পরিমাণ অর্থ সদকা করে অমুক মৃত ব্যক্তির নামে ইসালে সাওয়াব করব, তাহলে তার জন্য ইসালে সাওয়াব করা অপরিহার্য হবে না। কেননা ইসালে সাওয়াবের শ্রেণিভুক্ত কোনো কিছু ফরজে আইন বা পারিভাষিক ওয়াজিব নয়। আর এখানে যে সদকা রয়েছে, তা মানতের মূল বিষয় নয়, বরং প্রাসঙ্গিক বিষয়। এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় হল ইসালে সাওয়াব, সদকা নয়। তাই বলে উপরোক্ত কাজগুলো করতে পারবে না—বিষয়টি এমন নয়; বরং এগুলো করতে পারবে এবং পুণ্যের কাজ হিসেবে এতে সাওয়াবও পাবে, কিন্তু মানত হিসেবে তার উপর এগুলো পূরণ বা বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হবে না।

চার. মানতকৃত বিষয়টি মৌলিকভাবে হারাম হতে পারবে না। ইমাম ত্বহাবি রহ. বলেন, 'কেউ যদি মানত করে—আমি অমুককে হত্যা করে ফেলব, তাহলে এটি মানত হবে না; বরং কসম হিসেবে ধর্তব্য হবে, এবং তার উপর সেই কসম ভঙ্গ করা ও কাফফারা আদায় করা অপরিহার্য হবে।' তাই কেউ যদি ঈদের দিন রোজা রাখার মানত করে, তাহলে তার মানত সহিহ হয়ে যাবে। কেননা ঈদের দিন রোজা রাখা মৌলিকভাবে হারাম নয়; বরং প্রাসঙ্গিক কারণে হারাম। তবে এক্ষেত্রে সে ঈদের দিন রোজা না রেখে ঈদ-পরবর্তী অন্য কোনো দিন রাখবে।

মোটকথা, রোজার মানত সহিহ হবে, তবে অতিরিক্ত যে বিশেষণ যুক্ত করেছে, তা অবিবেচিত হবে। একান্ত কেউ যদি মানত পূরণ করার জন্য ঈদের দিনই রোজা রাখে, তাহলে সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে; যদিও এর কারণে সে গুনাহগার হবে।

পাঁচ. মানতকৃত বিষয়টি আগে থেকেই মানতকারীর জন্য অপরিহার্য থাকতে পারবে না। তাই কেউ যদি এমন কিছুর মানত করে, যা পূর্ব থেকেই তার উপর অপরিহার্য, তাহলে মানতও পূরণ করতে হবে এবং যা পূর্ব থেকে অপরিহার্য, তাও স্বতন্ত্রভাবে আদায় করতে হবে।

যেমন কারও উপর কুরবানি ওয়াজিব। এখন সে মানত করল—আমার ছেলে যদি সুস্থ হয়, তাহলে আমি একটি গরু কুরবানি করব। এমতাবস্থায় যদি তার ছেলে সুস্থ হয়, তাহলে তাকে স্বাভাবিক কুরবানিও করতে হবে এবং মানতের কারণে আরেকটি স্বতন্ত্র কুরবানিও আদায় করতে হবে। এটি তার উপর ওয়াজিব। একই কথা নামাজ, হজ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও।

হ্যাঁ, কুরবানির দিনগুলোতে কেউ যদি শর্তহীনভাবে কুরবানির মানত করে, (যেমন আমি মানত করলাম—আমি একটি গরু কুরবানি করব; সাথে কারও সুস্থতা বা সফলতার শর্ত যুক্ত করল না) আর এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হয়—ওয়াজিব কুরবানির সংবাদ প্রদান, তাহলে তার উপর স্বতন্ত্রভাবে মানতের কুরবানি অপরিহার্য হবে না। তবে যদি সংবাদ প্রদান উদ্দেশ্য না হয়ে থাকে, বরং আলাদাভাবে মানত করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে তার উপর দুটো কুরবানি ওয়াজিব হবে। কুরবানির দিনগুলোর ক্ষেত্রেও এই কথা। কুরবানির দিন শুরু হবার আগে কেউ যদি মানত করে, সেক্ষেত্রে তা সংবাদ প্রদান হিসেবে ধরা হবে না। কারণ সংবাদ প্রদান হয় ওয়াজিব হওয়ার পরে। আর কুরবানি ওয়াজিব হয় ঈদের দিন শুরু হলে, এর আগে নয়।

ছয়. অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর মানত করলে মানত সহিহ হয় না। তেমনিভাবে নিজের মালিকানায় নেই—এমন বস্তুর মানত করলেও তা সহিহ হয় না। যেমন কেউ যদি মানত করে—আমি অমুকের গরু গরিবদের সদকা করব, অথবা মানত করল—এক হাজার টাকা সদকা করব, অথচ তার মালিকানায় আছে পাঁচশ টাকা, তাহলে অন্যের গরুও সদকা করা লাগবে না, তেমনিভাবে পাঁচশ টাকাই সদকা করা তার উপর অপরিহার্য হবে; এক হাজার টাকা নয়।

সাত. অসাধ্য ও অসম্ভব বিষয়ের মানত শরিয়তের দৃষ্টিতে মানত হিসেবে ধর্তব্য হয় না। অসাধ্য ও অসম্ভব হওয়ার দুটি অর্থ হতে পারে:—

ক) প্রাকৃতিকভাবে বিষয়টি অসম্ভব। যেমন গতকালের রোজা বা গতদিনের ইতিকাফের মানত।

খ) শরিয়তের দৃষ্টিতে অসম্ভব। যেমন ঋতুস্রাব চলাকালীন রোজা রাখার মানত।

আট. নাবালেগের মানত ধর্তব্য হয় না। সুতরাং নাবালেগ অবস্থায় কোনো মানত করলে বালেগ হওয়ার পর তা পূরণ করা অপরিহার্য হবে না।

নয়. আল্লাহর নামে মানত করা জায়েজ, তবে গাইরুল্লার নামে মানত করা হারাম ও শিরক। এ কারণে মাজারে পিরদের ব্যাপারে শিরকি আকিদা পোষণ করে তাদের নামে যে সকল পশু মানত করা হয়, তা সম্পূর্ণ হারাম এবং এ জাতীয় মানতের বস্তু খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম, যদিও তা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা হয়ে থাকে। যেমন শাহ জালাল, শাহ্ পরানের মাজারে অনেকে মানত করেন। বিশেষত উরসের সময় গরু-ছাগল ইত্যাদি মানত করা হয়। অতঃপর মানতের গরু-ছাগল দিয়েই বিরিয়ানি পাকানো হয়। কিন্তু মাসআলা জানা না থাকার কারণে অনেক সাধারণ মানুষ বরকত মনে করে তা খায়। অথচ এটি সম্পূর্ণ হারাম।

দশ. মানতের ক্ষেত্রে মূল বিষয়টি পূর্ণ করা জরুরি। অতিরিক্ত যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার সাথে যুক্ত করা হয়ে থাকে, তা পূর্ণ করা জরুরি নয়। যেমন কেউ মানত করল, আমি পাঁচশ টাকার এই নোটটা অমুক গরিব ব্যক্তিটিকে অমুক স্থানে বসে সদকা করব, অথবা আমি বাইতুল মুকাররম মসজিদের দক্ষিণ প্রান্তে একটি ফ্যান ছেড়ে ও দুটো বাতি জ্বালিয়ে ছয় রাকাত নামাজ আদায় করব, তাহলে তার জন্য উপরোক্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণ করা অপরিহার্য হবে না; বরং তার জন্য নির্ধারিত পরিমাণ সদকা যে কোনো নোট দিয়ে যে কোনো গরিবকে আদায় করে দেওয়া এবং যে কোনো জায়গায় বসে ছয় রাকাত নামাজ আদায় করাই যথেষ্ট। তেমনিভাবে কেউ যদি মানত করে খালি পায়ে হেঁটে হজ করতে যাবে। তাহলে খালি পায়ে যাওয়া আবশ্যক নয়।

এগারো. পশু জবাইয়ের মানত করলে পশুও জবাই করা যায়, তার মূল্যও সদকা করা যায়। তবে কুরবানির মানত করলে মানতকৃত পশুই কুরবানি করতে হয়; মূল্য সদকা করলে হবে না। যদি পশু সদকা করার মানত করে, তাহলে কী ধরনের পশু সদকা করবে—এ সম্পর্কে আল্লামা জাফর আহমদ উসমানি রহ. বলেন, এমন পশু সদকা করতে হবে, যা কুরবানির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। অর্থাৎ ছাগল হলে এক বছর বয়সী ছাগল, আর গরু হলে দুই বছর বয়সী গরু।

বারো. শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরই কেবল মানত পূরণ করা অপরিহার্য হয়; তার পূর্বে নয়। এমনকি কেউ যদি শর্ত পাওয়ার আগে মানত আদায় করে দেয়, তাহলে তা মানত হিসেবে আদায় হয় না। উদাহরণস্বরূপ: কেউ মানত করল—যদি অমুক নারীকে আমি বিয়ে করতে পারি, তাহলে তিনটি রোজা রাখব। এখন সে যদি মেয়েটিকে বিয়ে করার আগেই তিনটি রোজা রেখে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা তার মানত পূরণ হবে না; বরং তা সাধারণ নফল রোজা

হিসেবে গণ্য হবে। এরপর যদি ওই নারীর সাথে তার বিয়ে হয়, তাহলে পুনরায় তাকে মানতের তিনটি ওয়াজিব রোজা রাখতে হবে।

তের. কসম ও মানতের শব্দের ক্ষেত্রে 'উরফ' তথা সমাজে প্রচলিত শব্দের বিবেচনা করা হয়। সুতরাং উরফে যে সকল শব্দকে মানতের শব্দ মনে করা হয়, সেগুলোর দ্বারা মানত হবে। এজন্য মানতের শব্দ দ্বারা কোনো কথা বলা হলে পরবর্তী সময়ে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না—তা দ্বারা আমার মানত উদ্দেশ্য ছিল না।

মানত হওয়ার জন্য সরাসরি মানত শব্দ বা এমন কোনো শব্দ ব্যবহৃত হতে হবে, উরফে যার দ্বারা নিজের উপর কোনো কিছুকে অপরিহার্য করে নেওয়া উদ্দেশ্য হয় এবং তার দ্বারা ওয়াদা বোঝায় না। অবশ্য শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে তেমন শব্দ না হলেও তা মানত হয়ে যায়। কারণ শর্তযুক্ত মানতের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত শর্ত পাওয়া গেলে নিজের উপর সেই দায় অবধারিত করে নেওয়াটাই সাধারণত উরফে উদ্দেশ্য হয়। যেমন কেউ বলল, আমার ছেলে সুস্থ হলে এ বছর হজ আদায় করব। এখন যদি তার ছেলে সুস্থ হয়, তখন তার মানত পূরণ করা ওয়াজিব।

চৌদ্দ. মানত করার পর তা পূরণ করার ক্ষেত্রে অযথা বিলম্ব করা অনুচিত। কেননা মানত পূরণ করার পূর্বে কারও মৃত্যু এসে গেলে এজন্য সে গুনাহগার হবে।

মানতের কয়েকটি উদাহরণ

কিছু কিছু মানতের ক্ষেত্রে সমাজে অনেক ভ্রান্তি রয়েছে। বিধানসহ এ ধরনের মানতের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

ক. কেউ যদি কুরআন তেলাওয়াত করার মানত করে, তাহলে তার মানত সহিহ হয়ে যাবে। কিন্তু কেউ যদি অন্যকে দিয়ে কুরআন পড়ানোর বা খতম করানোর মানত করে, তাহলে সেই মানত সহিহ হবে না। একই কথা রোজা, নামাজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। নিজে করার মানত করলে তা শুদ্ধ হবে। অন্যকে দিয়ে করানোর মানত করলে শুদ্ধ হবে না।

খ. কেউ যদি অত্যধিক পরিমাণ নফল নামাজ বা অন্য কোনো ইবাদত করার মানত করে, তাহলে তার মানত পূরণ করা ওয়াজিব। কেউ যদি সত্তর হাজার রাকাত নফল নামাজ পড়ার মানত করে, তাহলে কীভাবে তার মানত পূর্ণ করবে? এই প্রশ্নের জবাবে আল্লামা আবদুর রহিম লাজপুরি রহ. বলেন, নফল নামাজের মানতের ক্ষেত্রে নির্ধারিত রাকাত সংখ্যা অনুসারে দৈনিক রাতদিন মিলিয়ে যত

রাকাত নফল আদায় করা সম্ভব, তা আদায় করতে হবে। তা আদায় করার জন্য নির্ধারিত সময়সীমা নেই। তবে দ্রুত তা সম্পাদন করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত। এর জন্য কাফফারা বা অন্য কোনো বিকল্প নেই।

গ. কেউ যদি মানত করে—অমুক কাজটি হয়ে গেলে আমি আজীবন প্রতি শুক্রবার রোজা রাখব। এক্ষেত্রে আল্লামা আবদুর রহিম লাজপুরি রহ. বলেন, তার জন্য প্রতি শুক্রবার রোজা রাখা অপরিহার্য। অন্য দিন রোজা রাখার দ্বারা মানত আদায় হবে না। একান্ত কোনো শুক্রবারে রোজা না রাখতে পারলে পরবর্তী সময়ে তা কাজা করা জরুরি। বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর যদি তার পক্ষে আর রোজা রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে প্রতি শুক্রবারের রোজার জন্য একেকটি ফিদয়া আদায় করতে হবে। অসচ্ছল হওয়ার কারণে ফিদয়া আদায়ের সামর্থ্য না থাকলে আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করবে।

ঘ. লাগাতার নির্দিষ্ট মেয়াদি রোজা রাখার মানত করলে সেই নির্দিষ্ট মেয়াদে রোজা লাগাতার রাখা জরুরি। আর মানতের সময় লাগাতার রাখার কথা উল্লেখ না করে থাকলে, তা বিরতির সাথেও রাখা যায়, লাগাতার রাখা জরুরি নয়।

ঙ. মানতকৃত পশু কুরবানি করার আগে যদি মারা যায়, তাহলে এর জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কিন্তু মানতকৃত পশু কুরবানি করার আগে যদি সে বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে সেই বাচ্চাও কুরবানি করতে হবে।

চ. কেউ যদি মিথ্যা মামলায় সফল হওয়ার জন্য সদকা বা অন্য কিছুর মানত করে, তাহলে যদিও সে এ কারণে গুনাহগার হবে, তবুও মানত পূরণ করা ওয়াজিব। তেমনি গরিব লোকদের জন্য সেই মানতের দান-সদকা গ্রহণ করাও জায়েজ হবে।

* * *

মানত ও আমাদের ভ্রান্তি

যে কোনো বিপদাপদে আমাদের সমাজে মানত করার প্রচলন রয়েছে। কেউ বিপদে পড়লে কিংবা অসুস্থ হলে সাধারণত এভাবেই মানত করে—আল্লাহ যদি আমাকে আমাকে সুস্থ করে দেন, অথবা এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তা হলে দুই রাকাত নামাজ পড়ব কিংবা দুটি রোজা রাখব; অথবা একটি গরু বণ্টন করে দেবো। অর্থাৎ মানতকে রোগ কিংবা বিপদাপদ থেকে মুক্তির সাথে শর্ত করা হয়ে থাকে।

মানতের এই পদ্ধতি সঠিক নয়। হাদিস শরিফে এ ধরনের মানতের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মানত থেকে নিষেধ করে বলেছেন, এটি কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না। এটি তো কৃপণের কাছ থেকে মাল বের করার একটি পথ।[১]

সাধারণ মানত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত হলেও শর্তযুক্ত মানত করা নিষেধ। এই নিষেধাজ্ঞার অনেক কারণ রয়েছে। একটি কারণ হল আকিদাগত। কেননা এতে নানাবিধ আশঙ্কা রয়েছে। লোকে মনে করবে— মানতের দ্বারা তাকদির পরিবর্তন হয়। মনে করবে— অমুকের তাকদিরে একভাবে লেখা ছিল, কিন্তু মানতের কারণে তার তাকদির পরিবর্তন হয়ে গেছে। অথচ বাস্তবতা হল, মানতের দ্বারা 'তাকদিরে মুবরাম' তথা অপরিবর্তনশীল তাকদির পরিবর্তন হওয়া তো দূরের কথা, 'তাকদিরে মুআল্লাক' তথা দোয়ার মাধ্যমে যে তাকদির পরিবর্তন হয়, সেটিও পরিবর্তন হয় না।[২]

হ্যাঁ, কখনও কোনো বিষয়ে মানত করা হয় এবং তা তাকদিরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যায়। আর এতেই মানুষ মনে করে—মানতের কারণে তার তাকদির পরিবর্তন হয়েছে। অথচ এই বিপদাপদ, রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা তার তাকদিরেই লেখা ছিল। এক হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَرِّبُ مِن ابْنِ آدَمَ شَيْئًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ قَدَّرَهُ لَهُ، وَلَكِنْ النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ فَيُخْرَجُ بِذَلِكَ مِنَ الْبَخِيلِ مَا لَمْ يَكُنِ الْبَخِيلُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَ.

'মানত মানুষকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না, যা আল্লাহ তার তাকদিরে লিখে দেননি। তবে কখনও কখনও মানুষ এমন কোনো বিষয়ের মানত করে, যা তার তাকদিরেই লেখা থাকে। এর মাধ্যমে কৃপণের হাত থেকে এমন কিছু সম্পদ বের করা হয়, যা বের করার ইচ্ছা কৃপণের ছিল না।'[৩]

---

১. *সহিহ বুখারি: ৬৬০৮, সহিহ মুসলিম:* ১৬৪০

২. অর্থাৎ মানুষ যা চায়, তা পূরণ করার ক্ষেত্রে মানত কোনো প্রভাবই সৃষ্টি করতে পারে না, এমনকি এটি আসবাবের স্তরেও নয়। পক্ষান্তরে দোয়া এটি প্রভাব বিস্তারকারী সবব। কেননা এর দ্বারা 'তাকদিরে মুআল্লাক' পরিবর্তন হয়। (*তাকমিলা:* ২/১৩৫)

৩. *সহিহ বুখারি: ৬৬০৯, সহিহ মুসলিম:* ১৬৪৩

সুতরাং তাকদির পরিবর্তন হওয়ার এতেকাদ (বিশ্বাস) নিয়ে যদি এ ধরনের মানত করা হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণ না জায়েজ। অবশ্য মানত যদি বাতিল এতেকাদ ও বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, তা হলে এমন মানত হারাম হবে না বটে; কিন্তু তখনও এটি 'কারাহাত' থেকে মুক্ত হবে না। অর্থাৎ মাকরুহ হবে। এর দুটি কারণ রয়েছে—

ক. ইবাদত করতে হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, খালেস নিয়তে, আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য। কিন্তু শর্তযুক্ত মানতের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। শর্তযুক্ত মানতের সর্বোচ্চ তাৎপর্য হল কৃপণের হাত থেকে কিছু সম্পদ বের হওয়া। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা মানুষের কোনো কল্যাণ করতে পারে না। এর মাধ্যমে কেবল কৃপণ ব্যক্তি থেকে সম্পদ বের করা হয়।[১]

খ. শর্তযুক্ত মানতের মধ্যে বান্দার নিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। মানতকারী যেন আল্লাহকে লোভ দেখাচ্ছে—তুমি আমাকে এটি দিলে আমি তোমার এই ইবাদত করব বা এই সদকা করব। অথচ আল্লাহ তায়ালা কারও ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। এজন্যই হাদিসে বলা হয়েছে, 'এ ধরনের মানত কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।'

তবে এর অর্থ এই নয়—এ ধরনের মানত করলে তা আদায় করা লাগবে না। বরং সর্বাবস্থায় মানত আদায় করতে হবে। সুতরাং কেউ বিপদাপদ, বালা-মুসিবত, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির সম্মুখীন হলে তার উচিত কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করা, সাধ্যানুযায়ী দান-খয়রাত করা। আর নগদ দান-খয়রাত না করতে পারলে এভাবে মানত করতে পারে—আমি দুই রাকাত নামাজ পড়ার মানত করলাম কিংবা ওই বস্তুটি সদকার মানত করলাম। উদ্দেশ্য অর্জন হলে এই কাজ করব; এই ইবাদত করব, এভাবে মানত করা ঠিক নয়।[২]

* * *

মাজারের নামে মানত ও আমাদের ভ্রান্তি

বিভিন্ন মাজারে উরস উপলক্ষ্যে গরু, খাসি, উট ইত্যাদি জবাই করে বিরিয়ানি পাকানো হয়। অনেকে বরকতময় মনে করে খুব গুরুত্বের সাথে এগুলো খেয়ে থাকেন। অথচ তারা জানেন না—এগুলো খাওয়া হারাম। কেননা, সাধারণত

---

১. *সুনানে নাসায়ি:* ৩৮০১
২. আরও বিস্তারিত দেখুন, *তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম:* ২/১৩৩-১৩৫

মানুষ পির এবং মাজারপন্থিদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মাজারের নামে কিংবা বাবার নামে মানত করে থাকে। আর গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে কোনো বস্তু মানত করা যেমন হারাম, মানতকৃত বস্তু খাওয়াও হারাম।

মানত একটি ইবাদত। আর ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য সুনির্ধারিত। তাই কোনো মাখলুকের জন্য মানত করা শিরক। কারণ সচরাচর মানত করা হয় বিপদাপদ, বালা-মুসিবত দূর হওয়ার জন্য, অথবা কোনো মাকসাদ হাসিলের জন্য। সুতরাং ওই সত্তার নামেই মানত করা যাবে, যিনি বিপদাপদ দূর করতে পারেন, এবং প্রয়োজন মেটাতে পারেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে মানত করল, সে যেন তাকেও আল্লাহর মতো মুক্তিদাতা, উদ্ধারকর্তা ও প্রয়োজন পূরণকারী মনে করল। এর দ্বারা সে আল্লাহর 'রুবুবিয়ত' (রব) বৈশিষ্ট্যে অন্যকে অংশীদার বানালো।

মাজার এবং পিরের নামে আজকাল যে মানত করা হয়, কুরআন-হাদিসের আলোকে এ ধরনের মানত সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ, কুফর এবং শিরক। ফিকহের কিতাবেও বিষয়টির ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ফকিহগণ বলেছেন, এ ধরনের মানত সর্বসম্মত বাতিল। কারণ—

ক. কোনো মাখলুকের নামে মানত হতে পারে না, আর এই মানত মাখলুকের নামেই করা হচ্ছে। অথচ মানত একটি ইবাদত, আর ইবাদত কোনো সৃষ্টিজীবের জন্য হতে পারে না।

খ. মানতকারী যদি ধারণা করে—মৃত ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়াবলিতে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাখে। তার এই আকিদা-বিশ্বাস সম্পূর্ণ কুফরি।[১]

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে—মাজার কিংবা পিরের নামে যে মানত করা হয়, এবং যে পশু জবাই করা হয়, এগুলো পির এবং মাজারপন্থিদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। অথচ পশু জবাই করা একটি ইবাদত, আর ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত। সুতরাং প্রাণমাত্রই প্রাণ সৃষ্টিকারীর জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে।

কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

---

১. *ফাতাওয়ায়ে শামি:* ৩/৪২৭

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ _ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.

'আপনি বলুন, আমার নামাজ, আমার কুরবানি এবং জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তার কোনো অংশীদার নেই। আমি এরই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম আনুগত্যশীল।' (সুরা আনয়াম, আয়াত ১৬২)

তেমনিভাবে সুরা মায়িদার তৃতীয় আয়াতে وما أهل لغير الله এর দ্বারা সেই জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের নামে এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

তেমনিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه.

'ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহ তায়ালার অভিশাপ, যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে জবাই করে।'[১]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা নিজামুদ্দিন নিশাপুরি বলেন, 'ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে মুসলমান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু জবাই করবে, সে মুরতাদ। আর তার জবাইকৃত পশু মুরতাদের জবাইকৃত পশুর ন্যায় হারাম বলে গণ্য হবে।[২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল—মাজার, কিংবা পিরের নামে মানত করা শিরক। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যে পশু মানত করা হয়, তা ভক্ষণ করা হারাম। আর বিভিন্ন উরসের মধ্যে যে পশুগুলো জবাই করা হয়, সেগুলো মূলত মাজারের কিংবা পিরের নামে মানতকৃত পশু। তাই উরসের বা মাজারের সকল প্রকার শিরনি, বিরিয়ানি ইত্যাদি পরিহার করা একান্ত জরুরি।

* * *

---

১. *সহিহ মুসলিম:* ১৯৭৭
২. *তাফসিরু গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান:* ১/৪৭১

বিবাহ

শরয়ি মোহর এবং সামাজিক চিন্তাধারা

শরিয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে পরস্পরের ইজাব-কবুলের পাশাপাশি স্বামীর জিম্মায় একটি যৌক্তিক বিনিময় নির্ধারিত হয়, যাকে ফিকহের পরিভাষায় মোহর বলে। মোহর আদায় করা স্বামীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। বিয়েতে নারীর জন্য মোহরের অধিকার নির্ধারণ এবং তাতে নারীর পূর্ণ মালিকানা প্রদান ইসলামের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের সমাজে নানান ধরনের ভুলভ্রান্তি দেখা যায়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চিন্তাটি বেশ প্রচলিত সেটি হচ্ছে, স্ত্রীর মোহর আদায় করা কোনো জরুরি বিষয় নয়। ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক মতো চললে, তাদের মধ্যে বনিবনা থাকলে মোহরের হিসাব কেউ নিতে যাবে না, সেটি আদায়েরও প্রয়োজন পড়বে না। মোহর তখনই আদায় করতে হবে, বা আদায় করার প্রয়োজন পড়বে, যখন কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যায়। এ কারণেই দেখা যায় অনেক বিয়েতেই বড় অঙ্কের মোহর ধার্য করা হয়। কারণ উভয়পক্ষই মনে মনে ধরে নেয়—এগুলো তো আদায় করতে হবে না। এগুলো শুধু লোক দেখানোর জন্য। অথচ মোহর স্ত্রীর জন্য শরিয়ত-প্রদত্ত অধিকার। কুরআন-হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় তা আদায়ের তাকিদ এসেছে। এসব তাকিদ উপেক্ষা করে কেউ যদি মোহর আদায়ে টালবাহানা করে, কিংবা একেবারে আদায় না করারই নিয়ত করে, তা হলে হাদিসের ভাষায় সে ব্যভিচারী হিসেবে গণ্য। নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَاقًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَدَاءَهُ إِلَيْهَا فَغَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُوَ زَانٍ.

'মোহর আদায় না করার নিয়তে কেউ যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করে, আর আল্লাহ তায়ালা ভালো করেই জানেন—তার মোহর আদায়ের নিয়ত নেই, তা হলে

সে আল্লাহ তায়ালাকে ধোঁকা দেওয়ার স্পর্ধা দেখাল, এবং অন্যায়ভাবে নারীর লজ্জাস্থান ভোগ করল। কেয়ামতের দিন সে ব্যভিচারীরূপে উপস্থিতে হবে।'[1]

স্ত্রীর মোহর ফাঁকি দেওয়া অতি হীন একটি কাজ। কারণ এর অর্থ দাঁড়ায়—ভোগ করতে রাজি, কিন্তু বিনিময় দিতে রাজি নয়।

একজন নারী কতটুকু মোহরের হকদার?

শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নারীর আসল হক হচ্ছে 'মোহরে মিছল' তথা ওই নারীর বংশে তার মতো অন্যান্য নারীদের সাধারণত যে মোহর নির্ধারণ করা হয়েছে, সেটাই তার প্রাপ্য। যদি তার নিজের বংশে তার মতো আর কোনো নারী না থাকে, তাহলে অন্য বংশে তার সমপর্যায়ের নারীদের যে মোহর সাধারণত নির্ধারণ করা হয়, সেটিই তার মোহরে মিছল।

নারী মোহরে মিছলেরই হকদার, এ কারণেই মোহরের আলোচনা ছাড়া যদি বিয়ে হয়, তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'মোহরে মিছল' অবধারিত হয়ে যায়। তবে বর ও কনে উভয় পক্ষের সম্মতিতে মোহরে মিছল হতে কমবেশি করেও মোহর নির্ধারণ করা যায়। আর এক্ষেত্রেও এমন কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই, যার বেশি মোহর ধার্য করা যায় না।

তবে সর্বনিম্ন পরিমাণটি শরিয়তে নির্ধারিত। হানাফি মাজহাব মতে—তা হচ্ছে দশ দিরহাম। দশ দিরহামের অর্থ—প্রায় দুই তোলা, সাড়ে সাত মাশা রুপা। তবে মনে রাখতে হবে, সর্বনিম্ন পরিমাণ মোহর নির্ধারিত থাকার অর্থ এই নয়—এই সামান্য পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা শরিয়তে প্রশংসনীয়। বরং উদ্দেশ্য হল, এর চেয়ে কম মোহরে স্ত্রী সম্মত হলেও তা শরিয়তে অনুমোদিত নয়। কারণ এর দ্বারা মোহরের মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।

নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ কন্যা হযরত ফাতেমা রাযি. এর মোহর পাঁচশ দিরহাম নির্ধারণ করেছিলেন, যা প্রায় ১৩১ তোলা, তিন মাশা রুপার সমতুল্য। তেমনি তার স্ত্রীগণের অনেকের মোহর এর কাছাকাছি নির্ধারণ করেছিলেন, যা মধ্যম পর্যায়ের হওয়ার কারণে একটি গ্রহণযোগ্য ও উপযুক্ত পরিমাণ। কিন্তু এর অর্থ এই নয়—১৩১ তোলা রুপা তথা 'মোহরে ফাতিমি'ই শরয়ি মোহর বা এটিই সুন্নাহসম্মত মোহর; এর চেয়ে কমবেশি করা অপছন্দনীয় কিংবা সুন্নাহ-পরিপন্থি।

---

১. *মুসনাদে আহমদ: ৩১/২৬০*

এ প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. তার *যিকির ও ফিকির* গ্রন্থে (পৃ. ২৭৭-২৭৮) বলেন, "অনেকে মোহরে ফাতেমিকে শরয়ি মোহর বলে থাকেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয়—শরিয়তের দৃষ্টিতে এর চেয়ে বেশি পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা অপছন্দনীয়, তা হলে এই ধারণা সঠিক নয়। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উভয় পক্ষ যদি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মোহরে ফাতিমি নির্ধারণ করে এবং মনে করে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারণ করা পরিমাণটি বরকতপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ, বিধায় তা গ্রহণ করা ভালো এবং এর মাধ্যমে সুন্নতের সওয়াব লাভের প্রত্যাশা রয়েছে, তা হলে এই আবেগ-অনুভূতি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মোহর এই পরিমাণ হতে হবে, যা দ্বারা স্ত্রীকে সম্মানিত করা হয় এবং যা স্বামীর সামর্থ্যের চেয়ে বেশি না হয়। যেসব বুজুর্গ বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন, তাদের উদ্দেশ্যও এই—সামর্থ্যের চেয়ে অধিক মোহর নির্ধারণ করা হলে তা একটি কাগুজে লেনদেনে পরিণত হবে, বাস্তবে কখনও তা পরিশোধ করা হবে না। ফলে স্বামীর ঘাড়ে মোহর আদায় না করার গুনাহ থেকে যাবে।

দ্বিতীয়ত অনেক সময় বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণের পিছনে লোক দেখানো মানসিকতাও কার্যকর থাকে। অনেকে শুধু নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখানোর জন্যও অস্বাভাবিক বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণ করে থাকেন। বলাবাহুল্য, এই দুটো বিষয়ই ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এজন্যই অনেক বুজুর্গ অস্বাভাবিক বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণ করতে নিষেধ করেছেন।

তবে এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর রাযি. এর একটি ঘটনা স্মরণ রাখার মতো। তিনি তার খেলাফতকালে এক বার ভাষণ দিলেন—'কেউ যেন বিয়েশাদিতে বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণ না করে। তখন এক মহিলা আপত্তি তুলে বললেন, কুরআন মাজিদের এক জায়গায় তো এক কিনতার (সোনারুপার স্তূপ) মোহর দেওয়ার কথাও আছে, যা প্রমাণ করে—সোনারুপার স্তূপও মোহর হতে পারে। তা হলে বড় অঙ্কের মোহর নির্ধারণে বাধা দিচ্ছেন কেন?

হযরত ওমর রাযি. তার কথা শুনে বললেন, বাস্তবেই তার দলিল সঠিক। অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা ঠিক নয়। অর্থাৎ যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না থাকে এবং মোহর আদায় করার ইচ্ছা ও সামর্থ্যও থাকে, তবে অধিক পরিমাণ মোহর নির্ধারণ করা জায়েজ। আর যদি কোনো একটি

শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে সেক্ষেত্রে অত্যধিক মোহর নির্ধারণ করা জায়েজ নয়।"[১]

অত্যন্ত আফসোসের বিষয় হচ্ছে—সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক বিশেষ ব্যক্তিবর্গও এ বিষয়ে সচেতন নন। অনেকের কথাবার্তা ও কার্যক্রম থেকে প্রতীয়মান হয়—তারা মোহরে ফাতিমিকেই সুন্নাহসম্মত মোহর এবং মোহরে শরয়ি মনে করেন; এরচেয়ে কমবেশি করা তাদের দৃষ্টিতে শরিয়তসম্মত নয় বা শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি অপছন্দনীয়।

প্রসঙ্গত একটি ঘটনা বলছি। এক বিবাহের আলোচনার মজলিসে আমি উপস্থিত ছিলাম। বরকনে উভয় পক্ষই আলেম পরিবার। মেয়ের মোহরে মিছল কয়েক লক্ষ টাকা। ছেলেও সামর্থ্যবান। মেয়েপক্ষের দাবি—মোহর যেন মোহরে মিছল হয়, যা শরিয়তসম্মত এবং যুক্তিসংগতও। কিন্তু ছেলেপক্ষের জোর দাবি—মোহরে ফাতিমিই নির্ধারণ করতে হবে। ছেলের তাওফিক নেই বিষয়টি এমনও নয়। এর প্রমাণ হচ্ছে, তারা মেয়েকে কয়েক তোলা স্বর্ণ দেবে, তবে মোহর হতে হবে ফাতিমি। মোহরে ফাতিমি আদায় হয়ে অতিরিক্ত যা থাকবে, তা হবে মেয়ের জন্য দানস্বরূপ। অথচ ওইটুকু স্বর্ণ দিয়ে যদি মোহর নির্ধারণ করা হয়, তা হলে মেয়ের মোহরে মিছল হয়ে যায়। আর মোহরে মিছল ও স্বামীর সামর্থ্যের মধ্যে সমন্বয় করে মোহর নির্ধারণ করাই তো শরিয়তের বিধান। কিন্তু তারা এরূপ করবে। কারণ মোহরে ফাতিমিই শরয়ি মোহর। এর বিপরীত করা শরিয়তে অপছন্দনীয়। অর্থাৎ মুখে না বললেও কার্যত মোহরে ফাতিমিকে জরুরি মনে করা হচ্ছে।

এই ঘটনায় ছেলে পক্ষের অবস্থা ও শরঈ বাস্তবতা বুঝার জন্য এটুকু বলাই যথেষ্ট—হাবশার নাজাশি বাদশাহ যখন উম্মে হাবিবা রাযি. কে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন, এবং মোহর হিসেবে চার হাজার দিরহাম পরিশোধ করেছিলেন, তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বারণ করতেন, এবং জানিয়ে দিতেন যে, ১৩১ তোলা রুপার চেয়ে বেশি মোহর ধার্য করা ঠিক নয়। অথবা ১৩১ তোলা মূল মোহর হিসেবে ধরে বাকিটা দান হিসেবে রাখার পরামর্শও দিতে পারতেন। কিন্তু নবিজি তা করেননি।

তদ্রুপ হযরত উমর রাযি. ওই মহিলার আপত্তির জবাবে বলে দিতেন—'যদিও মোহর অনেক বেশি ধার্য করা বৈধ, তথাপি মোহরে ফাতিমিই সুন্নাহ, এর বিপরীত করা পছন্দনীয় নয়।' কিন্তু তিনি এমনটি করেননি। বোঝা গেল—মোহর

---

১. *যিকির ও ফিকির*, পৃ. ২৭৭-২৭৮

১৩১ তোলা বা মোহরে ফাতিমিই হতে হবে, এমনটি জরুরি কোনো বিষয় নয়। তাই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি পরিহার করাই কাম্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিষয়গুলো বোঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানো কি সুন্নত?

আমাদের সমাজে বিবাহের মজলিসসমূহে আকদ সম্পন্ন হওয়ার পর সাধারণত খেজুর ছিটানোর একটি রীতি আছে। সমাজে এটাকে বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবেই কি আকদের মজলিসে খেজুর ছিটানো সুন্নত?

আকদের মজলিসে খেজুর বা যে কোনো মিষ্টিজাতীয় বস্তু বিতরণের ক্ষেত্রে শরিয়তের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই। তাই আকদের অনুষ্ঠানে মিষ্টিজাতীয় যে কোনো বস্তু বিতরণ করার অবকাশ রয়েছে। বিখ্যাত তাবিয়ি হাসান বসরি এবং শাবি রহ. আকদের মজলিসে খেজুর বা মিষ্টান্নজাতীয় বস্তু ছিটানোর অনুমতি দিতেন।[১] আর ইমাম আবু হানিফা রহ. থেকে বর্ণিত— তিনি বলেছেন, বিবাহের অনুষ্ঠানে মিষ্টান্ন, আখরোট, বাদাম ছিটানোর ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা নেই।[২]

তবে মনে রাখতে হবে এটি সুন্নত নয়। বরং আকদের অনুষ্ঠান যদি মসজিদে হয়, তাহলে সেখানে খেজুর ছিটানো থেকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে হইচই ও কাড়াকাড়ির কারণে মসজিদের আদব ক্ষুণ্ণ হওয়া এবং মসজিদ ময়লাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বরং মসজিদের আদব ক্ষুণ্ণ হওয়া ও ময়লাযুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে ছিটানো ছাড়া স্বাভাবিকভাবেও মসজিদে মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা উচিত।

যেভাবে তৈরি হয়েছে এই ধারণা

মূলত কয়েকটি রেওয়ায়াতের কারণেই এমন ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেগুলো নিতান্তই দুর্বল বা ভিত্তিহীন। রেওয়ায়াতগুলো সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাসহ তুলে ধরা হল।

---

১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ১১/৯৯
২. *মাবসুতে সারাখসি:* ৩০/১৬৭

এক. হযরত আয়িশা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো এক স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তখন তার সামনে খেজুর ছিটানো হয়।'[১]

পর্যালোচনা: এই রেওয়ায়াতের একজন বর্ণনাকারী হলেন, হাসান ইবনে আমর ইবনে সাইফ আল-আবাদি। তিনি নিতান্ত দুর্বল ও পরিত্যাজ্য একজন বর্ণনাকারী। বিরল বিরল হাদিস বর্ণনা করা তার অভ্যাস ছিল। যেমনটা আবু আহমদ ইবনে আদি ও ইবনে হিব্বান রহ. বলেছেন। এমনকি ইমাম বুখারি এবং আলি ইবনে মাদিনি রহ. তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন।[২]

আর *তারিখে বাগদাদের* রেওয়ায়াতে সাঈদ ইবনে সাল্লাম নামক আরেকজন বর্ণনাকারী আছেন। ইমাম আহমদ, ইবনে নুমাইরসহ অনেকেই তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। এ কারণেই শাওকানি রহ. তার এই হাদিসকে বাতিল সাব্যস্ত করে বলেন, সাঈদ ইবনে সাল্লাম মিথ্যাবাদী।[৩]

দুই. হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিবাহ দিতেন কিংবা বিবাহ করতেন, তখন খেজুর ছিটাতেন।[৪]

পর্যালোচনা: এই রেওয়ায়াতে একজন বর্ণনাকারী হলেন আসিম ইবনে সুলাইমান আল-বাসরি। সে হাদিস জাল করত। ইবনে আদি এবং ফাল্লাস রহ. এমনটিই বলেছেন। দারা কুতনি রহ. বলেন, সে একজন মিথ্যাবাদী।[৫]

তিন. মুআয ইবনে জাবাল রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারি সাহাবির বিবাহে উপস্থিত হয়ে খুতবা পাঠ করলেন, অতঃপর বিবাহ দিলেন... এরপর ফল ও মিষ্টান্নের থালা নিয়ে আসা হলে তিনি বললেন, তোমরা তা লুণ্ঠন করে নাও। সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহর রাসুল! আপনি আমাদের লুণ্ঠন করা থেকে কি বারণ করেননি? তিনি বললেন, আরে আমি তো সৈন্যদের লুণ্ঠন (গনিমত লুণ্ঠন) থেকে বারণ করেছি। বিবাহে লুণ্ঠন থেকে বারণ করিনি। এরপর রাসুলও টানাটানি করে নিলেন; সাহাবিগণও তার থেকে টানাটানি করে নিলেন।[৬]

---

১. *আস-সুনানুল কুবরা:* ৭/২৮৭; *তারিখে বাগদাদ:* ১২/৩৭
২. *তাহযিবুত তাহযিব, ইবনে হাজার:* ১/৪১০
৩. *লিসানুল মিযান:* ৪/৫৫; *আল-ফাওয়াইদুল মাজমুআ:* ১/৯১
৪. *আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি:* ৭/২৮৭
৫. *লিসানুল মিযান:* ৪/৩৬৮
৬. *শরহু মাআনিল আছার:* ৩/৫০; *আস-সুনানুল কুবরা:* ৭/২৮৭

পর্যালোচনা: হাদিসটি ইবনে জাওযি রহ. তার জাল হাদিসের গ্রন্থে (৩/৫৮) উল্লেখ করেছেন। আর বাইহাকি রহ. হাদিসটি বর্ণনা করে বলেন, এই সনদে অনেক মাজহুল (অপরিচিত) বর্ণনাকারী রয়েছে, এবং রয়েছে অনেক ইনকিতাও (বিচ্ছিন্নতা)। এরপর বলেন, এ প্রসঙ্গে (বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানো) একটি হাদিসও প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ সকল রেওয়ায়াত দ্বারা বিবাহের মজলিসে খেজুর ছিটানো সুন্নত প্রমাণিত হবে না।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. বলেন, 'সুন্নত মনে করে এই কাজটি করা ঠিক নয়। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খেজুর ছিটানোর বিষয়টি প্রমাণিত নয়।'[১]

আর থানভি রহ. বর্তমান জমানায় ছিটানোর পরিবর্তে হাতে হাতে দেওয়াই উত্তম বলেছেন। বিশেষ করে যখন বিবাহের আকদ মসজিদে হবে, তখন হাতে দেওয়াই উচিত। কেননা ছিটিয়ে দেওয়ার কারণে মসজিদে হৈ-হুল্লোড় ও শোরগোল হয়, যা মসজিদের আদবের পরিপন্থি।[২]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের বোঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

স্ত্রীর সাথে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার সুযোগ কি ইসলামে আছে?

এ কথা সচরাচর সকলেরই জানা— তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত যে কোনো স্থানে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা মহাঅপরাধ। *সুনানে তিরমিজি* গ্রন্থে হযরত আসমা রাযি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। ক্ষেত্র তিনটি হচ্ছে—

ক. স্ত্রীকে খুশি করার উদ্দেশ্যে তার সাথে স্বামীর মিথ্যা বলা।

খ. যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা।

গ. লোকদের পরস্পরের ঝগড়া নিরসন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা।[৩]

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য ভালো কথা পৌঁছে দেয়, কিংবা ভালো কথা বলে।[১]

---

১. *বিবাহ ও তালাক*, পৃ. ১১৯

২. *ইসলাহুর রুসুম*, পৃ. ৯০

৩. *সুনানে তিরমিজি:* ১৯৩৯ (সনদ হাসান)

উল্লিখিত হাদিস দুটি এবং এ সংক্রান্ত আরও কিছু হাদিস থেকে বাহ্যত তিনটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার বৈধতাই প্রমাণিত হয়। এ কারণেই আমরা অনেকেই মনে করি—এই তিনটি ক্ষেত্রে শরিয়তে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আলেমদের কিছু গবেষণাও আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।

অধিকাংশ হানাফি আলেম, বিশেষত হানাফি মাজহাবের পূর্ববর্তী সময়ের আলেমগণ এবং অন্যান্য মাজহাবের এক জামাত আলেমের মতে—এসব হাদিস থেকে উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার বৈধতা প্রমাণিত হয় না; বরং এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে—তাওরিয়া বা তারিয। পরিভাষায় তাওরিয়া ও তারিয বলা হয়—কোনো শব্দে যদি দুটি অর্থের সম্ভাবনা থাকে, যার একটি নিকটবর্তী তথা শব্দটি বললেই এই অর্থ সাধারণত চিন্তায় আসে, আর অপরটি দূরবর্তী তথা শব্দ উচ্চারণ করলে এই অর্থ সাধারণত চিন্তায় আসে না; এমতাবস্থায় নিকটবর্তী অর্থ গ্রহণ না করে দূরবর্তী অর্থ গ্রহণ করাই হচ্ছে তাওরিয়া। বিষয়টি ভিন্নভাবেও বলা যায়। যেমন বক্তা এমন কোনো কথা বলা, যা থেকে শ্রোতা একটি অর্থ বুঝে নেয়, অথচ বক্তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিন্ন অর্থ।

হানাফি আলেমদের মতে—এসব হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওরিয়া বা তারিয, যা সুস্পষ্ট মিথ্যা নয়। শামসুল আইম্মা সারাখসি রহ. 'আল-হারবু খুদআহ' হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, 'কোনো কোনো আলেম এই হাদিসের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তারা বলেন, এই অবস্থায় (যুদ্ধক্ষেত্রে) মিথ্যা বলার অনুমতি প্রদান করা যাবে। তারা ওই হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করেন, যে হাদিসে এসেছে—তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত মিথ্যা বলা বৈধ নয়...। তবে আমাদের মাজহাব অনুযায়ী—এর দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা নয়। কেননা শরিয়তে এর কোনো অনুমতি নেই। বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তারিয। দৃষ্টান্ত হচ্ছে—ইবরাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তিনটি মিথ্যা বলেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি তারিযের সাথে কথা বলেছেন। কেননা, নবিগণ সম্পূর্ণই নিষ্পাপ। তারা মিথ্যা বলেন না।'

*সহিহ বুখারি*তে কাব ইবনে আশরাফকে হত্যা করা সংক্রান্ত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা দিয়ে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ হওয়ার স্বপক্ষে দলিল দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে—এই হাদিসকেও তাওরিয়া ও তারিযের অর্থে

---

১. *সহিহ বুখারি:* ২৬৯২

প্রয়োগ করাই অধিক উপযোগী। জাফর আহমদ উসমানি রহ. *এলাউস সুনান* গ্রন্থে (১২/৬০) বলেন, হাদিসের বচনভঙ্গি থেকে সুস্পষ্ট—মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তারিযের অনুমতি চেয়েছিলেন; সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার নয়। এ কারণেই তিনি কাবকে হত্যার উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছেন, আমাকে কিছু বলার অনুমতি দিন। এ কথা বলেননি, আমাকে মিথ্যা বলার অনুমতি দিন।

সুতরাং যিনি সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা বলার অনুমতি গ্রহণ করতেই সম্মত নন, তিনি কখনও সুস্পষ্ট মিথ্যা বলতে পারেন না। আর বাস্তবতা হচ্ছে, কাব ইবনে আশরাফের হত্যা সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামার পক্ষ থেকে যা-কিছুই বলা হয়েছে সবই ছিল তারিয; কোনোটিই সুস্পষ্ট মিথ্যা ছিল না।

হানাফি আলেমদের মতে—মুযতার বা অপারগ হওয়া ছাড়া কোনো ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে *আদ-দুররুল মুখতার* গ্রন্থে[১] এসেছে, হক প্রতিষ্ঠা ও নিজ থেকে জুলুম প্রতিহত করার জন্য মিথ্যা বলা বৈধ। কিন্তু এই মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য তারিয। কেননা সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা হারাম।

ইবনে আবিদিন রহ. এ কথা উল্লেখ করে বলেন, ত্বহাবি রহ. এবং আরও অনেকে বলেছেন, মিথ্যা বৈধ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তারিয। কারণ হুবহু মিথ্যা বলা হারাম। এরপর তিনি বলেন, এটিই হক। অতঃপর তিনি বিষয়টির সমর্থনে হযরত আলি রাযি. এবং ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন যে, তারিযের মধ্যে মিথ্যা থেকে নিষ্কৃতি রয়েছে।

তিনি বলেন, যেমন কাউকে কোনো খাবারের দিকে আহ্বান করা হলে সে বলল, আমি খেয়েছি। উদ্দেশ্য হল, আমি গতকাল খেয়েছি। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনায় এই অর্থই উদ্দেশ্য।[২] এ হিসেবে হাদিসে বিশেষভাবে তিন সুরতে

---

১. *রদ্দুল মুহতার:* ৫/২৫৭

২. ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন, যেগুলো বাহ্যত মিথ্যা হলেও বাস্তবে সেগুলো ছিল তারিয। তিনি বলেছিলেন, আমি অসুস্থ অথচ বাস্তবে তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ ছিলেন। এক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য ছিল, আমি মনের দিক দিয়ে অসুস্থ। তেমনিভাবে তিনি বাদশাহর জুলুম থেকে বাঁচার জন্য তার স্ত্রী সারাহ আলাইহাস সালামকে বোন বলেছিলেন। আর বাহ্যত যদিও তিনি তার স্ত্রী, কিন্তু প্রতিটি মুমিন নরনারী একে অপরের ভাইবোন। এ হিসেবে বাস্তবে এটি সুস্পষ্ট মিথ্যা ছিল না। তেমনিভাবে তিনি কাফেরদের মূর্তিসমূহকে নিজ হাতে ভেঙে বলেছিলেন, এটি তোমাদের সবচেয়ে বড় মূর্তির কাজ। অর্থাৎ যেহেতু তোমরা বড় মূর্তিকে সবচেয়ে বড় ইলাহ মনে কর, সুতরাং তোমাদের চিন্তা অনুযায়ী বড় ইলাহ হওয়ার দাবি হচ্ছে—অন্য কোনো মূর্তি বা ইলাহের ইবাদত করা হবে না, আর এর দাবি হচ্ছে অন্য সকল মূর্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়া। তার কথার অর্থ এই নয়—বাস্তবে বড় মূর্তিটিই অন্যগুলোকে ভেঙেছে। (*তাফসিরে আলুসি:* ১২/৪১৯)

মিথ্যা বলা বৈধ বলার কারণ হচ্ছে—বাহ্যিকভাবে যেহেতু তারিযও মিথ্যার মতোই, তাই বলা হয়েছে, এই তিন সুরতে মিথ্যা বলা বৈধ। উদ্দেশ্য—এই তিন সুরতে তারিয বৈধ। উল্লেখ্য, যেহেতু প্রয়োজনের কারণেই তারিযকে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে তারিযও বৈধ হবে না। কারণ তারিয থেকে মিথ্যার ধারণা হয়। যদিও শব্দটি মিথ্যা নয়।[১]

মোটকথা, পূর্বেকার হানাফি ফকিহদের কারও থেকেই সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার বৈধতা পাওয়া যায় না। অবশ্য কেউ যদি মুযতার তথা অপারগ হয় এবং মিথ্যা না বলে তার প্রাণ বাঁচানোর কোনো উপায় না থাকে, তখন সর্বসম্মত মতানুসারে মিথ্যা বলা বৈধ।

তবে জাফর আহমদ উসমানি রহ. থানভি রহ. থেকে উদ্ধৃত করেছেন, তিনি বলেছেন, বাস্তবতা হচ্ছে—হাদিসে উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে যদি তারিযের দ্বারা মাকসাদ অর্জিত না হয়, তাহলে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলারও অবকাশ রয়েছে। আর যদি তারিযের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা অবৈধ। আর 'আস-সিয়ারুল কাবির'-এ নিরেট মিথ্যা বলার কোনো অনুমতি নেই মর্মে যে কথাটি বর্ণিত হয়েছে, এটি সতর্কতাবশত বলা হয়েছে। থানভি রহ. এর উপরোক্ত বক্তব্যটি কোনো কোনো বর্ণনা থেকেও সমর্থিত হয়। যেমন ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, 'তারিযের মধ্যে মিথ্যার বিকল্প রয়েছে।'[২]

তা ছাড়া এই মর্মে আরও অনেক সাহাবি থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এসব রেওয়ায়াত থেকে বোঝা যায়—যদি তারিযের মাধ্যমে মিথ্যার বিকল্প থাকে এবং তারিযের মাধ্যমে মিথ্যা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, তাহলেই কেবল সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা তখনই হারাম হবে। এ থেকে বাহ্যত এটিই বুঝে আসে—যদি সুস্পষ্ট মিথ্যার বিকল্প না থাকে, তাহলে শরয়ি প্রয়োজনে মিথ্যা বলা হারাম নয়। আর শরয়ি প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি ক্ষেত্র, যা ইতিপূর্বে আসমা রাযি. এর হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। এ ছাড়া যদি কেউ মুযতার বা অপারগ হয়ে যায়, তার জন্যও সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ।

---

১. *রদ্দুল মুহতার:* ৫/২৫৭

২. *তাবারানি কাবির*, আমালুল ইয়াউম, ইবনে সুন্নি, ৩২৭; *আস সুনানুল কুবরা*, বাইহাকি: ১০/১৯৯ ইরাকি রাহি. হাদিসকে হাসান বলেছেন। *আল-মাকাসিদুল হাসানা:* ১/১৯৫

মুযতার বা অপারগ হলে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ হওয়ার দলিল *সুনানে নাসায়ি* ও *মুসতাদরাকে হাকিমে* বর্ণিত হাজ্জাজ ইবনে আল্লাতের ঘটনা। তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মক্কাবাসীর কাছ থেকে নিজ সম্পদ রক্ষার প্রয়োজনে কিছু বলার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মক্কাবাসীর কাছে সংবাদ পাঠালেন—খাইবারবাসী মুসলমানদের পরাজিত করেছে, যা ছিল সুস্পষ্ট মিথ্যা।[১]

তার কথায় তারিযের কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তিনি মুযতার ও অপারগ ছিলেন। মিথ্যা বলা ছাড়া নিজের সম্পদ বাঁচানোর আর কোনো উপায় ছিল না, তাই তার জন্য এটি বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

সারকথা: শরিয়তের পরিভাষায় যাকে মুযতার তথা অপারগ বলা হয়, এমন ব্যক্তির জন্য সর্বসম্মতভাবে প্রয়োজনে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ। এ ছাড়া কারও জন্যই সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার কোনো সুযোগ নেই। তেমনিভাবে প্রয়োজন ছাড়া তাওরিয়া বা তারিযেরও কোনো সুযোগ শরিয়তে নেই। তবে তিনটি ক্ষেত্রে তারিয বা তাওরিয়ার সুযোগ রয়েছে। যদি তারিযের মাধ্যমে উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব না হয়, তখন এই তিনটি ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট মিথ্যা বলার সুযোগ রয়েছে। ঢালাওভাবে তাওরিয়া করা কিংবা তিনটি ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে সুস্পষ্ট মিথ্যা বলা বৈধ হওয়ার যে ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তা সঠিক নয়।

* * *

১. এই রেওয়ায়াতটি হাফেজ ইবনে হাজার রাহি. *ফাতহুল বারিতে* (১০/৫৯৪) উল্লেখ করেছেন।

জানাজা ও দাফন

মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা

সাধারণ মানুষের মধ্যে নিকটাত্মীয় কেউ মারা গেলে লোকেরা উচ্চ আওয়াজে বিলাপ করে কান্নাকাটি করার একটি রেওয়াজ আছে। অথচ হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

'মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকের কান্নাকাটির কারণে তার শাস্তি হয়।'[১]

* * *

দাফনে দেরি করা

কারও মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাফন করা জরুরি। এটাই হাদিসের নির্দেশনা। কিন্তু সমাজে এক্ষেত্রে খুবই গাফলতি দেখা যায়। এমনকি সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে জানাজার জন্য যখন লাশ মাঠে আনা হয়, সেখানেও বিভিন্নভাবে জানাযা করতে দেরি করা হয়। মৃত ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত হলে, বড় কোনো পদবীধারী হলে, বিত্তবান ও প্রভাবশালী হলে জানাজার পূর্বে তাকে নিয়ে আলোচনার অজুহাতে জানাযা আদায়ে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অনেক বেশি দেরি করা হয়।

অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি জানাজা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন,

أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

---

১. *সহিহ বুখারি:* ১২৮৮; *সহিহ মুসলিম:*৯৩১

'তোমরা জানাজা নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। কেননা, সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে যার দিকে তোমরা তাকে এগিয়ে দিচ্ছ সেটিই উত্তম, আর যদি সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ।'[১]

* * *

জানাজার পূর্বে মৃতব্যক্তির ওলি কিছু বলা কি জরুরি?

জানাজার পূর্বে মৃত ব্যক্তির ওলি কিছু কথা বলতে হবে—এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু এটাকে সমাজে খুবই জরুরি মনে করা হয়। এমনকি কোনো কোনো স্থানে ইমাম সাহেবকে এই বলে ডাকতে শোনা যায়—মাইয়েতের ওলি কে? কিছু বলবেন? এতে কারও কিছু বলার ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়ে বলতে হয়। অথচ জানাজার পূর্বে ওলি কিছু বলতে হবে—শরিয়তে এমন কোনো বিধান নেই।

* * *

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া এবং আমাদের ভ্রান্তি

জানাজার পূর্বে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা চাওয়া হয়। তার ওলি তথা অভিভাবক অথবা নিকটাত্মীয় কেউ ক্ষমা চেয়ে থাকেন। কোনো লেনদেন থাকলে যোগাযোগ করার কথা বলেন। মনে রাখতে হবে— এই ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। বরং মৃত ব্যক্তির জীবদ্দশায় যাদের সাথে তার সম্পর্ক, লেনদেন, উঠাবসা ছিল, তাদের প্রত্যেকের কাছে আলাদাভাবে গিয়ে লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা কর্তব্য।

* * *

মৃত ব্যক্তির জন্য মিলাদ ও খাবারের আয়োজন এবং আমাদের ভ্রান্তি

সমাজে মৃত ব্যক্তির জন্য মিলাদ মাহফিলের আয়োজনের প্রচলনও রয়েছে। প্রথমত এটিকে মিলাদ মাহফিল বলাই শুদ্ধ নয়। এ সম্পর্কে আমরা 'মিলাদ মাহফিল : একটি শাব্দিক ভুল' শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করব। এখানকার

---

১. *সহিহ বুখারি:* ১৩১৫; *সহিহ মুসলিম:* ৯৪৫

আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে, দিন তারিখ ঠিক করে সুরায়ে ফাতেহা, ইখলাস ইত্যাদি পাঠের আয়োজন শরিয়তের কতটুকু চাহিদাসম্মত? এসব প্রচলন কি রাসুল, সাহাবি এবং তাবেঈদের যুগে ছিল?

সচরাচর এসব অনুষ্ঠান মৃত্যুর তিনদিন বা নির্দিষ্ট কয়েকদিন পর করা হয়। কিন্তু লোকটি মারা গেল আজ, আর তার মাগফিরাত তথা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া হবে দুদিন, তিনদিন অথবা চারদিন পরে! মৃত ব্যক্তি গোনাহগার হয়ে থাকলে এই দুদিন, তিনদিন, চারদিনের শাস্তির কী হবে! আল্লাহ ক্ষমা না করলে তো আজই তার শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং তার ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া করলে আজই তো সেই আয়োজন হওয়া দরকার! অমুক তারিখ পর্যন্ত তার কোনো শাস্তি হবে না—এ মর্মে কোনো বার্তা তো আল্লাহর কাছ থেকে কেউ পায়নি!

কারও নিকটাত্মীয় মারা গেলে উচিত হল, যত বেশি সম্ভব নিজে নিজে দোয়া করা। অন্যের কাছে দোয়া চাইতে নিষেধ নেই, তবে নিজের দোয়াকেই বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কিন্তু দোয়ার জন্য দিন-তারিখ নির্ধারণ করে মাহফিলের আয়োজন করা সম্পূর্ণ অনর্থক। এতে গর্হিত কয়েকটি বিষয় রয়েছে। এ ধরনের মাহফিলে মূলত যে খাবারের আয়োজন করা হয়, সেই খাবারই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। অথচ মৃত ব্যক্তির জন্য খাওয়াদাওয়া ও দাওয়াতের আয়োজন করা ইসলামি শরিয়তে অবৈধ।[১] মৃত ব্যক্তির ইসালে সাওয়াবের নামে তিন দিন পর বা সাত দিন পর অথবা চল্লিশ দিন পর যে খাবারের আয়োজন করা হয়, এটি মূলত হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে।

তা ছাড়া সাধারণত মানুষের সমালোচনা থেকে বাঁচার জন্যই এই আয়োজন করা হয়ে থাকে। যদি কাউকে বলা হয়—ভাই, এই খাবারের আয়োজন না করে এখানে যা খরচ করবেন, ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তা গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেন, তা হলে মৃত ব্যক্তির বেশি উপকার হবে। এমন প্রস্তাবে সে রাজি হবে না। বরং অনেকেই এ ধরনের প্রস্তাবের উত্তরে বলে—ভাই লোকে বলবে, লোকটি এত সম্পদ রেখে গেল, কিন্তু তার সন্তানরা মৃত্যুর পর খাবারের কোনো আয়োজন করল না! অনেকে মুখে না বললেও ইঙ্গিতে এ কথাই বোঝাতে চান। সুতরাং এটা পরিষ্কার—এখানে ইখলাস ও সাওয়াব মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাই এগুলো থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

---

১. ফতোয়ায়ে শামি: ২/২৬২

জোরপূর্বক সাক্ষ্য আদায়!

বিভিন্ন জায়গায় জানাজার পূর্বে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত কেউ দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেন—তিনি কেমন ছিলেন? উপস্থিত সবাই বলে, ভালো, ভালো। পরিচিত-অপরিচিত প্রায় সবাই এ কথা বলে থাকে। এটা সম্পূর্ণ অনর্থক কাজ। কারণ মুমিনের ভালো সাক্ষ্যের কারণে যে মাগফিরাতের কথা হাদিসে এসেছে, তা এ ধরনের সাক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়নি। বরং ওই সাক্ষ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে লোক মারা যাওয়ার পর শোনামাত্রই তার পরিচিতদের মুখে তার ব্যাপারে ভালো সাক্ষ্য বেরিয়ে আসে। এ ধরনের সাক্ষ্য আসে কলব ও অন্তর থেকে। আর জানাজার পূর্বে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেটা একধরনের জোরপূর্বক সাক্ষ্য আদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

* * *

জুতা পায়ে জানাজা পড়া এবং কিছু অস্পষ্টতা নিরসন

কোথাও কোথাও জুতা পায়ে দিয়ে জানাজা পড়া নিয়ে ঝগড়াও হয়। এ ব্যাপারে সারকথা হল, জুতায় নাপাক না থাকলে জানাজার নামাজের সময় জুতা পায়ে রাখতে অথবা জুতার উপর দাঁড়াতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে জুতা পরা থাকলে দাঁড়ানোর স্থানও পবিত্র হওয়া জরুরি। আর জুতার নিচের অংশে নাপাক থাকলে পা থেকে খুলে জুতার উপর দাঁড়াবে। এক্ষেত্রে জুতা পরে জানাজার নামাজ পড়া যাবে না।[১]

* * *

একাধিকবার জানাজা পড়া

জানাজার ক্ষেত্রে আমাদের আরেকটি বড় ভ্রান্তি হল একই লাশের একাধিক জানাযা পড়া। মৃত ব্যক্তি বড় কোনো রাজনীতিবিদ হলে তো কথাই নেই। অথচ জানাজার নামাজ কেবলমাত্র এক বার পড়াই বিধান। এক মৃতের একাধিক জানাজা নামাজ সুন্নাহসম্মত নয়। মৃতের ওলি জানাজা পড়ে নিলে বা তার সম্মতিতে জানাজা পড়া হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার জানাজা পড়া বেদআত ও মাকরুহ।

---

১. *আল-বাহরুর রায়েক: ২১৭৯; ফতোয়ায়ে রহিমিয়া: ৭/২৫*

নাফে রহ. বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. কোনো জানাজায় পৌঁছতে পৌঁছতে জানাজার নামাজ শেষ হয়ে গেলে, মৃতের জন্য দোয়া করে ফিরে আসতেন। দ্বিতীয়বার জানাজা পড়তেন না।'[১]

তেমনিভাবে বিখ্যাত তাবেয়ি ইবরাহিম নাখায়ি রহ. এক মাইয়েতের একাধিক জানাজা পড়তে নিষেধ করেছেন।[২]

আর হাসান বসরি রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি মৃতের জানাজা নামাজ না পেলে মৃতের জন্য ইস্তেগফার করতেন। অতঃপর বসতেন অথবা ফিরে যেতেন।[৩]

সালেহ ইবনে নাবহান রহ. বলেন, 'সাহাবাগণ জানাজা নামাজের জায়গা সংকীর্ণ হলে (মসজিদে) নামাজ না পড়ে ফিরে যেতেন।'[৪]

এসব বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, সাহাবা-তাবেয়িনের যুগে দ্বিতীয়, তৃতীয় জানাজার প্রচলন ছিল না। একাধিক জানাজা যদি জায়েজ হত, তবে তারা ফিরে যেতেন না।

* * *

গায়েবানা জানাজা

কোথাও কোথাও গায়েবি জানাজারও প্রচলন রয়েছে। অথচ ইসলামে এর অনুমোদন নেই। জানাজার নামাজ আদায়ের জন্য মৃতের লাশ সামনে উপস্থিত থাকা জরুরি। অনুপস্থিত লাশের গায়েবানা জানাজা সহিহ নয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার অসংখ্য সাহাবি মদিনার বাইরে শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু রাসুল থেকে তাদের গায়েবানা জানাজা পড়ার প্রমাণ নেই। অথচ তিনি নিজ সাহাবাদের জানাজার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন; ঘোষণাও দিয়েছিলেন—তোমাদের যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে জানাবে। কারণ আমার জানাজা পড়া তার জন্য রহমত।[৫]

আর শুধু নাজাশির জানাজা পড়াটা ব্যাপকভাবে গায়েবানা জানাজা জায়েজ হওয়াকে প্রমাণ করে না। এ ছাড়া *মুসনাদে আহমদ* ও *সহিহ ইবনে হিব্বানে*

---

১. *মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক*: ৬৫৪৫
২. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*: ১২০৭০
৩. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*: ১২০৭১
৪. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*: ১২০৯৭
৫. *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ৩০৮৩

নাজাশির জানাজা সম্পর্কিত একটি হাদিস দ্বারা বোঝা যায়—নাজাশির লাশ কুদরতিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই উপস্থিত ছিল।

ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই নাজাশি ইন্তেকাল করেছেন। তোমরা তার জানাজা আদায় করো। ইমরান রাযি. বলেন, অতঃপর রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আর আমরা তার পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালাম। তিনি তার জানাজা পড়ালেন। আমাদের মনে হচ্ছিল—নাজাশির লাশ তার সামনেই রাখা ছিল।[১]

এ ছাড়া অনেক মুহাদ্দিস নাজাশির জানাজাসংক্রান্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ ঘটনাটি বিশেষ এক প্রয়োজনের কারণে সংঘটিত হয়েছিল। তা হল, নাজাশির মৃত্যু হয়েছিল এমন এক ভূখণ্ডে, যেখানে তার জানাজা পড়ার মতো কোনো (মুসলিম) ব্যক্তি ছিল না। তাই আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ নিয়মের বাইরে তার জানাজা পড়িয়েছেন।

আল্লামা যাইলায়ি, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, আল্লামা ইবনে কাইয়িম ও আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী রহ. এ মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।[২]

ওলামায়ে কেরাম এ ঘটনার আরও অনেক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সার কথা হল, এটা ছিল নববি জীবনের স্বাভাবিক রীতিবহির্ভূত একটি ঘটনা। এর উপর ভিত্তি করে ব্যাপকভাবে প্রচলিত গায়েবানা জানাজাকে বৈধ বলার সুযোগ নেই। কেননা অনুসৃত সুন্নাহর সাথে এটির কোনো মিল নেই। এ ছাড়া যে লাশের কোথাও জানাজার ব্যবস্থা আছে এবং তার জানাজা হয়েছে বা হচ্ছে, তার গায়েবানা জানাজা পড়ার একটি ঘটনাও হাদিসের কিতাবে পাওয়া যায় না। তাই এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।[৩]

আল্লাহ তায়ালা বিষয়গুলো বুঝে এ ধরনের সকল গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

১. *মুসনাদে আহমদ: ২০০০৫; সহিহ ইবনে হিব্বান: ৩০৯৮*

২. *নাসবুর রায়া: ২/২৮৩; যাদুল মাআদ: ১/৫০২; ফয়যুল বারি: ২/৪৭০*

৩. গায়েবানা জানাজাসংক্রান্ত লেখার প্রায় পুরোটাই মাসিক আল-কাউসার থেকে গৃহীত।

দোয়া ও খতম

দোয়া-দরুদের ওযিফা : কিছু কথা

আমাদের পূর্বসূরিদের কেউ কেউ দোয়া ও দরুদের বিভিন্ন ওযিফা তৈরি করেছেন। প্রতিদিন এগুলো থেকে কিছু কিছু পাঠ করে আমরা অনেক ফজিলত অর্জন করতে পারি। তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা ভুলভ্রান্তি রয়েছে। যেমন এই ওযিফাগুলো তৈরির অর্থ এই নয়—প্রতিদিনের জন্য যে দরুদ নির্ধারণ করা হয়েছে, সেই দোয়া বা দরুদ ছাড়া অন্য কোনো দরুদ পড়া যাবে না। বা ওই দিন উক্ত নির্ধারিত দোয়া-দরুদ পাঠের বিশেষ সাওয়াব রয়েছে। বরং এই ওযিফা নির্ধারণ করা হয়েছে পড়ার সুবিধার্থে। তাই যে কোনো দিন যে কোনো দোয়া বা দরুদ পড়তে যেমন কোনো অসুবিধা নেই, তেমনি একই দিনে সকল দোয়া বা সকল দরুদ পড়তেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমাদের কেউ কেউ নির্ধারিত দিনের জন্য নির্ধারিত দরুদ পড়া জরুরি মনে করেন এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোনো দোয়া বা দরুদ পড়ার আগ্রহ বোধ করেন না।

তা ছাড়া দোয়া ও দরুদ পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে মনোযোগ সহকারে পাঠ করা উচিত। কিন্তু সাধারণত দেখা যায়—এ সকল ওযিফা পাঠের সময় দেখে দেখে পড়া তো হয়ে গেল এবং প্রতিদিনের রুটিনও পূর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু দরুদের প্রতি কোনো মনোযোগ নেই। অথচ আমরা চাইলেই মর্মের প্রতি খেয়াল করে; মনোযোগ সহকারে দোয়া ও দরুদ পাঠ করতে পারি। কিন্তু সেদিকে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। এভাবে গাফেল হয়ে দরুদ পড়লে, দরুদ পাঠের পূর্ণ সাওয়াব কি পাওয়া যাবে? আর আমাদের দোয়া কবুল হবে?

মাও. আবদুল মালেক (দামাত বারাকাতুহুম) থানভি রহ. এর *মুনাজাতে মাকবুল* সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন, যা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এখানে তুলে ধরলাম। তিনি বলেন—

মুনাজাতে মাকবুল কিতাবের অধিকাংশ দোয়া হচ্ছে ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া, যা বিশেষ সময় বা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত নয়। এই দোয়াগুলো মিনতি ও

মনোযোগের সঙ্গে যে কোনো সময় পাঠ করা যায়। সহজতার উদ্দেশ্যে 'আল-হিযবুল আযম' এর মতো এই দোয়াগুলোকেও সাত মনযিলে ভাগ করা হয়েছে, যেন প্রতিদিন এক মনযিল করে পাঠ করা যায় এবং কিতাব ও সুন্নাহয় শেখানো অধিকাংশ জামে দোয়া (ব্যাপক অর্থবোধক ও সারগর্ভ দোয়া) প্রার্থনায় এসে যায়। সাত মনযিলে বিভক্ত করার বিষয়টি মাসআলাগতভাবে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি পাঠ সহজ হওয়ার জন্য একটি বিন্যাসমাত্র। যে মনযিলে যে বারের নাম দেওয়া আছে, সেদিনই তা পড়তে হবে, তা-ও অপরিহার্য নয়। তদ্রূপ এটাও জরুরি নয়—একদিনে এক মনযিল পরিমাণই পড়তে হবে। সাত মনযিলে ভাগ করা এবং সপ্তাহের এক এক দিন এক এক মনযিল পাঠ করার কথা উল্লেখিত হওয়া এজন্য নয় যে, হাদিস শরিফে এই দোয়াগুলো এভাবে পাঠ করতে বলা হয়েছে। অতএব, এই ধারণা করা ঠিক নয়—এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার দ্বারা শরিয়তের কোনো হুকুম লঙ্ঘন হবে, বা এই দোয়াগুলির বরকত ও ফজিলত হ্রাস পাবে। তবে একে নিছক একটি বিন্যাস মনে করে নিজের সুবিধার জন্য তা অনুসরণ করলে দোষের কিছু নেই। এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেওয়ার প্রয়োজন এজন্য হয়েছে—কারও কারও প্রশ্ন থেকে অনুমিত হয়, তারা এই বিন্যাসের অনুসরণকেও সম্ভবত একটি শরয়ি হুকুম মনে করেন, এবং মাসআলার দিক থেকেও এর অন্যথা অনুচিত বলে মনে করেন। অথচ প্রকৃত বিষয় তা-ই, যা উপরে লেখা হয়েছে।[১]

* * *

আমাদের দোয়া কেন কবুল হয় না?

অনেক ক্ষেত্রেই আমরা বাহ্যত দেখি—আমাদের দোয়া কবুল হচ্ছে না। অথবা যে বিষয়ে দোয়া করি, হুবহু ওই বিষয়টি পাচ্ছি না। —এর অর্থ এই নয় যে, আমার দোয়া কবুল হয়নি। ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দোয়া কবুল হওয়া আর দোয়া 'মুস্তাজাব (গৃহীত দোয়া)' হওয়া দুটি এক বিষয় নয়। প্রতিটি দোয়াই 'মুস্তাজাব (গৃহীত)'। কেননা কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন— ادعوني أستجب لكم। (তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো) কিন্তু দোয়া কবুল হওয়া এবং হুবহু কাঙ্ক্ষিত বস্তু অর্জিত হওয়া—দুটি এক বিষয় নয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া না পাওয়ার বিষয়টি আল্লাহর হেকমতের উপর নির্ভরশীল।

---

১. *প্রচলিত ভুল*, পৃ. ১৫৭-১৫৮

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝা যেতে পারে। কোনো রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা কামনা করলে ডাক্তার তার ডাকে সাড়া দেন। রোগীর চিকিৎসার সকল আবেদনই ডাক্তারের কাছে গৃহীত হয়। কিন্তু রোগী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে বললে বা নির্দিষ্ট অযুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে বললে ডাক্তার সাধারণত তা গ্রহণ করেন না বা হুবহু গ্রহণ করেন না। বরং অযুধটি তার জন্য উপযোগী মনে হলে অবশ্যই ডাক্তার সেটিই দেবে, নতুবা তার জন্য যেটি বেশি উপকারী ও উপযোগী, সেটিই দেবে।

মোটকথা, ডাক্তার তার হেকমত ও প্রজ্ঞা অনুযায়ীই কাজ করবে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালাও কখনও কখনও বান্দা যা চায়, হুবহু তা-ই দিয়ে দেন। আর কখনও তার চেয়েও বেশি উপকারী ও বেশি উপযোগী বস্তু দান করেন।

হাকিম আখতার রহ. এ প্রসঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা বলেছেন। তিনি বলেন, এক লোক ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি অমুক কাজটি করতে পারবে, তার জন্য এই পুরস্কার রয়েছে। বিশাল অঙ্কের একটি পরিমাণের কথা বলল। ঘোষণা অনুযায়ী গরিব এক লোক কাজটি করে ফেলল। কিন্তু লোকটি পুরস্কার না দিয়ে প্রথমে তাকে কঠিনভাবে বেত্রাঘাত করল। এরপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। অতঃপর তার কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার অর্পণ করল। লোকেরা জানতে চাইল—এমন করলে কেন? সে বলল, লোকটি গরিব, এত টাকা একসাথে পেলে সে হার্ট অ্যাটাক করে ফেলবে। তাই ব্যালেন্সে আনার জন্য এরকম করলাম।

লক্ষ করুন, একজন সাধারণ মানুষ যদি তার প্রজ্ঞানুযায়ী—কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ—সেই বিষয়টি বিবেচনা করে অন্যকে দান করে, তা হলে সবচেয়ে বড় প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহ ভালোমন্দ যাচাই না করে বান্দা নিজ অজ্ঞতাবশত তার কাছে যাই চাইবে, তা-ই দিতে পারেন?

এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সব সময় বান্দার দোয়া অনুযায়ী হুবহু বস্তু দেন না; বরং কার জন্য কোনটি উপযোগী; কোন সময়ে কোনটি উপযোগী; কোন স্থানে কোনটি উপযোগী—এসব বিবেচনা করেই বান্দাকে দান করে থাকেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন।

এ কথাটিই হযরত আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো মুসলমান যদি আল্লাহর কাছে এমন কোনো বিষয়ে দোয়া করে, যাতে কোনো গুনাহ কিংবা

আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ না করার কোনো বিষয় থাকে না, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তিনটি বিষয়ের যে কোনো একটি দান করেনঃ—

ক. হয়ত সে যে বিষয়ের দোয়া করেছে, হুবহু সেটিই দিয়ে দেন।

খ. অথবা তার উপর থেকে অনুরূপ কোনো বিপদ দূর করে দেন।

গ. নতুবা তার আখেরাতের জন্য অনুরূপ সাওয়াব জমা করে রাখেন।

সাহাবিগণ বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমরা যদি বেশি করি (বেশি পরিমাণে দোয়া করি)? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা (তোমাদের দোয়ার তুলনায়) অধিক (দাতা) (সুতরাং যত বেশি দোয়া করবে, ততই লাভবান হবে)।[১]

অনেক সময় দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণেও দোয়া কবুল করা হয় না। দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত হল রিজিক হালাল হওয়া এবং দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা। অর্থাৎ এ কথা না বলা—'কত দোয়া করলাম, কিন্তু কবুল তো হল না।'

তেমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি শর্ত হচ্ছে—অন্তর থেকে মনোযোগ সহকারে কবুলের আশা নিয়ে দোয়া করা। এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করো। তোমরা জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় অমনোযোগী ও অসাড় মনের দোয়া কবুল করেন না।[২]

প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর ছাত্র হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ রহ. বলেন, "তোমরা কি শুনোনি, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. দোয়া সম্পর্কে বলেছেন—'শপথ সেই সত্তার, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি কেবল ওই দোয়াকারীর দোয়াই শুনেন, যে দিলের উপস্থিতি ও পরম আস্থার সঙ্গে দোয়া করে। এ ছাড়া তিনি কোনো শ্রবণকরানেওয়ালা, প্রদর্শক, খেল-তামাশাকারী ও বাহ্যিক দোয়াকারীর দোয়া শুনেন না।"

দোয়ায় খেল-তামাশার মূল অর্থ হল, দোয়ার মধ্যে অমনোযোগী থাকা, গাফেল থাকা। তাবেয়ি হযরত রবি ইবনে খুসাইম রহ. এর একটি উক্তি *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবায়* (৩৫১৭০) উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে এক বার জিজ্ঞেস করা

---

১. *মুসনাদে আহমদ*: ১৭/২১৩; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ১/৪৯৩ (হাদিসের সনদ নির্ভরযোগ্য)

২. *সুনানে তিরমিজি*: ৩৪৯৭; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ১/৪৯৩ (হাদিসটি হাসান)

হয়েছিল—মানুষ বিভিন্ন হাল (অবস্থা) বদলানোর জন্য এত দোয়া করে, কিন্তু তাদের দোয়া তো কবুল হয় না এবং হালেরও বদল হয় না, কী কারণে এমন হয়? তখন তিনি উত্তর দিলেন— إن الله لا يقبل إلا النخيلة من الدعاء 'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা খাঁটি দোয়া ছাড়া অন্যকিছু কবুল করেন না।'

আর খাঁটি দোয়ার অর্থ হল, যে দোয়ায় দিল উপস্থিত থাকে। দোয়াকারী নিজে দোয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি আন্তরিক থাকে এবং দোয়ার বিষয়টিকে মনেপ্রাণে চায় ও কামনা করে। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট—দোয়ার মধ্যে মনোযোগী থাকা দোয়া কবুলের বড় একটি শর্ত।

এ ছাড়াও দোয়া কবুলের অনেক আদব ও শর্ত রয়েছে।[১] আমরা আমাদের দোয়াতে এ সকল আদব ও শর্তের প্রতি বিলকুল খেয়াল করি না, অথচ ফলাফল পাওয়ার আশা রাখি পুরোপুরি। এটি পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দিয়ে একশ নম্বর পাওয়ার আশা করা ছাড়া আর কী? আমাদের অবস্থা হল, দোয়ার জন্য হাত উঠালাম আর দোকানের হিসাব, বাড়িঘরের চিন্তা, দাড়ি টানাটানি ইত্যাদি কাজের জন্য যেন একটু অবসর পেলাম! আমরা একটু চিন্তা করি না—দুনিয়ার কোনো বাদশাহর কাছে যখন কোনো কিছু আবদার করতে যাই, তখন আমাদের অবস্থা কেমন হয়? আমরা কি তখন অমনোযোগী থাকি, বা অন্য কিছুর খেয়াল আমাদের মাথায় আসে? বাদশাহ বা প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, যে কোনো সম্মানি ব্যক্তির সামনে দাঁড়ালেই আমরা কত সংযত হই, কত মনোযোগী এবং হুশিয়ার হই। অথচ 'মালিকুল আমলাক' সকল বাদশাহের বাদশাহ আল্লাহ পাকের নিকট যখন কোনো কিছু চাইতে যাই, তখন আমরা খেল-তামাশা করার দুঃসাহস দেখাই।

এভাবে দোয়া করলে কোনো ফলাফল কি পাওয়া যাবে? ফলাফল পাওয়া তো দূরের কথা, এই তামাশার কারণে কোনো শাস্তি হয় কিনা সেটাই তো ভাববার বিষয়! দোয়ার মধ্যে প্রায়ই আমাদের এ জাতীয় গাফলতি হয়ে থাকে। তবে একাকী দোয়ার তুলনায় সম্মিলিত দোয়ার মধ্যে এই সমস্যা বেশি হয়। অবস্থা এমন, যেন ইমাম সাহেব অথবা যার সাথে আমার হাত উঠিয়েছি, তাকেই দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। যেভাবে বাসে বা ট্রেনে উঠলে চালককে দায়িত্ব দিয়ে আমরা ফ্রি হয়ে যাই, আর স্বাধীনভাবে বসে নানান বিষয়ে চিন্তা করতে থাকি; ঠিক তেমনিভাবে সম্মিলিত দোয়ায় আমরা যেন ইমাম সাহেবকে দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়ি।

---

১. দোয়ার আদব, শর্ত ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার রচিত *দোয়া ও যিকির* গ্রন্থটি দেখুন।

আমাদের উচিত—দোয়া কবুলের যতগুলো শর্ত রয়েছে, তা পূর্ণ করে দোয়ার সকল আদবের প্রতি লক্ষ রেখে সর্বদা দোয়া করতে থাকা। এরপর এই আশা পোষণ করা—অবশ্যই আমার দোয়া কবুল হবে। আমার জন্য যেটি উপযোগী; যেটি কল্যাণময়; সেটিই আল্লাহ তায়ালা আমাকে দান করবেন।

* * *

মাছুর দোয়া এবং আমাদের দোয়ার ভাষা

কুরআনে কারিমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.

'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো।'

সুতরাং আদবের প্রতি লক্ষ রেখে যে কেউ নিজের ভাষায় মনের চাওয়াটি, মনের কথাটি আল্লাহর কাছে বলতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। তবে আল্লাহ ও তার রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া দোয়াগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া উচিত। এগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে আমার সম্মানিত শিক্ষক মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দা. বা. গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন। এখানে তার কথাগুলো তুলে ধরা হল। আশাকরি পাঠকবৃন্দ এ থেকে উপকৃত হবেন, ইনশাআল্লাহ।

ধারা ও আদব বজায় রেখে মানুষ যে কোনো ভাষায়; যে কোনো শব্দে দোয়া করতে পারে। দোয়ার মৌলিক নীতিমালায় নিম্নোক্ত তিনটি ধারাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—

ক. যেসব স্থানে খোদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সহিহ হাদিসে বর্ণিত দোয়া আছে, যাকে 'দোয়ায়ে মাছুর' বা 'মাছুর দোয়া' বলা হয়, সেখানে মাছুর দোয়ার প্রতি যত্নবান হওয়াই সুন্নত। হাদিসে বর্ণিত দোয়া পরিত্যাগ করে অন্যসব দোয়া অবলম্বন করা আদৌ ঠিক নয়; বরং তা পরিত্যাজ্য।[১]

খ. মাছুর দোয়াগুলো যে শব্দে বর্ণিত, সেগুলোতে কোনো রূপ হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়া হুবহু সেভাবেই রেখে আমল করা শ্রেয়। নিজের পক্ষ থেকে যদিও তাতে কমানো-বাড়ানোর অবকাশ রয়েছে; তবে এরূপ করা অনুত্তম।[২]

---

১. *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনে তাইমিয়া: ২২/৫২৫; *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম:* ৫/৫৭৮

২. *ফাতহুল বারি:* ১১/১১৬; *লামেউদ দারারি:* ৩/৩৫২

গ. মাছুর দোয়ায় যদি কেউ কোনো বাক্য বৃদ্ধি করে, তাহলে অতিরিক্ত বাক্যকে মাছুর দোয়ার অংশ মনে করা নাজায়েজ। অর্থাৎ এরূপ মনে করা—এস্থানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, এ অংশটুকু তার অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এ অংশটুকু তার থেকে প্রমাণিত নয়। তাই একে তার তালিম শিক্ষার অংশ সাব্যস্ত করা কীভাবে সহিহ হবে?

ভালোভাবে বিষয়টি বুঝতে হবে। এক হল মাছুর দোয়ার মধ্যে কোনো বাক্য বাড়িয়ে পড়ে নেওয়া; আরেক হল বর্ধিত অংশকে মাছুর দোয়ার অন্তর্ভুক্ত মনে করা এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা শিক্ষা দিয়েছেন বলে জ্ঞান করা—উভয়টি এক নয়। প্রথমটি যদিও অনুত্তম তথাপি তা জায়েজ; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ নাজায়েজ। কেননা এতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা হয়। এজন্যই দেখা যায়—উলামা ও মুহাদ্দিসিনে কেরাম আপন আপন রচনাবলিতে এ ব্যাপারে খুবই যত্নবান—যেসব দোয়া মাছুর নয়, কিংবা কোনো শব্দ বা বাক্য মাছুর; তথা হাদিসে বর্ণিত নয়, সেগুলোকে মাছুর না হওয়া এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কথা প্রমাণভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা করে থাকেন, যেন দ্বীনের সবকিছুই হুবহু সে-আঙ্গিকেই সংরক্ষিত থাকে, যে আঙ্গিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন।[১]

* * *

অজুর প্রতিটি অঙ্গের জন্য কি বিশেষ দোয়া আছে?

বিভিন্ন দোয়ার কিতাবেই অজুর প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় আলাদা আলাদা দোয়া পড়ার কথা পাওয়া যায়। যেমন:

* বিসমিল্লাহ বলার পর কুলি করার সময় বলবে—

اللهم أعني على تلاوة القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن عبادتك

হে আল্লাহ, কুরআন তেলাওয়াত এবং আপনার জিকির করা, আপনার শোকর আদায় করা এবং উত্তম ইবাদতের জন্য আমাকে সাহায্য করুন।

* নাকে পানি দেওয়ার সময় বলবে—

---

১. *প্রচলিত জাল হাদিস*, পৃ. ১৬১

اللهم أرحني رائحة الجنة ولا ترحني رائحة النار

হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতের ঘ্রাণ শুঁকিয়ে দিন, জাহান্নামের ঘ্রাণ শোঁকাবেন না।

* চেহারা ধৌত করার সময় বলবে—

اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

হে আল্লাহ, যেদিন অনেক চেহারা আলোকিত হবে এবং অনেক চেহারা কালো হবে, সেদিন আমার চেহারা আলোকিত করে দিন।

* ডান হাত ধৌত করার সময় বলবে—

اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً

হে আল্লাহ, আমার কিতাব (আমলনামা) আমার ডান হাতে দিন এবং আমার থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করুন।

* বাম হাত ধৌত করার সময় বলবে—

اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري

হে আল্লাহ, আমার কিতাব (আমলনামা) আমার বাম হাতে কিংবা আমার পশ্চাৎ থেকে দেবেন না।

* মাথা মাসাহ করার সময় বলবে—

اللهم أظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك

হে আল্লাহ, সেদিন আমাকে আপনার আরশের নিচে ছায়া দিন, যেদিন আপনার আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না।

* কান মাসেহ করার সময় বলবে—

اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

হে আল্লাহ, আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন, যারা কথা শোনে, অতঃপর উত্তমটির অনুসরণ করে।

* গর্দান মাসেহ করার সময় বলবে—

اللهم أعتق رقبتي من النار

হে আল্লাহ, আমার গর্দানকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করুন।

* ডান পা ধৌত করার সময় বলবে-

اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم

হে আল্লাহ! সিরাতে মুস্তাকিমের উপর আমার পা'কে অটল রাখুন।

* বাম পা ধৌত করার সময় বলবে—

اللهم اجعل ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجارتي لن تبور

হে আল্লাহ, আমার গুনাহকে ক্ষমা করে দিন ও আমার প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় বানিয়ে দিন এবং আমার ব্যাবসাকে অব্যর্থ বানিয়ে দিন।

এভাবে প্রতিটি অঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা দোয়া পড়ার কথা বলা হয়। কিন্তু এসব দোয়া কোনো নির্ভরযোগ্য হাদিসে পাওয়া যায় না। শুধু একটি হাদিস এমন পাওয়া যায়—ইবনে হিব্বান রহ. তার *আল-মাজরূহিন* গ্রন্থে (২/১৬৫) আনাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,[১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে আনাস, আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে অজুর পরিমাণ শিখিয়ে দেবো। আমি তার কাছে গেলাম। অতঃপর তিনি যখন তার হাত ধৌত করলেন, তখন বললেন,[২] اللهم أعطني كتابي بيميني ... সব শেষে বললেন, হে আনাস, ওই সত্তার শপথ! যিনি আমাকে হক দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যে বান্দাই তার অজুর সময় এই দোয়াগুলো পড়বে, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে এক কাতরা পানি পড়তে-না পড়তেই আল্লাহ তায়ালা তা থেকে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করবেন, যে সত্তর জবানে আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করবে, যে তাসবিহের সাওয়াব অজুকারীর জন্য হবে কেয়ামত পর্যন্ত।

মুহাদ্দিসদের ভাষ্যমতে—এই হাদিসটি ভিত্তিহীন। কয়েকজন মুহাদ্দিসের বক্তব্য এখানে তুলে ধরছি:

---

১. ولفظه : عن أنس.قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه إناء من ماء فقال لى: يا أنس ادن منى أعلمك مقادير الوضوء قال: فدنوت منه عليه الصلاة والسلام فلما غسل يديه قال: بسم الله والحمد لله ولاحول ولا قوة إلا بالله فلما استنجى قال: اللهم حصن لى فرجى ويسر لي أمرى، فلما تمضمض واستنشق قال: اللهم لقنى حجتى ولا تحرمنى رائحة الجنة، فلما غسل وجهه قال: اللهم بيض وجهى يوم تبيض الوجوه، فلما أن غسل ذراعيه قال: اللهم أعطني كتابي بيمينى، فلما أن مسح رأسه قال: اللهم تغشنا برحمتك وجنبنا عذابك فلما أن غسل قدميه قال: اللهم ثبت قدمى يوم تزول فيه الاقدام، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذى بعثنى بالحق يا أنس ما من عبد قالها وضوئه لم يقطر من خلل أصابعه قطرة إلا خلق الله منها ملكا يسبح الله بسبعين لسانا يكون ثواب ذلك التسبيح له إلى يوم القيامة

২. এরপর প্রতিটি অঙ্গের জন্য উল্লিখিত বাক্যগুলো বলেছেন। দুই এক জায়গায় উল্লিখিত বাক্যগুলো থেকে ভিন্ন বাক্য বলেছেন, যা আগের টীকায় উল্লেখ হয়েছে।

* উপরোক্ত হাদিসের বর্ণনাকারী উবাদা ইবনে সুহাইব সম্পর্কে ইবনে হিব্বান রহ. বলেন, সে ছিল কাদরি (তাকদির অস্বীকারকারী) ফিরকার একজন। একে তো সে তার কাদরি আকিদার দিকে আহ্বান করত, তা ছাড়া প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের থেকে এমন মুনকার (আপত্তিজনক) রেওয়ায়াত বর্ণনা করত, এই ফনের (হাদিস শাস্ত্রের) নবিনরাও যেগুলো জাল হওয়ার সাক্ষ্য দেবে। এভাবে উবাদা ইবনে সুহাইবের অবস্থান বর্ণনা করার পর তার উপরোক্ত আপত্তিজনক রেওয়ায়াতটি তিনি বর্ণনা করেন।[১]

* ইবনে জাওযি রহ. উপরোক্ত হাদিস সম্পর্কে বলেন, এটি সহিহ নয়।[২]

* ইবনে সালাহ রহ. বলেন, এ সম্পর্কে (অজুর প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় আলাদা আলাদা দোয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে) কোনো সহিহ হাদিস নেই।[৩]

* নববি রহ. বলেছেন, এই দোয়ার কোনো ভিত্তি নেই।[৪] তিনি আরও বলেন, অজুতে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় আলাদা দোয়া পড়ার বিষয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনো কিছুই বর্ণিত হয়নি।[৫]

* আল্লামা ইবনে কাইয়িম রহ. বলেন, অজুর অঙ্গসমূহে পাঠের জিকিরসংক্রান্ত হাদিসসমূহ সবগুলোই বাতিল (ভিত্তিহীন)। এ প্রসঙ্গে সহিহ কোনো কিছুই নেই।[৬] অন্যত্র[৭] তিনি এসব দোয়াকে মিথ্যা ও জাল বলেছেন।

* ইবনে হাজার রহ. উল্লিখিত রেওয়ায়াত সম্পর্কে বলেন, এই ফনে (হাদিস শাস্ত্রে) যারা নবিন, তারাও এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, হাদিসটি জাল।[৮]

* ফাত্তানি রহ. তার জাল হাদিসের গ্রন্থ 'তাযকিরাতুল মওযুআতে' হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, এতে উবাদা ইবনে সুহাইব নামক রাবি আছে, যে অভিযুক্ত।[৯]

* মুবারকপুরি রহ. বলেন, অজুর প্রতিটি অঙ্গে দোয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে কোনো হাদিস প্রমাণিত হয়নি।[১]

---

১. *আল-মাজরূহিন*: ২/১৬৫
২. *আল-ইলালুল মুতানাহিয়াহ*: ১/৩৩৮
৩. *আত-তালখিসুল হাবির*: ১/১৭৪
৪. *রওযাতুত তালিবিন*: ১/১৯
৫. *আল-আযকার*: পৃ. ২৮
৬. *আল-মানারুল মুনিফ*, পৃ. ১২০
৭. *যাদুল মাআদ*: ১/১৮৪
৮. *তাযকিরাতুল মওযুআত*: পৃ. ১/৩২
৯. *তাযকিরাতুল মওযুআত*: পৃ. ১/৩১

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস ছাড়াও আলি রাযি. থেকে বিভিন্ন সূত্রে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তবে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এর ভাষ্যমতে—সবগুলো সূত্রই নিতান্ত দুর্বল।[২]

মুহাদ্দিস বা হাদিস বিশারদদের বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—হাদিসটির কোনো ভিত্তি নেই। তবে হানাফি, মালিকি ও অধিকাংশ শাফিয়ি এবং কতিপয় হাম্বলি আলেমের মতে—অজুর প্রতি অঙ্গে দোয়া করা মুস্তাহাব।[৩] এই সংক্রান্ত হাদিস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে তারা ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

কিন্তু হাদিসের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের কথাই যেহেতু ধর্তব্য, আর হাদিসের ইমামগণ এ সংক্রান্ত হাদিসকে ভিত্তিহীন বলেছেন, তাই এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। সুতরাং এসব দোয়াকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এবং অজুর প্রতি অঙ্গ ধৌত করার নির্ধারিত দোয়া মনে করার কোনো সুযোগ নেই। হ্যাঁ, যেহেতু এসব দোয়ার অর্থ সুন্দর, এতে মুনকার বা আপত্তিজনক কোনো কথা নেই, তাই কেউ যদি এসব দোয়াকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত কিংবা অজুর প্রতি অঙ্গ ধৌত করার নির্ধারিত দোয়া মনে না করে পড়ে, তা হলে কোনো অসুবিধা হবে না।

* * *

নামাজ-পরবর্তী তাসবিহের সংখ্যা এবং একটি সন্দেহের নিরসন

নামাজ-পরবর্তী তাসবিহের সংখ্যার ব্যাপারে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। যেহেতু প্রায় সবগুলোই সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তাই কোনটির উপর আমল করব—তা বোঝা আমাদের অনেকের পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। এর সমাধান আমরা বের করতে পারি না। এ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা এখানে তুলে ধরলাম।

প্রথমে এ সংক্রান্ত বর্ণনাগুলো দেখুন:—

এক. ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

---

১. *তুহফাতুল আহওয়াযি*: ১/১৫১
২. *আত-তালখিসুল হাবির*: ১/১৭৪
৩. *আল-মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*: ৪৩/৩৭৪

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— দরিদ্র লোকেরা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, সম্পদশালী ও ধনী লোকেরা তাদের সম্পদের দ্বারা (দান-খয়রাতের মাধ্যমে) উচ্চমর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছেন। তারা আমাদের মতো নামাজ আদায় করছেন। আমাদের মতো রোজা পালন করছেন এবং অর্থের দ্বারা হজ, উমরা, জিহাদ ও সদকা করার মর্যাদাও লাভ করছেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের এমন কিছু আমলের কথা বলব, যা সম্পাদন করলে যারা নেক কাজে তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে, তোমরা তাদের পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে। তবে যারা অনুরূপ কাজ করবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর তেত্রিশবার করে তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ) এবং তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হল। কেউ বলল, আমরা তেত্রিশবার তাসবিহ পড়ব; তেত্রিশবার তাহমিদ; আর চৌত্রিশবার তাকবির পড়ব। অতঃপর আমি রাসুলের নিকট ফিরে গেলাম। তিনি বললেন, سُبحانَ اللهِ وَالحَمدُ للهِ وَ اللهُ أَكبَرُ বলবে, যাতে সবগুলোই তেত্রিশবার করে হয়ে যায়।[১]

দুই. ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলবে।

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত— **এক বার** সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করা হল, তারা যেন প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে।[২]

তিন. ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার পড়বে এরপর এক বার পড়বে:—

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই, রাজত্ব একমাত্র তারই, সমস্ত প্রশংসাও একমাত্র তারই জন্য, আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।'

---

১. *সহিহ বুখারি:* ৮৪৩; *সহিহ মুসলিম:* ৫৯৫

২. *মুসনাদে আহমদ:* ৩৫/৪৭৯; *সুনানে নাসায়ি:* ১৩৫০; *সুনানে তিরমিজি:* ৩৪১৩; *সহিহ ইবনে খুযাইমাহ:* ১/৩৭০; *সহিহ ইবনে হিব্বান:* ২০১৭ (সহিহ).

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্ত নামাজ শেষে তেত্রিশবার আল্লাহর তাসবিহ বা পবিত্রতা বর্ণনা করবে, তেত্রিশবার আল্লাহর তাহমিদ বা তার প্রশংসা করবে এবং তেত্রিশবার তাকবির বা তার মহত্ত্ব বর্ণনা করবে, আর এভাবে নিরানব্বই বার হওয়ার পর শততম পূর্ণ করতে বলবে— لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ... তখন তার গুনাহসমূহ সমুদ্রের ফেনারাশির মতো অসংখ্য হলেও ওই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।[১]

চার. ২৫ বার সুবহানাল্লাহ, ২৫ বার আলহামদুলিল্লাহ, ২৫ বার আল্লাহু আকবার এবং ২৫ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. থেকে বর্ণিত— (একদা) সাহাবায়ে কেরামকে আদেশ করা হল, তারা যেন প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলে। তারপর স্বপ্নে এক আনসারি সাহাবির পক্ষ থেকে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. কে উদ্দেশ্য করে বলা হল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের কি আদেশ করেছেন যে, তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওই আনসারি বললেন, 'তোমরা ওই তাসবিহগুলোকে ২৫ বার পড়বে এবং তাতে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেবে। যখন সকাল হল, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে স্বপ্নবৃত্তান্ত করলে তিনি বললেন, 'তোমরা তাসবিহগুলোকে অনুরূপভাবেই পড়বে।'[২]

পাঁচ. ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদু লিল্লাহ, ১০ বার আল্লাহু আকবার।

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

ক. আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— গরিব সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ধনী লোকেরা তো উচ্চমর্যাদা ও চিরস্থায়ী নিয়ামত নিয়ে আমাদের

---

১. *মুসনাদে আহমদ: ১৪/৪২৮; সহিহ মুসলিম: ৫৯৭*
২. *মুসনাদে আহমদ: ৩৫/৪৭৯; সুনানে নাসায়ি: ১৩৫০; সুনানে তিরমিজি: ৩৪১৩; সহিহ ইবনে খুযাইমাহ: ১/৩৭০ সহিহ ইবনে হিব্বান: ২০১৭ (সহিহ)*

থেকে এগিয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কীভাবে? তাঁরা বললেন, আমরা যেরকম নামাজ আদায় করি, তাঁরাও সেরকম নামাজ আদায় করেন। আমরা যেমন জিহাদ করি, তাঁরাও তেমন জিহাদ করেন এবং তাঁরা তাদের অতিরিক্ত মাল দিয়ে সদকা-খয়রাত করেন; কিন্তু আমাদের কাছে সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের একটি আমল বলে দেবো না, যে আমল দ্বারা তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মর্যাদা লাভ করতে পারবে, আর তোমাদের পরবর্তীদের চেয়ে এগিয়ে যেতে পারবে, আর তোমাদের মতো আমল কেউ করতে পারবে না, কেবলমাত্র যারা তোমাদের মতো আমল করবে তারা ব্যতীত। সে-আমল হল, তোমরা প্রত্যেক নামাজের পর ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে।[১]

খ. আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত— রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান ব্যক্তি দুইটি অভ্যাসে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারলে সে নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। জেনে রেখো! উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আয়ত্ত করা সহজ। কিন্তু অনেক কমসংখ্যক লোকই তা আমল করে থাকে।

একটি অভ্যাস হল প্রতি ওয়াক্তের (ফরজ) নামাজের পর দশ বার 'সুবহানাল্লাহ', দশ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' ও দশ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমি নামাজের পর স্বীয় হস্তে গণনা করতে দেখেছি।' তারপর তিনি বলেন, (পাঁচ ওয়াক্তে) মুখের উচ্চারণে একশত পঞ্চাশবার এবং মিজানে (দাঁড়িপাল্লায়) দেড় হাজার হবে।

আরেকটি অভ্যাস হল (ঘুমাতে) শয্যাগ্রহণকালে তুমি 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' একশবার বলবে, ফলে তা মিজানে এক হাজারে রূপান্তর হবে। তোমাদের মাঝে কে এক দিন ও এক রাতে দুই হাজার পাঁচশ গুনাহে লিপ্ত হয়? (অর্থাৎ এই আমলের কারণে এতগুলো পাপও ক্ষমাযোগ্য হবে)।'

সাহাবিগণ বলেন, 'কোনো ব্যক্তি সব সময় এরূপ একটি ইবাদত কেন করবে না! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ নামাজে অবস্থানরত থাকাকালে তার কাছে শয়তান এসে বলতে থাকে—এটা মনে করো, ওটা মনে করো। ফলে সেই নামাজি (শয়তানের ধোঁকাবাজির মাঝেই থাকা

---

১. *সহিহ বুখারি:* ৬৩২৯

অবস্থায়) নামাজ শেষ করে। আর উক্ত তাসবিহ আমল করার সে সুযোগ পায় না। পুনরায় তোমাদের কেউ শয্যাগ্রহণ করলে শয়তান তার নিকট এসে তাকে ঘুম পাড়ায় এবং সে তাসবিহ না পাঠ করেই ঘুমিয়ে পড়ে।[১]

ছয়. তিন তাসবিহ-ই ১১ বার করে মোট তেত্রিশবার পড়বে।

এ সংক্রান্ত রেওয়ায়াত

*সহিহ মুসলিমে*র এক বর্ণনায় (৫৯৫) হাদিসের রাবি সুহাইল থেকে প্রতিটি তাসবিহ ১১ বার করে মোট তেত্রিশবার পড়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

সমাধান: ১১ বার পড়ার কথা ইবনে উমর রাযি. থেকে *মুসনাদে বাযযারে* একটি দুর্বল রেওয়ায়াত ছাড়া বিশুদ্ধ মারফু রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়নি। এটি শুধু আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনাকারী সুহাইলের অভিমত। (দেখুন, তাসহিহুদ দোয়া, পৃ. ৪৩২)

বাকি রেওয়ায়াতগুলোর মধ্যে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে সমন্বয় করেছেন। তবে এগুলোর মধ্যে বাগাবি রহ. এর ব্যাখ্যাটি বেশ চমৎকার। তিনি বলেন, 'নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম বলেছিলেন। প্রথমে দশ বার দশ বার পড়ার কথা বলেছিলেন; এরপর এগারো বার করে পড়ার কথা বলেছিলেন; এরপর ৩৩ বার করে পড়ার কথা বলেছিলেন। আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে, স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য (অর্থাৎ যার ইচ্ছা ১০ বার করে পড়বে, যার ইচ্ছা ৩৩ বার করে পড়বে)। আবার এই সম্ভাবনাও রয়েছে— অবস্থার বিবেচনায় পার্থক্য হবে (একেক সময় একেকটা গ্রহণ করা হবে, যেমন সময় সংকীর্ণ হলে ১০ বার পড়বে)।[২]

তবে একটি বিষয় লক্ষণীয়। কেউ যদি ১০ বার করে পড়েন, তাহলে দশ দশ করে সর্বমোট ৩০ বার পড়বেন। আর যদি ৩৩ করে পড়েন, তাহলে হয়ত সবগুলো তাসবিহ-ই ৩৩ বার পড়বেন, নতুবা প্রথম দুটি ৩৩ বার পড়ে আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বেন, নতুবা আল্লাহু আকবার ৩৩ বার পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ...' এক বার পড়বেন। অথবা সবগুলো ২৫ বার পড়ে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ২৫ বার পড়বেন। অর্থাৎ এক হাদিসের উপর আমল করলে ওই হাদিসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেটি দেখতে হবে, দুটি হাদিস মিলিয়ে নিজের পক্ষ থেকে

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ৩৪১০; *সুনানে আবু দাউদ*: ৫০৬৫; *সুনানে নাসায়ি*: ১৩৪৮; *সুনানে ইবনে মাজা*: ৯২৬

২. বিস্তারিত দেখুন *ফাতহুল বারি*: ৩/৮১-৮২

কোনো সুরত বানানো উচিত নয়। ড. বকর আবু যায়েদ তার *তাসহিহুদ দোয়া* গ্রন্থে (পৃ. ৪৩) এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

* * *

মাগরিবের পরের একটি দোয়া ও আমাদের ভুল

اللهم إني أسألك رِضَاكَ وَالجَنَّةَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত কামনা করছি।'

এই দোয়াটি ফজর ও মাগরিবের পরে আট বার পড়ার কথা সবার নিকট প্রসিদ্ধ। কিন্তু নির্ভরযোগ্য-অনির্ভরযোগ্য কোনো হাদিসেই এভাবে হয়নি।

তবে *মুসনাদে আহমদে* (২৯/৫৯৩) ফজর ও মাগরিবের পরে সাত বার اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর 'মুসনাদে আহমদে'র কোনো কোনো নুসখায় মাগরিবের পর اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ সাত বার পড়ার পাশাপাশি اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ (হে আল্লাহ, আমি জান্নাত কামনা করছি) পড়ার কথাও এসেছে।

এছাড়া ফজর ও মাগরিবের শর্ত না করে দিনের যে কোনো সময় সাত বার জান্নাত কামনা করার কথা এক হাদিসে বিবৃত হয়েছে (এভাবে বলবে— أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّةَ। 'আমি আল্লাহর কাছে জান্নাত কামনা করি')। যেমন আবু হোরায়রা রাযি. এর সূত্রে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلَّا قَالَتِ النَّارُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا قَدِ اسْتَجَارَ مِنِّي فَأَجِرْهُ، وَلَا سَأَلَ اللهَ عَبْدٌ الْجَنَّةَ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، إِلَّا قَالَتِ الْجَنَّةُ: يَا رَبِّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلَانًا سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ.

'যে বান্দাই দিনে সাত বার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করে, জাহান্নাম বলে— হে রব, আপনার অমুক বান্দা আমার থেকে আশ্রয় কামনা করেছে, আপনি তাকে মুক্তি দিয়ে দিন। আর যে বান্দাই দিনে সাত বার জান্নাত কামনা করে, জান্নাত বলে—হে রব, আপনার অমুক বান্দা আমাকে পাওয়ার কামনা করেছে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন।'[১]

---

১. *মুসনাদে আবু ইয়ালা*, হাদিস - ৬১৯২

তা ছাড়া আনাস ইবনে মালিক রাযি. থেকে বর্ণিত এক হাদিসে প্রতিদিন তিন বার জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করার কথা এসেছে। আনাস রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَأَلَ اللهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ.

'যে ব্যক্তি তিন বার জান্নাত কামনা করে, জান্নাত বলে, হে আল্লাহ, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর যে তিন বার জাহান্নাম থেকে আশ্রয় কামনা করে, জাহান্নাম বলে, হে আল্লাহ, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।'[১]

তেমনিভাবে সংখ্যা ও সময় নির্ধারণ ছাড়া জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া করার কথা হাদিসে এসেছে। যেমন এক হাদিসে এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল রাযি. তার ছেলেকে দোয়া করতে শুনলেন— 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব, তখন জান্নাতের ডান দিকে যেন সাদা অট্টালিকা থাকে।' (এ কথা শুনে) আবদুল্লাহ রাযি. বললেন, শোনো! আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করো এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি—'শীঘ্রই এ উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।'[২]

এ কথা সুস্পষ্ট—কোনো হাদিসেই ফজর ও মাগরিবের পর আট বার اللهم إني أسألك رِضَاكَ وَالجَنَّةَ বলার কথা আসেনি। তবে দিনে সাত বার অথবা তিন বার জান্নাতের দোয়া করার কথা হাদিসে এসেছে। এ হিসেবে কেউ যদি ফজরের পর বা মাগরিবের পর আবশ্যক মনে না করে এবং এই সময়ের নির্ধারিত কোনো দোয়া মনে না করে, তিন বার অথবা সাত বার এই দোয়া করে, তা হলে অসুবিধার কিছু নেই।

* * *

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ২৫৭২, *সুনানে নাসায়ি*: ৫৫২১; *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ৩/৩০৮ (হাদিসটি সহিহ)

২. *মুসনাদে আহমদ*: ৩/৮০ *সুনানে আবু দাউদ*: ৯৬; *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ১৫/১৬৬; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ১/১৬২ (হাদিসটি হাসান)

তারাবির নামাজে প্রতি চার রাকাত পর পঠিত দোয়াটি কি প্রমাণিত?[1]

আমাদের দেশের প্রায় সব মসজিদে তারাবির নামাজের প্রত্যেক চার রাকাত অন্তর অন্তর একটি দোয়া পড়ার প্রচলন রয়েছে। অনেক জায়গায় এটি সম্মিলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে পড়া হয়ে থাকে। অনেকে এ দোয়া পড়াকে জরুরি বা অন্তত সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব পর্যায়ের মনে করেন। কিন্তু আসলেই কি তাই!

প্রথম কথা হল, তারাবির প্রতি চার রাকাত পরপর কিছু সময় বিরতি দেওয়া মুস্তাহাব। এই বিরতির সময় কী করতে হবে শরিয়ত তা নির্ধারণ করে দেয়নি। তাই ফকিহগণ বলেছেন, এ সময় মুসল্লিরা যেমন তাসবিহ-তাহলিল, দোয়া-দরুদ বা যে কোনো জিকিরে কাটাতে পারে, তেমনি কেউ চাইলে নীরব বসেও থাকতে পারে। এগুলোর কোনোটিকেই নির্দিষ্টভাবে আবশ্যকীয় মনে করার সুযোগ নেই। তেমনিভাবে নির্দিষ্ট কোনো তাসবিহ বা দোয়া পড়াকে জরুরি মনে করার অবকাশও শরিয়তে নেই। কেননা এই সময়ে নির্দিষ্ট কোনো দোয়া পড়ার কথা হাদিসে পাওয়া যায় না।[2]

আর আমাদের এ অঞ্চলে পঠিত তাসবিহটির পূর্ণ পাঠ সহিহ হাদিসে পাওয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু এ সময়ে যে কোনো তাসবিহ ও দোয়া-দরুদ পড়া যায়, সে-হিসেবে ফিকহের কিছু কিতাবে শব্দ ও বাক্যের সামান্য ব্যতিক্রমসহ প্রচলিত তাসবিহর অনুরূপ একটি তাসবিহ পড়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন 'ফাতোয়ায়ে শামি'তে (৬/২৪৬) এসেছে, কুহিস্তানি বলেছেন, তিন বার বলবে—

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

তবে মনে রাখতে হবে, এটি হাদিসে বর্ণিত কোনো তাসবিহ নয়। আর তারাবির প্রতি চার রাকাতের পর এই দোয়াটি পাঠ করা একেবারেই নবআবিষ্কৃত। সাহাবায়ে কেরামের কেউই এ সময় এ ধরনের কোনো তাসবিহ পড়েছেন—এমন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এ তাসবিহ পড়াকে জরুরি কিংবা সুন্নত বা

---

১. এ লেখাটি মূলত ভাই ইমদাদুল্লাহর একটি লেখার সারসংক্ষেপ। আমি এতে কিছুটা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছি।

২. *আদ-দুররুল মুখতার:* ২/৪৬; *বাদায়েউস সানায়ে:* ১/৬৪৮; *শরহুল মুনইয়া,* পৃ. ৩৫০, ৪০৪

মুস্তাহাব মনে করার কোনো সুযোগ নেই, এবং এটাকে এই সময়ের নির্ধারিত তাসবিহও গণ্য করা যাবে না।

এ কারণেই এ তাসবিহটি না পড়ে অন্য কোনো তাসবিহ বা দোয়া পড়লেও কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য প্রচলিত এই তাসবিহের স্বপক্ষে কোনো হাদিস না থাকলেও এর অর্থ সঠিক। কেননা এতে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও গুণপ্রকাশক এবং চমৎকার অর্থময় শব্দাবলি রয়েছে। উপরন্তু এই তাসবিহের বাক্যগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন মাছুর দোয়ায়ও বর্ণিত হয়েছে। তাই কেউ এটিকে সুন্নত-মুস্তাহাব মনে না করে, ব্যক্তিগতভাবে অনুচ্চস্বরে সাধারণ দোয়া হিসেবে পড়লে, তাকে নিষেধ করারও প্রয়োজন নেই। কেননা এভাবে পাঠ করার মধ্যে শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো সমস্যা নেই। এজন্য এটিকে বেদআত বলা যাবে না।

মনে রাখতে হবে— এ আমলটি যেহেতু বিভিন্ন এলাকায় বহুদিন থেকে প্রচলিত, তাই মানুষকে বুঝিয়ে ধীরে ধীরে তা সংস্কার করতে হবে।[১]

* * *

খাবার শুরুর দোয়া এবং আমাদের ভুল

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ

‘বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ’ (আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর দেওয়া বরকতের সাথে শুরু করছি)।

দোয়াটি এভাবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু দোয়ার এ বাক্যটি ভুল। বিশুদ্ধ বাক্য হল, بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ ‘বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ।’ ‘আলা’ শব্দটি যুক্ত হবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমর হযরত আবু আইয়ুব রাযি. এর ঘরে এসে খাওয়াদাওয়া করে যখন পরিতৃপ্ত হলেন, তখন নবিজি বললেন, ‘রুটি, গোশত, শুকনো খেজুর, কাঁচা খেজুর, পাকা খেজুর! যখন তোমরা এমন খাবার পাবে এবং

---

১. *কিতাবুন নাওয়াযিল*: ৫/১০৪; *ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ*: ১/১৯৬; *ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া*: ৭/৩৫০; *আল-মাবসুত*, সারাখসি: ২/১৪৫; *বাদায়েউস সানায়ে* ১/৬৪৮; *মা সাবাতা বিস-সুন্নাহ* পৃ. ২১২; *ইমদাদুল আহকাম*: ১/৬৫৬

হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করবে, তখন বলবে—بِسْمِ اللهِ وَبَرَكَةِ اللهِ 'বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ।'[১]

উল্লিখিত রূপটিই দোয়াটির বিশুদ্ধ পাঠ। কিন্তু লোকমুখে প্রসিদ্ধ দোয়াটি হাদিসের কোনো কিতাবেই এভাবে বর্ণিত হয়নি। ভাষাগত দিক থেকেও এটি বিশুদ্ধ নয়।[২]

* * *

খাবার শেষের দোয়া এবং একটি ভুল

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের পানাহার করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।'[৩]

---

১. মুসতাদরাকে হাকিম: ৪/১২০; ইবনে হিব্বান: ১২/১৮, তাবারানি: ২২৪৭

২. কথা হলো, এই ভুল প্রসিদ্ধ হল কীভাবে—এ ব্যাপারে দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর আমার কাছে যা সুস্পষ্ট, তা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। আমার অনুসন্ধানমতে 'আলা' সংযুক্ত করে দোয়াটি জাযারি রাহি. এর *আল-হিসনুল হাসিন* থেকেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তিনি *মুসতাদরাকে হাকিমের* উদ্ধৃতিতে এভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুসতাদরাকে হাকিমে দোয়াটি এভাবে পাওয়া যায় না। আমার কাছে *মুসতাদরাকে হাকিমের* চারটি এডিশন রয়েছে, কোথাও দোয়াটি 'আলা' সংযুক্ত করে নেই। সেখানে আছে 'আলা' ছাড়াই 'বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ'। দেখুন:
ক. দারুত তাসিল: ৭/৯৪
খ. দারুল হারামাইন: ৪/২০৯
গ. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ: ৪/১২০
ঘ. দারুল মারেফা (যা হিন্দুস্তানি এডিশনের ফটোকপি) : ৪/১০৭
কোনো এডিশনেই 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' নেই। হাদিসটি *আল-জামিউল কাবিরে* (৪/৬৮৯) *মুসতাদরাকে হাকিমের* উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু সেখানেও 'আলা' নেই। আলি মুত্তাকি রাহি. এর *কানযুল-উম্মালেও* (১৫/২৫৬) হাদিসটি এভাবে 'আলা' যুক্ত করে নেই। *তাবারানি আওসাতে* (২২/৪৭)ও রয়েছে; কিন্তু সেখানেও 'আলা' শব্দটি পাইনি। তা হলে *আল-হিসনুল হাসিনে* এটি কোথা থেকে এল?
হিসনে হাসিনের ভিত্তি যে সকল কিতাবের ওপর, এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইবনে হুমাম রাহি. এর *সিলাহুল মুমিন*। সেখানে পৃষ্ঠা ৩৯৪-এ *মুসতাদরাকে হাকিমের* উদ্ধৃতিতে দোয়াটি উল্লেখ রয়েছে *হিসনে হাসিনের* মতো 'আলা' সংযুক্ত করে। তখন আর বুঝতে বাকি রইল না—সমস্যাটি *সিলাহুল মুমিন* গ্রন্থ থেকেই শুরু হয়েছে। সেখানে ভুল করে 'আলা' অতিরিক্ত হয়েছে আর এখান থেকে হিসনে হাসিনে এসেছে। পরে এভাবেই তা আমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

৩. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওয়া এবং পান করার পর এই দোয়াটি পাঠ করতেন। (*মুসনাদে আহমদ:* ১৭/৩৭৫; *সুনানে আবু দাউদ:* ৩৮৫০; *সুনানে তিরমিজি:* ৩৪৮৪; *সুনানে ইবনে মাজা:* ৩২৮৩ (হাদিসটির সনদ হাসান)

লোকমুখে দোয়াটির শেষ অংশ প্রসিদ্ধ হচ্ছে এভাবে—وجعلنا من السلمين 'মিন' শব্দটি অতিরিক্ত করে। কিন্তু এটি সঠিক নয়। হাদিসের কোনো বিশুদ্ধ বর্ণনায় কিংবা হাদিসের কোনো কিতাবের বিশুদ্ধ নুসখায় এভাবে পাওয়া যায় না এই দোয়াটি। বরং বিশুদ্ধ সেভাবেই, যেভাবে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ 'মিন' যুক্ত না করে এভাবে—وجعلنا مسلمين (ওয়া জাআলানা মুসলিমিনি)।

* * *

খাবারের আরেকটি দোয়া ও আমাদের ভুল

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

'হে আল্লাহ, যে লোক আমার খাবারের ব্যবস্থা করে আপনি তার খাবারের ব্যবস্থা করুন। আর যে আমাকে পান করায়, আপনি তাকে পান করান।'

সাধারণত এই দোয়াটি উল্লেখ করা হয়—'কেউ আহার করালে কিংবা পান করালে তাকে কী বলে দোয়া দেবে'—এই শিরোনামের অধীনে। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করে কিংবা পান করে এই দোয়া পাঠ করেননি; বরং তার যখন খাবারের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তিনি এই দোয়া বলেছিলেন। তাই 'খাবার কিংবা পানি চাওয়ার সময়ের দোয়া' এই শিরোনামের অধীনে দোয়াটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য পূর্ণ হাদিসটি উল্লেখ করছি।

মিকদাদ রাযি. বলেন, প্রচুর খাদ্যসংকটে আমার ও আমার দুই সাথির দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তি কমে যায়। অতঃপর আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের নিকটে নিজেদের উত্থাপন করতে লাগলাম। কিন্তু তাদের কেউ আমাদের কথা শোনলেন না। সবশেষে আমরা রাসুলের নিকট আগমন করলে তিনি আমাদেরকে তার পরিবারের কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনটি বকরি ছিল। বললেন, তোমরা দুধ দোহন করবে। আর এ দুধ আমরা বণ্টন করে পান করব। তিনি বলেন, এরপর থেকে আমরা দুধ দোহন করতাম। আমাদের সবাই যার যার অংশ পান করত। এক রাতে আমার কাছে শয়তান এল। আমি তো আমার অংশ পান করে ফেলেছিলাম। সে এসে তখন বলল, মুহাম্মাদ আনসারিদের কাছে গেলে তারা তাঁকে উপঢৌকন দেবে এবং তার এ অল্প দুধের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যাবে। অতঃপর আমি এসে নবিজির অংশটুকুও পান করে

ফেললাম। দুধ যখন উত্তমভাবে আমার পেটে ঢুকে গেল এবং এ দুধ (আমার পেট থেকে) বের করার আর কোনো সুযোগ থাকল না, তখন শয়তান আমার থেকে দূরে সরে গিয়ে বলতে লাগল, 'তোমার ধ্বংস হোক, তুমি একি করেছ! রাসুলের দুধ পান করে ফেলেছ? তিনি জাগ্রত হয়ে যখন তা পাবেন না, তখন তোমার উপর বদ দোয়া করবেন। এতে তোমার সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং তোমার ইহকাল ও পরকাল নিঃশেষ হয়ে যাবে! আমার সাথিদ্বয় তো নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল। তারা তো আমার মতো কাজ করেনি। কিন্তু আমার আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। অতঃপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করে যেভাবে সালাম করতেন, সেভাবেই সালাম করলেন এবং মসজিদে এসে নামাজ আদায় করলেন। এরপর দুধের নিকটে এসে ঢাকনা খুলে সেখানে কিছুই পেলেন না। তখন তিনি নিজ মাথা আকাশের দিকে তুললেন। আমি তখন (মনে মনে) বললাম—এখনই হয়ত আমার বিরুদ্ধে দোয়া করবেন, আর আমি নিঃশেষ হয়ে যাব। তখন তিনি বললেন, اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي 'হে আল্লাহ, যে লোক আমার খাবারের ব্যবস্থা করে আপনি তার খাদ্যের ব্যবস্থা করুন। আর যে আমাকে পান করায়, আপনি তাকে পান করান।'

মিকদাদ রাযি. বলেন, তখন আমি চাদরটি নিয়ে গায়ে বাঁধলাম এবং একটি ছুরি নিলাম, অতঃপর (এই ভেবে) বকরিগুলোর কাছে গেলাম—এদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বেশি মোটাতাজা সেটিই রাসুলের জন্য জবাই করব। সেখানে গিয়ে দেখলাম, সেটি দুধে পরিপূর্ণ এবং অন্যান্য সব বকরিও দুধে পরিপূর্ণ। অতঃপর আমি একটি বাসন নিয়ে এলাম এবং দুধ দোহন করলাম। একসময় বাসনের উপরের অংশে ফেনা ভেসে উঠল। অতঃপর আমি রাসুলের নিকট আগমন করলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি রাত্রের দুধ পান করেছ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি পান করুন। তিনি পান করে আমাকে দিলেন। আমি যখন বুঝতে পারলাম—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিতৃপ্ত হয়ে গেছেন এবং আমি তার নেক দোয়া পেয়ে গেছি, তখন আমি খুশিতে হাসতে হাসতে মাটিতে নুয়ে পড়লাম।[১]

এই হাদিসে সুস্পষ্ট এসেছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার কামনা করে এই দোয়াটি করেছিলেন। আর তার দোয়া শুনেই মিকদাদ রাযি. দুধ

১. *সহিহ মুসলিম: ২০৫৫; মুসনাদে আহমদ: ২৯/২২৯*

দোহন করে নিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য অর্থের ব্যাপকতার প্রতি লক্ষ করে কেউ আহার বা পান করালেও এই দোয়াটি বলা যেতে পারে। এটিই এই দোয়ার মূল ক্ষেত্র নয়। এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেওয়ার জন্যই এই লেখাটির আয়োজন।

* * *

দাওয়াত খাওয়ার পরের দোয়া এবং একটি অস্পষ্টতা নিরসন

أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ

'রোজাদারগণ আপনাদের কাছে ইফতার করুক, নেককার লোকেরা আপনাদের খাবার খাক, আর ফেরেশতারা আপনাদের জন্য দোয়া করুক।'

'কারও বাড়িতে দাওয়াত খেলে মেজবানের জন্য যে দোয়া করবে'—এই শিরোনামে উপরোক্ত দোয়াটি উল্লেখ করা হয়। কিন্তু আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারও ঘরে ইফতার করলে এই দোয়া পড়তেন। হযরত আনাস রাযি. বলেন, তিনি যখন কারও ঘরে ইফতার করতেন, তখন এই বলে দোয়া করতেন— أفطر عندكم الصائمون...।[১]

দোয়াটির অর্থের দিকে তাকালেও বোঝা যায়—কারও ঘরে ইফতার করার সময় দোয়াটি পড়া উচিত। ইমাম নববি রহ. তার *আল-আযকার* গ্রন্থে (পৃ. ১৬২) এই দোয়ার শিরোনাম দিয়েছেন—'কারও ঘরে ইফতার করলে যা পড়বে।'

তবে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত অপর হাদিসে এসেছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযি. এর কাছে এলে তিনি নবিজির জন্য রুটি ও তেল নিয়ে এলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আহার করে দোয়াটি পড়লেন।[২]

---

১. *মুসনাদে আহমদ*: ২০/৩৬৭; *আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ*, ইবনে সুন্নি: ৪৮২; *আদ-দোয়া*, তাবারানি: ৯২৩; (হাদিসটি নির্ভরযোগ্য)।

2. হযরত আনাস রাযি. থেকে অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাদ ইবনে উবাদা রাযি. এর কাছে এলে তিনি তার জন্য রুটি ও তেল নিয়ে এলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা খেলেন অতঃপর বললেন: أكل طعامكم الأبرار...। *মুসনাদে আহমদ*: ১৯/৩৯৭; *সুনানে আবু দাউদ*: ৩৮৫৪; বাইহাকি, *কুবরা*: ৪/২৩৯ (হাদিসটি সহিহ)

এখানে সাদ রাযি. এর ঘরে ইফতার করে দোয়াটি পড়েছেন বলে হাদিসে উল্লেখ হয়নি। বোঝা গেল, ইফতার ছাড়াও কারও ঘরে আহার করলে মেজবানের জন্য এই দোয়া করা উচিত। এ কারণেই নববি রহ. তার 'আল-আযকারে'র অপর স্থানে (পৃ. ২০৩) দোয়াটির শিরোনাম দিয়েছেন—'আহার শেষে মেজবানের জন্য দোয়া।' বোঝা গেল—দোয়াটি উভয় স্থানেই পড়া যায়।

* * *

ইফতারের কয়েকটি দোয়া ও আমাদের ভ্রান্তি

এক.

يَا واسع الفضل اغْفِرْلِي

'ইয়া ওয়াসিয়াল ফাযলি, ইগফির লি'

ইফতারের আগের এই দোয়াটি বেশ প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই বাক্যে দোয়াটি হাদিসের কিতাবে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে— يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْ لِي (ইয়া ওয়াসিয়াল মাগফিরতি! ইগফির লি)। কিন্তু এটিও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত কোনো দোয়া নয়। বরং ইবনে উমর রাযি. ইফতারের সময় এভাবে দোয়া করতেন। *মুজামু ইবনে আরাবি*তে (হাদিস নং ৩৪৯) বর্ণিত হয়েছে, ইবনে উমর রাযি. ইফতারের সময় বলতেন— يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْلِي।[১]

অবশ্য ইবনে মুবারক রহ. তার *আয-যুহদ* গ্রন্থে (১০৯৭) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মুরসাল বর্ণনা হিসেবে এটি (অর্থাৎ 'ইয়া ওয়াসিআল মাগফিরাতি ইগফির লি') উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বর্ণনার রাবি হচ্ছেন হারিছ ইবনে উবাইদা, যিনি অত্যন্ত দুর্বল। তা ছাড়া তার থেকে বর্ণনাকারী রাবি হচ্ছেন বাকিয়্যা ইবনে ওয়ালিদ। আর তার ক্ষেত্রে রিজাল শাস্ত্রের ইমামদের বক্তব্য হচ্ছে—শুধু নির্ভরযোগ্য রাবি থেকে বর্ণনা করলেই তার রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং তার এই রেওয়ায়াতটি গ্রহণযোগ্য নয়।[২]

তবে মনে রাখতে হবে—পুরো রমজান মাসেই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন এক হাদিসে

১. হাদিসটির সনদ হাসান
২. *তাহযিবুত তাহযিব*: ১/২৩৯

এসেছে, আয়িশা রাযি. বলেন, যখন রমজান মাস এল, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, রমজান মাস এসেছে আমি কী বলব? তিনি বললেন, তুমি বলো— اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ (হে আল্লাহ, আপনি অধিক ক্ষমাশীল। ক্ষমা পছন্দ করেন। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন)।[১]

তা ছাড়া সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। সুতরাং ইফতারের সময় যে কোনো দোয়াই করা যায়। আর তখন ক্ষমা প্রার্থনার বাক্য হিসেবে— يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اغْفِرْلِيْ যেমন বলা যায়, তেমনিভাবে يَا واسع الفضل اغْفِرْلِيْ। বলতেও কোনো অসুবিধা নেই।

আমার আলোচনা কেবল লোকমুখে প্রসিদ্ধ এই শেষোক্ত দোয়ার বাক্যটি মাছুর তথা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা কোনো সাহাবি থেকে বর্ণিত কিনা, তা নিয়ে। আর উপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট—এটি মাছুর কোনো দোয়া নয়।

দুই.

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার উদ্দেশ্যেই রোজা পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিজিক দ্বারাই ইফতার করেছি।'[২]

এই দোয়াটি আমাদের সমাজে ইফতারের দোয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ। সাধারণত এটি ইফতারের আগেই পড়া হয়। অথচ হাদিসের অর্থের দিকে তাকালেই বোঝা যায়—এটি ইফতারের পরে পাঠ করার দোয়া। তা ছাড়া হাদিসের বাক্যের প্রতি লক্ষ করুন:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

ইবনে মালিক রহ. বলেন, হাদিসে উল্লেখিত كَانَ إِذَا أَفْطَرَ। অর্থ قرأ بعد الإفطار অর্থাৎ দোয়াটি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার শেষে পড়তেন।[৩] ইবনে হাজার মাক্কি রহ.-ও একই কথা বলেছেন।[৪]

---

১. *আদ-দোয়া*, তাবারানি: ৯১৫ (সনদ হাসান)
২. *সুনানে আবু দাউদ*: ২৩৫৮; *সুনানে কুবরা*, বাইহাকি: ২/৪৩৯ (হাসান)
৩. *আওনুল মাবুদ*: ৬/৪৮২
৪. *তুহফাতুল মুহতাজ*, ১/৬৩১

সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট—এটি ইফতারের আগে পাঠ করার দোয়া নয়; বরং ইফতার শেষে পাঠ করার দোয়া।

তিন.

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

'পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, শিরা-উপশিরাগুলো সিক্ত হয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ প্রতিদানও নির্ধারিত হয়েছে।'[১]

এই দোয়াটিও সাধারণত ইফতারের আগে পাঠ করা হয়, অথচ এটিও ইফতার শেষে পাঠ করার দোয়া। হাদিসে এসেছে—كَانَ إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ... অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফতার শেষে এই দোয়া পড়তেন।[২] তা ছাড়া দোয়ার অর্থের দিকে তাকালেও বিষয়টি সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

* * *

রজব মাসসংক্রান্ত একটি দোয়া ও কিছু কথা

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

'হে আল্লাহ, রজব ও শাবানে আপনি আমাদের বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান পর্যন্ত পৌঁছে দিন।'

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত— রজব মাস যখন প্রবেশ করত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা...'

হাদিসটি মুসনাদে আহমদ ১/২৫৯-৪/১৮০; মুসনাদে বাযযার (*কাশফুল আসতার*, হাদিস – ৬১৬); *আমালুল-ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ*, ইবনুস সুন্নি, হাদিস - ৬৫৯; *তাবারানি আউসাত*: ৪/৩৯৩৯; *শুআবুল ঈমান বাইহাকি*, হাদিস - ৫/৩৫৩৪-এ বর্ণিত হয়েছে।

হাদিসের সনদে 'যাইদাহ ইবনে আবির রিকাদ' এবং 'যিয়াদ ইবনে আবদুল্লাহ আন-নুমাইরি' নামক দুজন দুর্বল বর্ণনাকারী থাকার কারণে মুহাদ্দিসিনে কেরাম উক্ত হাদিসের সনদকে দুর্বল বলেছেন। আল্লামা ফাত্তানি রহ. (৯৮৬ হি.) হাদিসের

---

১. ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত— নবিজি ইফতারের সময় বলতেন—ذَهَبَ الظَّمَأُ...। (*সুনানে আবু দাউদ*: ২৩৫৭; *আমালুল-ইয়াউমি ওয়াল-লাইলাহ*: ৪৭৯; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ১/৪২২)

২. *আওনুল মাবুদ*: ৬/৪৮২

সনদকে দুর্বল উল্লেখ করে বলেন, ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদিসের উপর আমল করা জায়েজ আছে।'[১]

হাদিসটি দীর্ঘ পর্যালোচনার দাবি রাখে। সংক্ষেপে আমাদের মনে রাখতে হবে—হাদিসটির সনদ যদিও দুর্বল, কিন্তু এই দোয়াটির অর্থ সুন্দর। এতে মুনকার তথা আপত্তিজনক কিছু নেই। আর বরকতময় সময়ে মৃত্যু কামনা করা, যা এই দোয়ার মূল প্রতিপাদ্য, এটি সালাফ থেকে প্রমাণিত। সুতরাং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত—এই বিশ্বাস না রেখে সুন্দর অর্থবোধক এই দোয়াটি পাঠ করতে কোনো বাধা নেই।

এ প্রসঙ্গে ইবনে রজব হাম্বলি রহ. বলেন, 'নেককাজ করার উদ্দেশ্যে মহিমান্বিত সময়গুলো পর্যন্ত বেঁচে থাকার দোয়া করা মুস্তাহাব, উক্ত হাদিসে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা মুমিনের জীবন তার কল্যাণই বৃদ্ধি করে, আর মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো সেই, যার জীবন বৃদ্ধির সাথে সাথে আমলও সুন্দর হয়।'

তিনি আরও বলেন, 'পূর্বসূরিগণ নেককাজ, যেমন রমজানের রোজা বা হজ করে এসে মৃত্যুবরণ করা পছন্দ করতেন। বলা হত, যে ব্যক্তি এভাবে (অর্থাৎ অমুক নেককাজ করে) মৃত্যুবরণ করবে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। কোনো এক নেককার আলেম রজব মাস আসার পূর্বে অসুস্থ হয়ে বললেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি রজব মাস পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু পিছিয়ে দেন। আল্লাহ পাক তাকে সে-পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, আর তিনি রজব মাসেই মৃত্যুবরণ করলেন।'[২]

* * *

ইস্তেখারা ও আমাদের সমাজ

ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগে মক্কার কাফেররা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন ক্রয়বিক্রয়, বিয়েশাদি, সফর ইত্যাদিতে তির দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করত। নিজেদের কল্যাণ-অকল্যাণ তারা তির দিয়েই নির্ধারণ করত। তিনটি তির নিয়ে একটিতে লিখত—'আমার রব আদেশ করেছেন'; আরেকটিতে লিখত—'আমার রব নিষেধ করেছেন'; আরেকটি খালি রাখত। অতঃপর যেটি হাতে উঠত, সে-অনুযায়ী তারা আমল করত। আদেশসূচকটি উঠলে কাজ করত, নিষেধসূচকটি উঠলে বিরত থাকত, আর তৃতীয়টি উঠলে আবার লটারির ব্যবস্থা করত।

---

১. *তাযকিরাতুল মওযুআত*, ফাত্তানি: পৃ. ১১৭

২. *লাতাইফুল মাআরিফ*, পৃ. ২৩৪

এই ছিল জাহিলি যুগের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ণয়ের পদ্ধতি; যা ছিল সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং আল্লাহর উপর অপবাদ দেওয়ার শামিল। কেননা তারা ধরে নিত—এটা আল্লাহ তায়ালার আদেশ এবং ওটা তার নিষেধ; অথচ তিনি এমন আদেশ-নিষেধ জারি করেননি। এর পরিবর্তে মুসলমানদের কল্যাণ কামনার বাস্তবসম্মত একটি পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দেখুন, সেই পদ্ধতিটি কী।

'সহিহ বুখারি' (হাদিস - ১১৬৬) সহ হাদিসের অসংখ্য কিতাবে হযরত জাবির রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনভাবে ইস্তেখারা শিক্ষা দিতেন, যেমনভাবে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার মনস্থ করে, সে যেন দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এই দোয়া পাঠ করে:—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট আপনার ইলমের দ্বারা কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের উসিলায় কাজে শক্তি চাচ্ছি এবং আপনার বিশাল অনুগ্রহ চাচ্ছি। কেননা আপনি সক্ষম, আমি অক্ষম। আপনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, আমি অনবগত। আপনিই অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি এ কাজ আমার দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণামের দিক থেকে কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারণ করুন। আর তা সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সহজ করুন। অতঃপর তা আমার জন্য বরকতময় করুন। আর যদি এ কাজ আমার দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণামের দিক থেকে ক্ষতিকর হয়, তবে এটাকে আমার থেকে দূরে রাখুন, এবং আমাকেও এটা থেকে দূরে রাখুন। আর যাতে কল্যাণ রয়েছে, তারই তাওফিক আমাকে দান করুন, এবং এর উপরই আমাকে সন্তুষ্ট করে দিন।'

হাদিসে উল্লিখিত ইস্তেখারার সারকথা হল, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে দুই রাকাত নামাজ পড়বে, অতঃপর উপরোক্ত দোয়া পড়বে। এখন প্রশ্ন হল নামাজ এবং দোয়ার পর কী করবে? এ ব্যাপারে কেউ কেউ বলেছেন, মন যেদিকে সায় দেবে, তাই করবে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়াতও আছে। তবে হাফিজ ইবনে হাজার রহ. বলেছেন, রেওয়ায়াতটি অত্যন্ত দুর্বল।

সঠিক হল, অপর বর্ণনায় যে يعزم এসেছে এর উপর আমল করবে। অর্থাৎ যে কাজ করার ইচ্ছা, তা শুরু করে দেবে। (কেননা সে তো তার দোয়ায় বলেছে, কল্যাণ থাকলে যেন কাজটি সম্পাদিত হয় আর অকল্যাণ থাকলে আল্লাহ তায়ালা যেন ওই কাজ থেকে দূরে রাখেন। সুতরাং সে নামাজ ও দোয়ার পর কাজ শুরু করে দেবে। যদি অকল্যাণ থাকে, তাহলে কাজটি সম্পাদিত হবে না ইনশাআল্লাহ)।

তবে মনে রাখতে হবে—ওয়াজিব, সুন্নত, কিংবা হারাম কাজের জন্য ইস্তেখারা করার কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়া সকল বৈধ কাজের জন্যই ইস্তেখারা করা যায়।

কখনও এমন হতে পারে—কেউ রাস্তায় থাকার কারণে কিংবা অন্য কোনো ব্যস্ততার কারণে হয়ত নামাজ পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, অথচ তাৎক্ষণিক একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তখন কীভাবে ইস্তেখারা তথা কল্যাণ কামনা করবে। হাদিস শরিফে বিষয়টি সহজ করে দেওয়া হয়েছে। *সুনানে তিরমিজি*তে হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো কাজের ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন—اللهم خرلي واختر لي। 'ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য উপযোগী বিষয়টি নির্বাচন করুন এবং এতে কল্যাণ দান করুন।' [1]

অথবা বলবে—اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي 'হে আল্লাহ, আপনি সঠিক বিষয়টি আমার অন্তরে ঢেলে দিন এবং নফসের অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচান।'[২]

সুতরাং কেউ যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছা করবে, তখন এই দোয়াগুলো পড়তে থাকবে, অতঃপর কাজ শুরু করে দেবে। এই হচ্ছে ইস্তেখারার প্রকৃতি। সহজে আদায়যোগ্য আমল।

আমাদের সমাজে ইস্তিখারা সম্পর্কে কিছু দুঃখজনক বিভ্রান্তি দেখা যায়। অনেকের ধারণা—ইস্তেখারার মাধ্যমে যেন অদৃশ্যের সংবাদ জানা যায়! কারও সন্তান হচ্ছে না, অথবা কোনো মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না, বা কেউ এ জাতীয় কোনো জটিলতায় পড়ে গেছে, তখন সে কোনো আলেমকে বলছে, 'হুজুর একটু ইস্তেখারা করে দেখুন তো কী হয়েছে—আমার মেয়ের বিবাহ হচ্ছে না কেন, কেউ কি জাদুটাদু করেছে!'

---

১. *সুনানে তিরমিজি*: ৩৫১৬; *মুসনাদে বাযযার*: ৫৯; *মুসনাদে আবু ইয়ালা*: ৪৪ (হাদিসটি যদিও সনদের বিচারে দুর্বল, কিন্তু এমন দুর্বল হাদিস ফাযায়েলের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য)

২. *সুনানে তিরমিজি*: ৩৪৮৩ (ইমাম তিরমিজি বলেন, হাদিসটি হাসান)

আবার কারও কারও ধারণা—ইস্তেখারার জন্য ঘুমাতে হবে, এরপর স্বপ্নে এভাবে দেখলে কাজটি করবে, ওইভাবে দেখলে কাজটি করবে না। আবার অনেকে মনে করেন— ইস্তেখারা আমাদের মতো সাধারণদের কাজ নয়। কোনো বুজুর্গকে দিয়ে করাতে হবে। এসবের কিছুই হাদিসে বর্ণিত হয়নি। বরং এগুলো বিভিন্ন মাশায়েখ থেকে বর্ণিত। এগুলো অবৈধ বা গুরুত্বহীন নয়, কিন্তু হাদিসের বর্ণনা ও নির্দেশনার সঙ্গে আমলের ক্ষেত্রে বুজুর্গদের অভিরুচির পার্থক্য যেন আমাদের জানা থাকে। বুজুর্গদের থেকে যা বর্ণিত— এগুলোকে হাদিসের মতো সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা যাবে না।

হযরত থানবি রহ. তার *বাওয়াদিরুন নাওয়াদির* গ্রন্থে (২/৪৬৪) বলেন, 'ইস্তেখারা কল্যাণ কামনার নাম; এটা 'ইস্তেখবার' তথা জিজ্ঞাসাবাদ নয়। সুতরাং নামাজ এবং দোয়ার পর যে কাজ করার ইচ্ছা, তা শুরু করে দেবে। স্বপ্নে কিছু দেখার প্রয়োজন নেই।'

* * *

খতমে আম্বিয়া ও আমাদের ভ্রান্তি

ফাজায়েলে আমল গ্রন্থে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে—

শায়খ আবু ইয়াযিদ কুরতুবি রহ. বলেন, 'আমি শুনেছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, সে দোজখের আগুন হতে নাজাত পেয়ে যায়। এই খবর শুনে আমি এক নেসাব অর্থাৎ সত্তর হাজারবার আমার স্ত্রীর জন্য পড়লাম এবং কয়েক নেসাব আমার নিজের জন্য পড়ে আখেরাতের সম্বল করে রাখলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকত, যার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল—তার কাশফ হয় এবং সে জান্নাত-জাহান্নামও দেখতে পায়। কিন্তু এর সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। হঠাৎ একদিন সে চিৎকার দিয়ে উঠল, এবং তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম তখন। সে বলতে লাগল—আমার মা দোজখে জ্বলছে। আমি তার অবস্থা দেখতে পেয়েছি। কুরতুবি রহ. বলেন, আমি তার অস্থির অবস্থা লক্ষ করছিলাম। আমার খেয়াল হল, একটি নেসাব তার মায়ের জন্য বখশিয়ে দিই, যার দ্বারা তার সত্যতার ব্যাপারেও পরীক্ষা হয়ে যাবে। আমি মনে মনে আমার পড়ে রাখা নেসাবসমূহ থেকে একটি নেসাব তার মায়ের জন্য বখশিয়ে দিলাম, যা

আল্লাহ ছাড়া কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু ওই যুবক তৎক্ষণাৎ বলতে লাগল—চাচা, আমার মা দোজখের আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছেন।'[১]

সম্ভবত এই ঘটনা থেকেই আমাদের সমাজে কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য খতমে আম্বিয়া, অর্থাৎ সত্তর হাজারবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। এমনকি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত মাছুর আমলের চেয়েও এই খতমে আম্বিয়াকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তবে চিন্তা করার বিষয় হল, ঘটনায় বর্ণিত এ ধরনের কাশফ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়কে সুন্নাহসম্মত আমলের উপর প্রাধান্য দেওয়ার কোনো সুযোগ কি আছে? তা ছাড়া এ ধরনের কাশফ যে হয়েছে, এর প্রমাণ কী? যে ঘটনা আমরা উপরে উল্লেখ করলাম, এরও কি কোনো সনদ আছে? আর সনদ থাকলেও তা কতটুকু নির্ভরযোগ্য?[২] তা ছাড়া কাশফ কিংবা বুজুর্গদের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাবলির মর্যাদা শরিয়তে কতটুকু গুরুত্ব বহন করে—তা কারও অজানা থাকার কথা নয়। পরন্তু খতমে আম্বিয়ার এই আমল রাসুল, সাহাবি, তাবেঈ, কারও থেকেই বর্ণিত নেই।

কেউ মৃত্যুবরণ করলে সুন্নাহর অনুসরণ করে দোয়া, ইস্তেগফার, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা কারও ঈসালে সাওয়াব করতে পারি। কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আমল ছেড়ে এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া কিংবা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত আমলের তুলনায় এগুলোকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা কখনোই কাম্য হতে পারে না। কেউ যদি এ ধরনের আমল করেনও, তা হলে যেন এগুলোকে দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখেন। কোনোক্রমেই যেন সুন্নাহ বহির্ভুত আমলকে সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেওয়া না হয়; কিংবা মুখে না বললেও কার্যত যেন সুন্নাহ বহির্ভুত আমলকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া না হয়।

---

১. *ফাযায়েলে আমাল*, কান্ধলভি, পৃ. ৪৪১

২. এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য সামনে বিবিধ আলোচনায় 'জাল ঘটনা এবং আমাদের অসতর্কতা' শিরোনামের লেখাটি পড়ুন।

দরুদ

দরুদে মাছুর ও আমাদের ভ্রান্তি

আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা তার প্রতি সালাত পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।' (সুরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

এই আয়াত শুনে সাহাবিগণ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন—আল্লাহর রাসুল! আপনার শানে কীভাবে দরুদ পাঠ করব?

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তার প্রতি দরুদ পাঠের পদ্ধতি জানিয়ে দিয়ে গেছেন। হাদিস-গ্রন্থের পাশাপাশি দরুদ ও সালাম সম্পর্কে রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলিতে রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া দরুদগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ হয়েছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত এ সকল দরুদ আমরা সময়ে-সুযোগে পড়ব। তবে সময় কম থাকলে বা বার বার তার নাম উল্লেখিত হলে, আমরা সংক্ষেপে ছোট কোনো দরুদ পড়ে নিতে পারি। বিভিন্ন কিতাবাদিতে; বিশেষত হাদিসের কিতাবাদিতে রাসুলের নামের সাথে সংক্ষেপে عليه الصلاة والسلام এবং صلى الله عليه وسلم লেখা হয়ে থাকে। নবিজির নাম শুনে আমরা এভাবেও দরুদ পাঠ করতে পারি। অথবা সংক্ষেপে এভাবে বলতে পারি اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ । তেমনিভাবে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়; বরং কোনো আলেম বা বুজুর্গ তৈরি করেছেন, যার অর্থ সুন্দর এবং তাতে নবিজির শানের খেলাফ কোনো কিছু নেই, সময়ে-সুযোগে এ ধরনের দরুদও আমরা পড়তে পারি।

তবে লক্ষ রাখতে হবে—গাইরে মাছুর দরুদকে (নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নয়) দরুদে মাছুর (যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

থেকে বর্ণিত) এর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বিভিন্ন সময় দেখা যায়—কোনো বিশেষ দরুদ, যে দরুদের সম্পর্কে কথিত আছে—অমুক বুজুর্গ স্বপ্নে এই দরুদটি পেয়েছেন বা কোনো ওলি-বুজুর্গ এটা তৈরি করেছেন, এমন দরুদকে খুবই গুরুত্বের সাথে পড়া হয়। অথচ হাদিসের কিতাবাদিতে থাকা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখিয়ে দেওয়া দরুদ আমাদের সামনেই রয়েছে, কিন্তু এগুলোকে সেরকম গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এটা খুবই দুঃখজনক।

আল্লাহর ঘোষণা—'হে মুমিনগণ, তোমরা তার প্রতি সালাত পাঠাও এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও।' —এই ঘোষণা পেয়ে সাহাবিগণ রাসুলকে জিজ্ঞেস করেছেন—'আমরা কীভাবে দরুদ পাঠ করব?' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন—'এভাবে পড়ো, এভাবে বলো।' এরপরও রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া সেই দরুদগুলোর চেয়ে অন্যগুলোকে (মুখে না বললেও) কার্যত উত্তম মনে করছি! এটা কখনও কাম্য হতে পারে না। রাসুলের শিখিয়ে দেওয়া দরুদ রেখে দরুদে তাজ, দরুদে মাহি, দরুদে তুনাজ্জিনা—এগুলো নিয়ে ব্যস্ত হওয়া একটি বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি!

আমাদের অবশ্যই দরুদে মাছুরগুলো শিখতে হবে এবং এগুলোই বেশি বেশি পড়তে হবে। এগুলোকেই সকল 'গাইরে মাছুর' দরুদের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদের তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

এটা কি দরুদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি?

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কীভাবে দরুদ পড়তে হবে; দরুদ পাঠের আদব কী হবে—এটি কমবেশি সবারই জানা থাকার কথা। কিন্তু আফসোসের কথা হল, আমরা এ সকল আদবের প্রতি কোনো খেয়াল তো করিই না, উপরন্তু নিজেদের পক্ষ থেকে দরুদ পাঠের এমন সব পদ্ধতি নির্ণয় করে নিয়েছি, যেগুলো না সাহাবাদের যুগে ছিল, আর না তাবেয়ি-তাবে তাবেয়িদের যুগে ছিল, আর না পরবর্তী আলেমদের পদ্ধতি ছিল। এতে আমরা দরুদ পাঠের মতো অতি সাওয়াবের কাজকেও বেদআতে রূপান্তরিত করে ফেলছি; অথচ এ ব্যাপারে আমাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। আমাদের অবস্থা তাদের মতো হয়ে যাচ্ছে, যাদের ব্যাপারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

'তারা সেইসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সমস্ত দৌঁড়ঝাপ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, অথচ তারা মনে করে—তারা খুবই ভালো কাজ করছে।' (সুরা কাহফ, আয়াত ১০৪)

দরুদ পাঠের ভুল পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা হাসকাফি রহ. (১০২৫-১০৮৮ হি.) আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়িয়ে উঁচু আওয়াজে দরুদ পড়া মূর্খতা। কেননা এটা তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দোয়া। আর দোয়া উঁচু আওয়াজ ও নিচু আওয়াজের মাঝামাঝি হয়ে থাকে।'[১]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা.বা. এ সংক্রান্ত এক আলোচনায় বলেন, 'দরুদ শরিফ বেশি বেশি পড়া অনেক উত্তম কাজ। কিন্তু প্রতিটি কাজ আল্লাহ ও তার রাসুলের নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত পছন্দনীয় থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত এটা তাদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে হয়। কোনো কাজের ক্ষেত্রে যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো পদ্ধতি তৈরি করে সে-অনুযায়ী কাজ করা হয়, তাহলে এতে আল্লাহ ও তার রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না। দরুদ পাঠের ক্ষেত্রেও আজকাল এমন অনেক পদ্ধতি চালু হয়েছে, যা আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশিত পদ্ধতি নয়, বরং আমাদের নিজেদের তৈরি। এমতাবস্থায় মানুষ মনে করবে—আমি তো ভালো কাজ করছি এবং নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বতের প্রকাশ করছি; অথচ আমার দরুদ পড়ার পদ্ধতি আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশিত পন্থায় না হওয়ার কারণে কোনো ফায়দা হবে না।'

তিনি বলেন, 'আজকাল দরুদ-সালাম প্রেরণের উদ্দেশ্য হল, দরুদ-সালামের প্রদর্শনী করা। যেমন অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে লাউড স্পিকার দিয়ে সুন্দর সুরে উঁচু আওয়াজে الصلاة والسلام عليك يا رسول الله বলাকে তারা মনে করে দরুদ-সালাম প্রেরণের পদ্ধতি এটাই। তাই কেউ যদি নির্জনে বসে দরুদ-সালাম পাঠ করে, এটাকে সঠিক মনে করা হয় না, এর মূল্যায়ন করা হয় না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম থেকে কোথাও এই প্রচলিত পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায় না; অথচ তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দরুদের বাস্তব নমুনা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ পাঠ করতেন।

---

১. *আদ-দুররুল মুখতার: ২/২৩২*

লক্ষ করুন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরুদ পাঠের যে পদ্ধতি বলে গেছেন, এরচেয়ে ভালো কোনো পদ্ধতি হতে পারে না। পদ্ধতিটি হল, এক সাহাবি জানতে চাইলেন—আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি দরুদ পাঠানোর পদ্ধতি কী? উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'দরুদে ইবরাহিমি' উল্লেখ করে বললেন, 'এই পদ্ধতিতে দরুদ পাঠ করো।'

আরও লক্ষ করুন, আল্লাহ পাক দরুদ শরিফকে নামাজের একটি অংশ বানিয়েছেন। কিন্তু নামাজে সুরা ফাতেহা দাঁড়িয়ে পড়া হয়, অন্য সুরাও দাঁড়িয়ে পড়া হয়, কিন্তু দরুদ পাঠের সময় এলে বলা হল, তাশাহহুদের পরে আদবের সাথে বসে প্রশান্তচিত্তে হুজুরের প্রতি দরুদ পড়ো।

এমনিতে দরুদ শরিফ দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে সর্বাবস্থায় পড়া জায়েজ, তবে এগুলো থেকে কোনো একটি পদ্ধতিকে নির্ধারণ করে ফেলা; আর এ সম্পর্কে এই দাবি করা—এটা অন্যান্য পদ্ধতির চেয়ে বেশি উত্তম—এর কোনো ভিত্তি নেই; এটা নিঃসন্দেহে ভুল। আর পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে যখন দরুদ পাঠের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হওয়ার আকিদাও যুক্ত হয়ে গেল, তখন বিষয়টি আরও গর্হিত হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, রাসুল উপস্থিত হলে তার সম্মানার্থে আমাদের দাঁড়ানো উচিত, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হন, এ কথা কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত? কুরআনের কোনো আয়াতে আছে? না হাদিসে আছে? না কোনো সাহাবির বক্তব্য দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত?

মূলত কোথাও এর কোনো প্রমাণ নেই।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ তায়ালার এমন কিছু ফিরিশতা আছেন, যারা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করেন। তাদের কাজ হল, আমার উম্মতের মধ্যে যেই আমার প্রতি দরুদ ও সালাম পড়বে, তা আমার কাছে পৌঁছানো।'

এই হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ফেরেশতাগণ আমার কাছে দরুদ ও সালাম পৌঁছান, কিন্তু কোনো হাদিসেই বলেননি—যেখানেই দরুদ পড়া হয়, আমি সেখানে পৌঁছে যাই। সুতরাং এই ধারণা করা যে, আমরা যখন এখানে বসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে দরুদ পাঠ করব, আর তিনি তা গ্রহণ করার জন্য নিজেই এখানে আসবেন। আর যেহেতু তিনি এসে আমাদের মাহফিলে উপস্থিত হন, তাই তার সম্মানে আমরা দাঁড়িয়ে যাই, এমন ধারণা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানের সঙ্গে বেমানান। আল্লাহ পাক

আমাদের নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরিফকে তার সকল আদবসহ আদায় করার তাওফিক দান করুন, আমিন।[১]

* * *

দরুদ পাঠে বা লেখায় বিকৃতি নবি-প্রেমিকের কাম্য নয়

দরুদ শরিফ পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ধীরে ধীরে পাঠ করা উচিত। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে চরম অবহেলার শিকার। আমাদের কেউ কেউ 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এর স্থলে 'সালাল্লাহু ওয়া সালাম' পড়ি, আবার কেউ 'সাল্লাই সালাম' আবার কেউ অন্য কোনোভাবে বিকৃত করে পড়ি। এটা নবিজির শানে চরম বেয়াদবি। আমরা কি কখনও আমাদের কোনো প্রিয়জনের নাম এভাবে নিই? নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা যার অন্তরে আছে, সে কখনও এমন অবহেলার সাথে দরুদ পড়তে পারে না।

সাধারণ শিক্ষিত আল্লাহওয়ালা এক ভাই এক ওয়াজ-মাহফিলে শরিক হয়েছিলেন। কিন্তু বক্তা যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরিফ অনীহার সাথে বিকৃত করে পড়লেন, তিনি সেখান থেকে উঠে এলেন। পরবর্তী সময়ে আমাকে বললেন, যে বক্তা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরিফ ভক্তির সাথে পড়ে না, বিকৃত করে পড়ে, তার ওয়াজ দ্বারা কতটুকু ফায়দা হবে?

এ প্রসঙ্গে আমার সম্মানিত উসতায মাওলানা আবদুল মালেক সাহেব দা. বা. খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'দরুদ শরিফও অত্যন্ত বরকতপূর্ণ আমল। দোয়ার বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে দরুদ শরিফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিক থেকে তা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত। দ্বিতীয়ত এর সম্পর্ক রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে, যাঁর হক মুসলমানদের উপর তাদের প্রাণের চেয়েও বেশি এবং যিনি আল্লাহ তায়ালার পরে আল্লাহর বান্দাদের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী। দরুদের মাধ্যমে তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা হয়। তাই এই আমল অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সঙ্গে আদায় করা উচিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ এক মজলিসে বার বার হলে মাসআলাগত দিক থেকে যদিও প্রতিবার দরুদ পড়া জরুরি নয়; বরং মুস্তাহাব,

---

১. *ইসলাহি খুতুবাত:* ৬/১০৭-১২২

কিন্তু এখানে বিষয়টি হল মহব্বতের। এজন্য মাশাআল্লাহ, মুসলিম উম্মাহ এই মুস্তাহাব আমলের বিষয়ে যত্নবান। কিন্তু এরপরও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কখনও কখনও উদাসীনতার শিকার হয়ে যায়। কেউ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে পাঠ করে, যেন তা একটি অতিরিক্ত বিষয়, এজন্য এত দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে তা পাঠ করা হয় যে, কিছু অক্ষর সঠিকভাবে উচ্চারিতই হয় না। এটা ঠিক নয়। দরুদকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করে আদায় করা উচিত।

লেখার ক্ষেত্রে দরুদ শরিফকে খুবই মজলুম বানানো হয়। কেউ শুধু (স.) লেখেন, কেউ লেখেন (দ.)। যেন এটা শুধু অতিরিক্ত বিষয়ই নয়, একটি বিপদ-ও বটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! প্রশ্ন এই যে, সম্পূর্ণ দরুদ লেখা হলে কতটুকু কালি বা কাগজ ব্যয় হবে? আহা! আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারতাম—এই ব্যয়টুকুই হতে পারে আমাদের সঞ্চয়। আমাদের দেশের এমন একজন আলেমে দ্বীনের নাম আমার জানা আছে, যিনি শুধু এজন্য কোনো প্রকাশককে তার কিতাব ছাপতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যে, তারা পূর্ণ দরুদের পরিবর্তে শুধু (দ:) ব্যবহার করতে চেয়েছিল। বলাবাহুল্য, এমন ব্যক্তিরাই হলেন আমাদের জন্য অনুসরণীয়।'[১]

সুতরাং এই আমল অত্যন্ত ভক্তি ও অনুরাগের সাথে আদায় করা উচিত। সহিহ-শুদ্ধভাবে আদায় করা উচিত। নামাজে পঠিত দরুদে ইবরাহিমির পর ছোট দরুদ হিসেবে صلى الله عليه وسلم দরুদটিই সবচেয়ে বেশি লেখা ও পাঠ করা হয়। কিন্তু অনেক মানুষকেই দেখা যায়, এই ছোট্ট দরুদটির প্রথম অংশ— صلى الله عليه وسلم সাল্লাল্লাহু (প্রথম লাম-এ যবর) কে সাল্লেল্লাহু (প্রথম ল্ল-তে এ কার দিয়ে অর্থাৎ প্রথম লামে যের দিয়ে) পড়ে থাকেন, যা সম্পূর্ণ ভুল। আর আমাদের দেশের প্রচলিত মিলাদ-মাহফিলে সুর করে সম্মিলিতভাবে যে দরুদ ও সালাম পাঠ করা হয়, সেক্ষেত্রে তো দরুদ শরিফকে বড়ই মজলুম বানানো হয়। এভাবে সুর করে সম্মিলিতভাবে দরুদ পাঠ করার বিধান কী, তা এখানকার আলোচনার বিষয় নয়। এখানকার আলোচ্য বিষয় হল, সেক্ষেত্রে দরুদ ও সালামের শব্দাবলির উচ্চারণের যে বেহাল দশা হয়, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেখানে জনসাধারণ يا نبي سلام عليك (ইয়া নাবি সালামুন আলাইক), صلوات الله عليك (সালাওয়াতুল্লাহি আলাইকা), وعلى آل سيدنا (ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা) প্রভৃতি বাক্যকে বিভিন্ন ভাবে বিকৃত করে পড়ে। এই ভুলগুলো নিছক উচ্চারণের ভুল নয়; বরং অমার্জনীয় বিকৃতি, যা

---

১. *প্রচলিত ভুল*, পৃ. ১৫৪; *মাসিক আল-কাউসার*, আগষ্ট-২০০৯, পৃ. ৩০

থেকে বেঁচে থাকা ফরজ। দরুদের মতো বরকত ও ফজিলতপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের আরও সচেতন হওয়ার এবং সহিহ-শুদ্ধভাবে সঠিক পন্থায় বেশি বেশি দরুদ পাঠ করার তাওফিক দিন। আমিন।[১]

* * *

জুমুআর দিনের বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দরুদ কি প্রমাণিত?

আমাদের সমাজে এই কথাটি বেশ প্রসিদ্ধ—জুমুআর দিন আসরের নামাজ পড়ে যে ব্যক্তি আশিবার বলবে,[২] 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা', তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আশি বছরের ইবাদতের সাওয়াব তার জন্য লেখা হবে।

এই মর্মে বা কাছাকাছি মর্মের কতিপয় রেওয়ায়াত আছে। রেওয়ায়াতগুলো শাস্ত্রীয় আলাপে আলোচনাযোগ্য। বিশেষত এই আমল নিয়ে সমাজে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি পরিলক্ষিত হয়। কেউ এই আমলকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কেউ আবার এই আমলের খুবই বিরোধিতা করে থাকেন। ফলত বিষয়টি পর্যালোচনার দাবি রাখে।

এই আমল সম্পর্কে একটি হাদিস কয়েকজন সাহাবি থেকে বর্ণিত হয়েছে—

এক. হাদিসটি হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং তার রেওয়ায়াতটি কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[3] 'আমার প্রতি দরুদ পড়া পুলসিরাতে নুর-স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আমার প্রতি আশিবার দরুদ পড়বে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করা হবে।'

হাদিসটি ইবনে শাহিনের *আত-তারগিব ফি ফাযাইলিল আমাল* (পৃ. ১৪), দারা কুতনির *আল-আফরাদ* (৫/১৮৬) এবং ইবনে বাশকুয়ালের *আল-কিরবাহ* গ্রন্থে (হাদিস - ১০৬) নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে—

---

১. *মাসিক আল কাউসার*, অক্টোবর-২০১৩, পৃ. ৩১

২. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ، وَعَلَى آلِه وَ سلم تَسْلِيمًا.

৩. ولفظه : الصَّلَاةُ عَلَيَّ نُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً، غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُ ثَمَانِينَ عَامًا.

عَوْن بْن عُمَارَةَ، عن سَكَن الْبُرْجُمِي، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عن أبي هريرة، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

উপরোক্ত সনদে কয়েকজন বর্ণনাকারীই দুর্বল।

* আলি ইবনে যায়েদ ইবনে জুদআন। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। অনেক মুহাদ্দিস ইবনে জুদআনকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। অবশ্য কোনো কোনো মুহাদ্দিস তাঁকে صدوق কিংবা صالح (নির্ভরযোগ্য) পর্যায়ের বর্ণনাকারী বলেছেন। অথবা দুর্বল সাব্যস্ত করলেও অতি দুর্বল বলেননি।[১] মুহাদ্দিসদের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—ইবনে জুদআনের দুর্বলতা মূলত হিফজের ক্রটির কারণে। এ ছাড়া শেষ জমানায় তার ‘এখতেলাত’ [২] হয়ে গিয়েছিল।

* উপরোক্ত সনদে আরেকজন দুর্বল বর্ণনাকারী হলেন হাজ্জাজ ইবনে সিনান। আযদি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, তিনি ‘মাতরুক’ (পরিত্যাজ্য তথা অতি দুর্বল রাবি)।[৩]

* সনদের আরেকজন দুর্বল রাবি হলেন, আউন ইবনে উমারা। অনেক মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। তবে ইবনে আদি রহ. তার সম্পর্কে বলেছেন, ‘দুর্বল হলেও তার হাদিস লেখা যায়।’ আর সাযি রহ. বলেছেন, ‘তার মধ্যে গাফলত (হাদিস সংরক্ষণে ক্রটি) রয়েছে, তবে সে সাদুক।’[৪]

হাফিজ ইবনে হাজার রহ. উপরোক্ত হাদিসকে ‘মুনকার’ (আপত্তিজনক ও অতি দুর্বল) বলেছেন। এ ছাড়াও অসংখ্য মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। দারা কুতনি রহ. তার ‘আল-আফরাদ’ গ্রন্থে (৫/১৮৬) বলেছেন, ‘এটি গরিব।’ হাফিজ ইবনে হাজার রাহি-ও ‘নাতাইজুল আফকার’ গ্রন্থে (৫/৫৬) এই হাদিসে গরিব উল্লেখ করে বলেন, ‘উক্ত হাদিসের চারজন (আউন, সাকান, হাজ্জাজ, আলি ইবনে যায়েদ) রাবিই দুর্বল।’

উপরে আমরা অনেক মুহাদ্দিসের বক্তব্য দেখলাম, যারা হাদিসটি দুর্বল মনে করেন। এর বিপরীত কোনো কোনো মুহাদ্দিস উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন। যেমন সুয়ুতি রহ. ‘আল-জামিউস সগির’ গ্রন্থে হাসান বলেছেন।[৫]

---

১. *আল-কামিল*, ইবনে আদি: ৬/৩৪৪; *আল-মুগনি*: ২/১৫; মিযানুল ইতিদাল:৫/১৫৬; *তাহযিবুত তাহযিব*: ৩/১৬২

২. এখতেলাত বলা হল বয়স বৃদ্ধি পাওয়া অথবা দৃষ্টিহীনতা অথবা নিজের কিতাব জ্বলে যাওয়া ইত্যাদি কারণে বর্ণনাকারীর হিফযে (স্মরণশক্তি) ক্রটি এসে যাওয়া।

৩. *আল-মুগনি*: ১/২২৫; *মিযানুল ইতিদাল*: ২/২০৩

৪. *আল-কামিল*: ৭/১০২; *মিযানুল ইতিদাল*: ৫/৩৬৯; *তাহযিবুত তাহযিব*: ৩/৩৩৯

৫. *ফায়যুল কাদির*: ৪/২৪৯

খ. হাদিসটি হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে—[১] 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে আশিবার আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।' জিজ্ঞেস করা হল, 'আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতি কীভাবে দরুদ পাঠ করব?' তিনি বললেন, "তোমরা বলো, 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসুলিকান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।"[২]

সাখাভি রহ. বলেন, 'ইরাকি রহ. এই হাদিসকে হাসান বলেছেন। তারও আগে আবু আবদুল্লাহ ইবনে নুমান এটিকে হাসান বলেছেন। তবে এটি পরীক্ষানিরীক্ষার মুখাপেক্ষী। আনাস রাযি. থেকেও অনুরূপ হাদিস উল্লেখ হয়েছে।'[৩] তেমনিভাবে আজলুনি রহ.-ও হাদিসটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন।[৪]

গ. ইবনে বাশকুয়ালের এক বর্ণনায় হাদিসটি হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে এভাবেও বর্ণিত হয়েছে[৫]—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আসরের নামাজ পড়ে, নিজ স্থান থেকে উঠার আগে আশিবার বলে—আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং তার জন্য আশি বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হয়।'

আল-কাউলুল বাদি গ্রন্থে (পৃ. ২৮৪) ইবনে বাশকুয়ালের উদ্ধৃতিতে দরুদটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে। তবে ইবনে বাশকুয়ালের দরুদ শরিফের গ্রন্থ 'আল-কিরবাহ ইলা রাব্বিল আলামিন'-এ রেওয়ায়াতটি আমি পাইনি।

ঘ. হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে হাদিসটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে[৬]—'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহিমকে তার

---

১. ولفظه : من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر الله له ذنوب ثمانين سنة، قيل يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي

২. *তাখরিজুল এহইয়া*, ইরাকি: ১/১৪০; *আল-কাউলুল বাদি*: পৃ. ২৮৫; *কাশফুল খাফা*, আজলুনি: ১/১৯৬ হাদিস - ৫০১

৩. *আল-কাউলুল বাদি*: পৃ. ২৮৫ *তাখরিজুল এহইয়া*, ইরাকি: ১/১৪০

৪. *কাশফুল খাফা*: ১/১৯৬

৫. ولفظه : من صلى صلاة العصر من يوم الجمعة فقال قبل أن يقوم من مكانه: (اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما) ثمانين مرة غفرت له ذنوب ثمانين عاما، وكتبت له عبادة ثمانين سنة.

৬. ولفظه : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، وموسى نجياً ، واتخذني حبيباً ، ثم قال وعزتي وجلالي لأوثرن حبيبي على خليلي ونجيي، فمن صلى علي ليلة جمعة ثمانين مرة غفرت له ذنوب مأتي عام متقدمة ومأتي عام متأخرة.

খলিল (বন্ধু) বানিয়েছেন। আর মুসাকে বানিয়েছেন নাজি (যার সাথে একান্তে কথা বলা হয়); আর আমাকে বানিয়েছেন হাবিব। এরপর বলেছেন, আমার সম্মান ও মর্যাদার শপথ! অবশ্যই আমি আমার হাবিবকে আমার খলিল ও নাজির উপর প্রাধান্য দেব। সুতরাং যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে আশি বার আমার প্রতি দরুদ পাঠ করবে, তার পূর্বের দুই বছরের গুনাহ ও পরের দুই বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[১]

অনেক অনুসন্ধান করেও হাদিসটির কোনো সনদ সম্পর্কে অবগত হতে পারিনি। তবে হাদিসের প্রথম অংশ *শুআবুল ঈমান* বাইহাকিতে (৩/৮১) নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে:—

ابن أبي مريم حدثنا مسلمة بن علي الخشني حدثنا زيد بن واقد عن القاسم بن مخيمرة عن أبي هريرة

ইবনে জাওযি রহ. তার *আল-মওযুআত* গ্রন্থে বলেন, 'এই হাদিসটি সহিহ নয়।' যায়েদ ইবনে ওয়াকিদ থেকে কেবল মাসলামাই বর্ণনা করেছেন। আর মাসলামা সম্পর্কে ইয়াহইয়া (ইবনে মাঈন) বলেন, 'সে কিছুই নয়।' আর নাসায়ি, দারা কুতনি ও আযদি রহ. বলেন, 'সে পরিত্যাজ্য।'[২]

সাখাভি রহ. তার *আল-কাউলুল বাদি* গ্রন্থে (পৃ.২৮৫) বলেন, 'আমার ধারণা হাদিসটি সহিহ নয়।'

দুই. যে সকল সাহাবি থেকে এই মর্মে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তাদের একজন হলেন, হযরত আনাস রাযি.। তার রেওয়ায়াতটিও কয়েকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

ক. এক রেওয়ায়াতে এসেছে, তিনি বলেন, আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দণ্ডায়মান ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি বললেন,[৩] 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আমার প্রতি আশিবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন। জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহর রাসুল! আপনার প্রতি কীভাবে দরুদ পাঠ করব? তিনি বললেন, তোমরা বলো—

---

১. *আল-কাউলুল বাদি*: ২৮৫

২. *আল-মওযুআত*: ৫৫০

৩. ولفظه : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَمَانِينَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ ثَمَانِينَ عَامًا. قيل يا رسول الله! كيف الصلاة عليك؟ قال تقول: اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন আবদিকা ওয়া নাবিয়্যিকা ওয়া রাসুলিকান নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি"।'[১]

ইবনে জাওযি রহ. বলেন, 'হাদিসটি সহিহ নয়।' খতিব বাগদাদি রহ. বলেছেন, 'ওয়াহব ইবনে দাউদ (হাদিসের রাবি) নির্ভরযোগ্য নয়।'[২] হাফেজ যাহাবি রহ. বলেন, 'খতিব বাগদাদি রহ. বলেছেন, সে নির্ভরযোগ্য নয়, এই বলে তিনি তার সূত্রে বর্ণিত একটি জাল হাদিস উল্লেখ করেন।'[৩]

খ. হযরত আনাস রাযি. এর হাদিসটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে—"রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৪] যে ব্যক্তি প্রতি জুমুআর দিনে চল্লিশবার দরুদ পাঠ করবে, মহান আল্লাহ তার চল্লিশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি এক বার দরুদ পাঠ করবে, আর তা কবুল হবে, আল্লাহ তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' চল্লিশবার পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের পুলে একটি নুর তৈরি করবেন, সে পুলসিরাত পার হওয়া পর্যন্ত তা বিদ্যমান থাকবে।"

হাদিসটি আবুল কাসিম আল-আসবাহানি রহ. তার *আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব* গ্রন্থে (২/৩৩০, হাদিস: ১৬৯৬) নিম্নোক্ত সনদে বর্ণনা করেছেন—

أخبرنا أبو الحسن... ثنا محمد بن رزام ثنا محمد بن عمرو، ثنا مالك بن دينار وأبان عن أنس قال قال رسول الله...

উক্ত বর্ণনার প্রথম অংশ (অর্থাৎ দরুদ-সংক্রান্ত অংশ) জাল হাদিসের কিতাবাদিতে উল্লেখিত হয়েছে। ফাত্তানি রহ. তার *তাযকিরাতুল মওযুআত* গ্রন্থে (১/৯০); শাওকানি রহ. তার *আল-ফাওয়াইদুল মাজমুআহ* গ্রন্থে (২/৪১৬, হাদিস - ১০৩৫) এটি উল্লেখ করেছেন। ফাত্তানি রহ. বলেন, 'এই রেওয়ায়াতে محمد بن رزام নামক বর্ণনাকারী আছে, যে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত।' আর শাওকানি রহ. বলেন, 'সনদে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত বর্ণনাকারী রয়েছে।'

---

১. *তারিখে বাগদাদ*:১৫/৬৩৬, ১৩/৪৬৪; *মিযানুল ইতিদাল*, যাহাবি:৭/১৪৭

২. *আল-ইলালুল মুতানাহিয়া*: ৭৯৬

৩. *আল-মুগনি*: ২/৩৯০

8. ولفظه : من صلى علي في كل يوم جمعة أربعين مرة محا الله عز وجل عنه ذنوب أربعين سنة ومن صلى علي مرة واحدة فتقبلت منه محا عنه ذنوب ثمانين سنة ومن قرأ " قل هو الله أحد "أربعين مرة حتى يختم السورة، بنى الله منارا في جسر جهنم حتى يجاوز الجسر.

গ. হযরত আনাস রাযি. থেকে হাদিসটি এভাবেও বর্ণিত হয়েছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১] 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে একশবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।'

সাখাভি রহ. তার *আল-কাউলুল বাদি* গ্রন্থে (২৮২-২৮৩) হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, 'এই রেওয়ায়াতের কোনো আসল (সনদ) সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি।'

তিন. আশি বছরের গুনাহ মাফ হওয়া-সংক্রান্ত বিষয়টি উপরোক্ত হাদিসসমূহের পাশাপাশি হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. এর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে। সাহল ইবনে আবদুল্লাহ রহ. বলেন,[২] 'যে ব্যক্তি জুমুআর দিন আসরের পরে বলবে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম তাসলিমা, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।'

ইবনে বাশকুয়াল রহ. তার *আল-কিরবাহ ইলা রাব্বিল আলামিন* গ্রন্থে (হাদিস - ১১) উক্ত বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর কোনো সনদ উল্লেখ করেননি। আর আমরা অনেক অনুসন্ধানের পরও এর কোনো সনদ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারিনি।

সারকথা: হাদিসটির কোনো কোনো সনদ তো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; কোনোটি দুর্বল। আর বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে কেউ কেউ উক্ত হাদিসকে হাসান বলেছেন; আবার কারও দৃষ্টিতে—হাদিসটি হাসান নয় বরং দুর্বল; আবার কারও দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কিংবা 'মুনকার' ও আপত্তিজনক।

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—সেটি হচ্ছে, উপরোক্ত হাদিসটি দুর্বল নাকি হাসান, এ ব্যাপারে যেহেতু মুহাদ্দিসদের মতভেদ রয়েছে, সুতরাং যে সকল মুহাদ্দিসগণ এটিকে দুর্বল বা ভিত্তিহীন বলেছেন, তাদের বক্তব্যকে গ্রহণ করে অন্যরা যারা অন্যান্য মুহাদ্দিসদের বক্তব্যকে সঠিক মনে করে এর উপর আমল করে থাকেন, তাদের তিরস্কার করা কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আমার মহান শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা. এর চমৎকার একটি বক্তব্য রয়েছে। সবার উপকারে আসবে এই ভাবনায় একটু দীর্ঘ হলেও কথাগুলো নিচে তুলে ধরা হল। তিনি তাহকিকের (বিশ্লেষণ ও গবেষণার)

---

১. ولفظه : من صلى علي يوم الجمعة مئة صلاة غفر الله له خطيئة ثمانين عاما.

২. ولفظه : من قال يوم الجمعة بعد العصر: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم، ثمانين مرة، غفر له ذنوب ثمانين سنة.

ভুল ব্যবহারসংক্রান্ত এক আলোচনায় বলেন, 'জুমুআর দিন আসরের পর আশিবার দরুদ শরিফ পড়লে আশি বছরের গুনাহ মাফ হয়।' ধরো তুমি এ বিষয়ের হাদিস তাহকিক করলে আর তোমার কাছে শায়খুল হাদিস যাকারিয়া রহ. এর বক্তব্য-হাদিসটি হাসান লিগাইরিহি এর চেয়ে হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর 'তাহকিক' বেশি শক্তিশালী মনে হল। তিনি বলেছেন, রেওয়ায়াতটি 'মুনকার' (আপত্তিজনক তথা অতি দুর্বল)। তুমি খুব দলিল-প্রমাণের আলোকে এটাই সাব্যস্ত করলে। তোমাকে এই তাহকিকের জন্য বহু মোবারকবাদ।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই তাহকিকের নতিজা (ফলাফল) কী? এর নতিজা কি এটি যে, তুমি আগে এই আমলটি করতে এখন তা ছেড়ে দেবে? বা গুরুত্বের সাথে করবে না, বা যারা এই আমল করছে, তাদেরকে এই আমল ছেড়ে দিতে বলবে? যদি তুমি এমনটি মনে কর, তবে তা হবে তাহকিকের বদহজমি। তোমার তাহকিক যদি সঠিক হয়ে থাকে, তা হলে এর নতিজা শুধু এতটুকু যে, তুমি এই রেওয়ায়াতের 'ইশাআত' (প্রচার) করবে না এবং আমলের সময় উপরোক্ত সাওয়াবের আকিদা রাখবে না; তবে কোনো সংখ্যা ও সময়ের সাথে এর নির্দিষ্টতাকে মুস্তাহাব মনে করবে না; বরং শুধু মুবাহ মনে করে আমল করবে। এর নতিজা কখনও এই নয় যে, তুমি আমলটি ছেড়ে দেবে বা অন্যকে করতে নিষেধ করবে। এমনকি কেউ শায়খুল হাদিস রহ. এর বক্তব্যের অনুসরণ করে বা সাখাভি রহ. এর আলোচনার ভিত্তিতে (যিনি এটিকে একটি দুর্বল হাদিস মনে করেন) হাদিসটির ইশাআত করেন, তাকে বাধা দিতে যাওয়া বা তার সমালোচনা করা, এটাও তোমার সেই তাহকিকের নতিজা হতে পারে না।

দরুদ শরিফ প্রতিদিনের আমল, এবং জুমুআর দিন বেশি বেশি দরুদ শরিফ পড়ার কথাও সহিহ হাদিসে এসেছে। আর একটি শক্তিশালী মত হিসেবে জুমুআর দিন আসরের পরের সময়টুকু হল 'সাআতুল ইজাবাহ' বা দোয়া কবুলের সেই বিশেষ মুহূর্ত। তাই এ সময়ে দরুদ শরিফের আমল, আশিবার, একশবার করা যে একটি সাওয়াবের কাজ, এতে তো কোনো সন্দেহই নেই। অতএব, ওই বিশেষ সাওয়াবসংবলিত বর্ণনাটি মুনকার হলেও এই আমল ছেড়ে দেওয়ার তো কোনো যুক্তি হতে পারে না।'

এরপর মাওলানা আব্দুল মালিক দা. বা. জুমুআর দিনে অধিক পরিমাণে দরুদ পড়ার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি হাদিস তুলে ধরে বলেন, 'লক্ষ করে দেখো, দরুদ শরিফের গুরুত্ব, তার সাধারণ ফজিলতসমূহ এবং বিশেষভাবে জুমুআর দিন বেশি বেশি দরুদ পড়ার গুরুত্ব ও ফজিলত যা সহিহ সনদে প্রমাণিত ও একটি স্বীকৃত বিষয়, তুমি এই সবকিছুই ভুলে গেছ। ব্যস, ওই প্রসিদ্ধ

রেওয়ায়াতটি অমুক মুহাদ্দিসের তাহকিক অনুসারে 'মুনকার' আর এটি তাহকিকি 'কাওল', এটাকে বাহানা ধরে তুমি দরুদ শরিফের আমল থেকেই বঞ্চিত হয়ে গেলে। এটাই হল তাহকিকের ভুল ব্যবহার। এবং এটাকেই বলা হয়— তাহকিককে তার নতিজার (ফলাফলের) বাইরে ব্যবহার করা।

তোমার আশিবার পড়তে আপত্তি! অথচ নির্ভরযোগ্য সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি তার এক শাগরিদ যায়েদ ইবনে ওয়াহবকে নসিহত করেছেন, 'হে যায়েদ ইবনে ওয়াহব! জুমুআর দিন তুমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এক হাজার বার দরুদ পড়তে ভুল করো না। এভাবে বলবে— اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ। 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি।'[১]

* * *

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে স্বপ্নে দেখার দরুদ এবং আমাদের ভুল চিন্তা

নবিজির দর্শন লাভের ইচ্ছা যে কোনো মুমিনের অন্তরে থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই প্রতীক্ষিত দিদার (দর্শন) কীভাবে অর্জিত হবে? অনেক আলেমের ভাষ্যমতে—এজন্য প্রথম করণীয় হল ফরজ, ওয়াজিব আদায় এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে তার শানে দরুদ পাঠ করতে হবে।

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা.বা. জালালুদ্দিন সুয়ুতি রহ.(৯০২ হি.) এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, 'আমরা জানতে পেরেছি, আপনি পঁয়ত্রিশবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার লাভ করেছেন। আমাদেরও সেই আমলটি বলে দিন, যা দ্বারা আপনি এই মর্যাদা অর্জন করেছেন!'

তিনি বললেন, 'এজন্য আমি বিশেষ কোনো আমল করিনি। তবে আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহে আমার পুরো জীবনের অভ্যাস হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বেশি বেশি দরুদ পড়া। উঠাবসা, চলাফেরা, ঘুমানো-ঘুম থেকে উঠা, সব সময় আমার চেষ্টা থাকে যেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

---

১. *আত-তারগিব ওয়াত-তারহিব*, আবুল কাসেম আত-তাইমি: ১৬৫৪; *যিকরু আখবারে আসবাহান*, আবু নুআইম: ২/১৭১

প্রতি দরুদ পড়তে পারি। সম্ভবত এই আমলের কারণেই আল্লাহ পাক আমাকে এই ফজিলত দান করেছেন।[১]

কোনো কোনো বুজুর্গ থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার বিশেষ বিশেষ আমলও বর্ণিত হয়েছে। যেমন শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি (রহ.) তার *তারগিবু আহলিস-সাআদাত* গ্রন্থে বলেন, কেউ যদি জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে এবং প্রতি রাকাতে এগারো বার 'আয়াতুল কুরসি' এবং এগারো বার সুরা ইখলাস পড়ে, আর সালাম ফিরানোর পর একশ বার[২] 'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি' পড়ে, তা হলে তিন জুমুআ যেতে না যেতেই দিদারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অর্থাৎ রাসুলের সাক্ষাৎ অর্জন হয়ে যাবে ইশাআল্লাহ।

দিদারে রাসুল অর্জনের জন্য এরকম আরও অনেক আমল দরুদ শরিফের বিভিন্ন কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সাখাভি রহ. (৯০২ হি.) তার *আল-কাউলুল বাদি* গ্রন্থে; ইউসুফ নাবহানি রহ. (১২৬৫-১৩৫০ হি.) তার *সাআদাতুদ দারাইন* নামক গ্রন্থে; যাকারিয়া কান্ধলভি রহ. (১৪০২ হি.) তার *ফাযায়েলে দরুদ* গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও আরও অনেকে এ বিষয়ে বিভিন্ন আমলের কথা বলেছেন। এসব আমলের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় আমাদের খুব ভালো করে জেনে রাখা প্রয়োজন—

এক. উপরোক্ত আমল এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য আমলসমূহ কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়নি। অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা বলেননি—এই আমলগুলো করলে আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাবে। বরং এগুলো কোনো ওলি-বুজুর্গ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন। (অর্থাৎ কোনো বুজুর্গ এমন আমল করে যাচাই করে দেখেছেন যে, এর মাধ্যমে আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়ে থাকে)। সুতরাং এ সকল আমল করলে সবার ক্ষেত্রেই যে এমন ঘটবে, তা জরুরি নয়। কখনও এর ব্যত্যয়ও ঘটতে পারে বিভিন্ন কারণে। যেমন আমার দরুদ পড়া সেরকম প্রেম ও ভালোবাসা নিয়ে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে হয়নি, অথবা নিজের আমল-আখলাক এবং 'ইত্তেবায়ে সুন্নাতে'র (সুন্নতের অনুসরণ ও অনুকরণের) ক্ষেত্রে আমার কোনো ত্রুটি রয়েছে, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে এ সকল আমল করার পরও আমার সেই কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যটি অর্জিত নাও হতে পারে।

---

১. *ইসলাহি খুতুবাত*: ৬/১০৪

২. اللهم صل على محمد النبى الأمى وآله وأصحابه وسلم.

তা ছাড়া একজন প্রেমিকের প্রেমাস্পদের সাথে সাক্ষাতের যেমন একরকম স্বাদ রয়েছে, প্রকৃত প্রেমিকের জন্য প্রেমাস্পদের বিরহ-বেদনাতেও রয়েছে অন্যরকম স্বাদ। সুতরাং বেশি বেশি দোয়া-দরুদ ও অন্যান্য আমল করেও যদি নবিজির সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। বরং শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে, আল্লাহ পাক আমার মধ্যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। আর এই যে দোয়া-দরুদ, এগুলো শুধু তার তাওফিকেই সম্ভব হয়েছে। তিনি আমার এ সকল আমল দেখছেন। হয়ত বিশেষ কোনো হিকমতের কারণে আমার এই আকাঙ্ক্ষাটি পূর্ণ হচ্ছে না। এতেই আমার জন্য কল্যাণ রয়েছে।

দুই. দিদারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কোনো বিষয় নয় যে, প্রত্যেক মুমিনকে তা অর্জন করতেই হবে। বরং এটা একজন আশেকে রাসুলের আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছামাত্র। কিন্তু আমি যে একজন আশেকে রাসুল, এর প্রমাণ আমাকে আগে দিতে হবে। আর এর উপায় হল 'ইত্তেবায়ে সুন্নাহ' ও 'ইজতেনাব আনিল বিদআহ' তথা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের অনুসরণ এবং বেদআত থেকে দূরে থাকা। এর মাধ্যমেই প্রমাণ হবে—আমি রাসুলের প্রকৃত আশিক; নাকি এটা শুধু আমার মুখের দাবিমাত্র।

তিন. একজন প্রকৃত প্রেমিক প্রেমাস্পদের মিলন যেমন চায়, তেমনি তার মধ্যে এক ধরনের ভয়ও থাকে—আমি প্রেমাস্পদের সাক্ষাতের পর তার হক আদায় করতে পারব তো? তার শান অনুযায়ী আচরণ করতে পারব তো? এমনও হতে পারে—আমি এমন কোনো কাজ করে বসলাম, যার কারণে সে নারাজ হয়ে গেল। তা হলে তো মিলনের চেয়ে বিরহ বেদনাই ভালো।

এ প্রসঙ্গে মুফতি শফি রহ. এর চিন্তাধারা লক্ষণীয়। এক বার তার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হযরত, আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন যার বরকতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিদার ভাগ্যে জুটে। তিনি বললেন, ভাই তুমি দেখি অনেক বড় হিম্মতের অধিকারী যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করতে পেরেছ। আমাদের এমন আকাঙ্ক্ষা করার সাহসই নেই। আমরা কোথায় আর তার সাক্ষাৎ কোথায়! আর যদি সাক্ষাৎ নসিব হয়েও যায়, তাহলে এর আদব, হক ও দাবি কীভাবেই-বা পূরণ করব? তাই নিজের পক্ষ থেকে তা অর্জনের জন্য না কোনো চেষ্টা করেছি, আর না এর জন্য কোনো আমল শিখার সুযোগ আমার হয়েছে। আল্লাহ পাক নিজের পক্ষ থেকে যদি সাক্ষাৎ করিয়ে দেন, তাহলে এটা মাবুদের পক্ষ থেকে পুরস্কার।

আর যখন তিনি নিজের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করাবেন, তখন এর আদব রক্ষা করার তাওফিকও তিনি দেবেন।

এ কারণেই মুফতি সাহেব রহ. যখন রওজা মোবারকে উপস্থিত হতেন, কখনও রওজা মোবারকের জালির নিকটবর্তী হতেন না, বরং সব সময় জালির খুঁটির সাথে লেগে দাঁড়াতেন। অন্য কেউ এর সাথে দাঁড়ালে তিনি তার পিছনে দাঁড়াতেন। তিনি বলেন, এক বার আমার অন্তরে এই খেয়াল এল, সম্ভবত তুমি বড় দুর্ভাগা, এ কারণেই তো জালির নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর না। আর দেখো, এই যে আল্লাহর বান্দারা জালির নিকটবর্তী হচ্ছে এবং জড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর যত বেশি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হবে, তত বেশি নেয়ামত লাভ করবে। কিন্তু আমার কী করার আছে, আমার পা যে একটুও আগে বাড়ে না। তিনি বলেন, যখনই আমার অন্তরে এই খেয়াল এল, আমার কাছে মনে হল, যেন রওজায়ে আকদাস থেকে এই আওয়াজ আসছে— মানুষের কাছে এ কথা পৌঁছে দাও, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের উপর আমল করে, সে হাজার মাইল দূরে হলেও আমার নিকটবর্তী। আর যে আমার সুন্নতের উপর আমল করে না, সে যদিও আমার জালির সাথে জড়িয়ে দাঁড়ায়-না কেন, আমার কাছ থেকে দূরে।[১]

এই হল একজন প্রকৃত নবিপ্রেমিক, সুন্নাহর পূর্ণ অনুসারীর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত ও সাক্ষাৎ অর্জনের ক্ষেত্রে ভয় ও শঙ্কা। অপর দিকে আমাদের মতো লোকেরা, যারা প্রতি মুহূর্তে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর বিপরীত চলি, শরিয়তের বিরোধিতাই যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তারাই আবার এই অপবিত্র দেহ ও মন নিয়ে তার সাক্ষাতের স্বপ্ন দেখি। আল্লাহ পাক আমাদের সবার অন্তরে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা দান করুন এবং আমাদেরকে পূর্ণ সুন্নাহর অনুসারী বানিয়ে দিন। আমিন।

* * *

দরুদে নারিয়া না তাযিয়া?

আমাদের এই অঞ্চলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশেষ ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত প্রায় সবার কাছে দরুদে নারিয়া নামে একটি দরুদ প্রসিদ্ধ রয়েছে। দরুদটি নিম্নরূপ—

---

১. *ইসলাহি খুতুবাত:* ৬/১০৫-১০৬

اللهم صلِّ صلاةً كاملةً، وسلّم سلامًا تامًّا على سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، الذي تَنْحَلُّ به العُقَدُ وَتَنْفَرِجُ به الكُرَبُ، وتُقْضى به الحَوَائِجُ، وتُنالُ به الرَغَائِبُ وحُسْنُ الخَواتِيْم، ويُسْتَسْقى الغَمَامُ بِوَجْهِهِ الكَرِيْمِ، وعلى ءالِه وصَحْبِه فى كُلِّ لَمْحَةٍ ونَفَسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ.

এই দরুদের খতম করার একটি প্রচলন আমাদের এ অঞ্চলে রয়েছে। বিভিন্ন বালা-মুসিবত, পেরেশানি, বিপদাপদ ইত্যাদি থেকে মুক্তির জন্য এই দরুদের খতম করা হয়। দরুদটি এভাবে খতম করা শরিয়তসম্মত কিনা, তা এখনকার আলোচনার বিষয় নয়। এখানে শুধু দরুদটির নাম নিয়ে একটি কথা বলতে চাচ্ছি। উক্ত দরুদকে নারিয়া নামকরণের কারণ লোকমুখে যা প্রসিদ্ধ, তা হল, 'নার' অর্থ আগুন, আর কার্যকারিতার দিক দিয়ে এটা যেহেতু আগুনের সমতুল্য, এটা পড়ে দোয়া করলে দ্রুত ফল পাওয়া যায়, তাই এটাকে নারিয়া বলা হয়।

লোকমুখে যদিও দরুদটি এ নামেই প্রসিদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে দরুদের এই নামটি সঠিক নয়। আল্লামা ইউসুফ নাবহানি রহ. (১২৬৫-১৩৫০ হি.) তার *সাআদাতুদ দারাইন* গ্রন্থে (পৃ. ৩৭৬) বলেন, 'এই দরুদটি আরিফ বিল্লাহ সাইয়্যিদ ইবরাহিম তাযি[১] রহ. এর দিকে সম্বন্ধিত। (কেননা তিনিই এটি তৈরি করেছেন) মরক্কোতে এটি দরুদে তাযিয়া নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন, আমি আমার *আফযালুস সালাওয়াত আলা সাইয়্যিদিস সাদাত* গ্রন্থে মুহাম্মদ হাক্কি নাযিলি থেকে উদ্ধৃত করেছি যে, ইবরাহিম হাক্কি (৮৬৬ হি.) এটাকে 'তাযিয়া' শব্দে উল্লেখ করেছেন। এটা তাযিয়া শব্দ থেকে বিকৃত হয়ে 'নারিয়া' হয়েছে।'

মুহতারাম উসতায মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা. তার *তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ* গ্রন্থে (পৃ. ১১৩) বলেন, 'লোকমুখে প্রসিদ্ধ হল 'দরুদে নারিয়া' কিন্তু শুদ্ধ হল 'দরুদে তাযিয়া'; শায়খ ইবরাহিম তাযির নামানুসারে।'

মোটকথা, এই দরুদটির নাম ইবরাহিম তাযির নামানুসারে 'দরুদে তাযিয়া'। কিন্তু আরবি تازية এবং نارية শব্দদ্বয়ের মধ্যে কেবল একটি নুকতার পার্থক্য। এজন্য تازية থেকে বিকৃত হয়ে نارية রূপ ধারণ করেছে। আর নারিয়া শব্দের দিকে খেয়াল করে নামকরণের পূর্বোল্লেখিত কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

* * *

---

১. ইবরাহিম তাযি মরক্কোর অধিবাসী একজন সৎ আলেম ছিলেন। তার অপূর্ব অনেক কাসিদাহ (কবিতা) রয়েছে। *আয-যাওউল লামে*, সাখাভি: ১/১৮৭

আদব ও সুন্নত

খাবার বণ্টনের গুরুত্বপূর্ণ আদব ও আমাদের ভ্রান্তি

বৈঠকে অনেক লোক থাকলে খাবার বণ্টনের সময় ডানপাশ থেকে শুরু করা উচিত। হাদিস থেকে বাহ্যত তা-ই বুঝে আসে। এক বৈঠকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তার কাছে দুধ হাদিয়া এল। তার ডানপাশে ছিল এক বেদুঈন। আর সামনে ছিলেন হযরত আবু বকর ও উমর রাযি. । নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন। তখন হযরত উমর রাযি. বলে উঠলেন—আল্লাহর রাসুল! আবু বকরকে দিন। কিন্তু তিনি আবু বকরকে না দিয়ে তার ডান পাশে বসা বেদুঈনকেই সবার আগে দিলেন।

এ জাতীয় রেওয়ায়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় ডানদিক থেকে খাবার বণ্টন করা উচিত। আমরাও সাধারণত এমনি মনে করি। কিন্তু শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. *মিন আদাবিল ইসলাম* গ্রন্থের ১৯ নং আদবে বলেন, সুন্নত হচ্ছে যিনি সবচেয়ে বড় কিংবা সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ; কিংবা সবচেয়ে জ্ঞানী, তাকে দিয়েই শুরু করা। অর্থাৎ বৈঠকে যদি এমন কেউ থাকেন, যিনি উপস্থিত সবার মধ্যে বয়সে বড় কিংবা সবচেয়ে বড় আলেম কিংবা সবচেয়ে খ্যাতিমান অথবা বংশের দিক দিয়ে সবচেয়ে উঁচু বা অন্য কোন দিক বিবেচনায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাহলে মেহমানদারির ক্ষেত্রে সুন্নত হচ্ছে, তাকে দিয়েই শুরু করা। এরপর যে লোক তার ডান পাশে আছে, তাকে দেওয়া। এতে যে সকল রেওয়ায়াতে ডানদিক থেকে শুরু করার কথা এসেছে, এবং যে সকল রেওয়ায়াতে সম্মানী ও বড় ব্যক্তিকে অগ্রগামী করার কথা এসেছে, সবগুলোর মধ্যে সমন্বয় হয়ে যাবে। যেমন এক হাদিসে এসেছে—'বড়কে অগ্রাধিকার দাও।'[১] অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে—'যে ব্যক্তি আমাদের বড়কে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।'[২] অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে—'বড়কে দিয়ে শুরু করো।'[৩]

---

১. *শুআবুল ঈমান*: ৭/৪৬৪

২. *মুসনাদে আহমদ*: ১১/৫২৯

৩. *সহিহ বুখারি*: ৬১৪২

তিনি বলেন, কেউ কেউ এ ব্যাপারে ভুল ধারণা করে বসে আছেন। নুসুসগুলো বোঝা ও স্থানমতো তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও বুঝ দুর্বল। তারা ডানপাশ থেকে শুরু করার হাদিসগুলোর উপর ভিত্তি করে মনে করেছেন, সুন্নত হচ্ছে মেজবানের ডানে যিনি থাকবেন, সর্বাবস্থায় তাকে দিয়েই শুরু করা; সে যে ই হোক না কেন। অথচ এটি তখন হবে, যদি উপস্থিতদের সবাই সমান হয় এবং ফজিলত, শ্রেষ্ঠত্ব ও বয়সে সবাই কাছাকাছি হয়। তখন মেজবানের ডানে যিনি থাকবেন, তাকে দিয়ে শুরু করা উচিত। কিন্তু সবার মধ্যে যদি একজন বড় হন, হোক তা বয়সের দিক দিয়ে, তা হলে তাকে দিয়েই শুরু করা উচিত। কারণ এটি একটি উত্তম গুণ। তাই তাকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এজন্য তাকে দিয়েই শুরু করতে হবে।

ইমাম ইবনে রুশদ রহ. বলেন, উপস্থিত সবার অবস্থা যদি সমান হয় বা কাছাকাছি হয়, তাহলে ডান থেকে শুরু করা উত্তম। এটিই উত্তম চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পক্ষান্তরে যদি আলেম, সম্মানি কিংবা বয়সে বড় কেউ থাকেন, তাহলে তাকে দিয়েই শুরু করা উচিত; তিনি বৈঠকের যেখানেই থাকেন-না কেন। এরপর তিনি তার ডানপাশের ব্যক্তিকে দেবেন।

সারকথা: সাধারণ অবস্থায় (মেজবানের) ডানপাশ থেকে শুরু করাই শরিয়তের নিয়ম। কিন্তু যদি মজলিসে শ্রেষ্ঠ কেউ থাকেন, তা হলে সর্বপ্রথম তাকেই দিয়ে শুরু করা শরিয়তে কাঙ্ক্ষিত। অতঃপর তার ডানপাশের ব্যক্তিকে দিতে হবে। এটিই আদব।

* * *

খাওয়ার সময় বসার পদ্ধতি : কিছু অস্পষ্টতা নিরসন

নুরানি শিক্ষায় সাধারণত ছোট বাচ্চাদের শেখানো হয়—বসার আদব বা সুন্নত তিনটি। ক. দুই হাঁটু ফেলিয়া নামাজের সময়। খ. এক হাঁটু উঠাইয়া লেখার সময়। গ. দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার সময়। আর 'দুই হাঁটু উঠাইয়া খাওয়ার পদ্ধতি' শেখানো হয় এভাবে—পায়ের পাতার উপর ভর করে দুই হাঁটু উঠিয়ে বসবে।

খাওয়ার সময় বসার এই যে নিয়ম বা পদ্ধতি বলা হয়েছে, এটি কি সুন্নাহর আলোকে প্রমাণিত, কিংবা এটি কি বসার সুন্নত? সাধারণত লোখমুখে এটি সুন্নত বলেই প্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে আমরা এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। পাশাপাশি আহারের সময় বসার গ্রহণীয় ও বর্জনীয় সকল পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা পেশ করার চেষ্টা করব।

প্রথম কথা হল, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বাধিক বিনয়ী। তার বিনয়ের একটি নমুনা হচ্ছে—তিনি দাসের মতো বসতেন, আর দাসের মতো আহার করতেন। এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি তো আল্লাহর একজন দাসমাত্র। দাসের মতো আহার করি আর দাসের মতো বসি।'[১] অর্থাৎ আমি আল্লাহর এক বান্দা। আমি তো কেবল তার দাসমাত্র। আমি অহংকারী কিংবা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারী নই, তাই অহংকার ও বড়ত্ব প্রদর্শনকারীদের মতো বসি না এবং তাদের মতো আহার করি না; বরং এক দাসের মতো বসি আর দাসের মতো আহার করি।

জানার বিষয় হল, দাসের মতো বসার দৃশ্যটি কেমন?

বিভিন্ন হাদিসে এর বিবরণ এসেছে। দাসের মতো বসা হল জমিনে স্থির না হয়ে এমনভাবে বসা—কেউ দেখে মনে করবে লোকটি দাঁড়াতে চাচ্ছে, যেমন হাঁটু গেড়ে বসা। কেননা দাস বা গোলাম মনিবের খেদমতে কর্মব্যস্ত থাকে। এরপর যখন তার আহারের সুযোগ হয়, তখন সে জানু পেতে বা যেভাবে সহজ হয়, সেভাবেই বসে। কারণ তার মনিব আবার কখন ডাক দিয়ে বসে বা তাকে তলব করে বসে, এজন্য সে অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। তাই সে এভাবে বসে, যাতে তাকে তলব করলে দ্রুত ও সহজে দাঁড়িয়ে মনিবের আহ্বানের সাড়া দিতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পূর্ণ দাসত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে আহারের সময় বসার এই পদ্ধতিটি বেছে নেন।[২]

* * *

হেলান দিয়ে বসে আহার করা

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের সময় বিনয় অবলম্বন করতেন, এবং দাসের মতো বসতেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আহারের সময় ইত্তেকা (اتكاء) তথা হেলান দিয়ে আহার করা পরিহার করতেন। আবু জুহাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি ইত্তেকা তথা হেলান দিয়ে আহার করি না।[৩] আরেক হাদিসে উল্লেখ হয়েছে— হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও হেলান দিয়ে খেতে দেখা যায়নি।[৪]

---

১. *মুসনাদে বাযযার:* ১২/১৫৫

২. *শরহু ইবনে মাজা:* ১/২২

৩. *সহিহ বুখারি:* ৫৩৯৮, ৫৩৯৯; *সুনানে আবু দাউদ:* ৩৭৬৯

৪. *সুনানে আবু দাউদ:* ৩৭৭০; *সুনানে ইবনে মাজা:* ২৪৪; *মুসনাদে আহমদ:* ১১/১০৭

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের সময় কেন হেলান দিয়ে বসতেন না—এক হাদিসে এর কারণও উল্লেখ হয়েছে। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন— 'আল্লাহ তায়ালা তার নবির কাছে এক ফেরেশতা পাঠালেন। সাথে জিবরিল আলাইহিস সালামও ছিলেন। ফেরেশতা এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে এই স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, আপনি চাইলে একজন গোলাম ও নবি হিসেবে থাকতে পারবেন, আর চাইলে একজন ফেরেশতা হতে পারবেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামের দিকে এমনভাবে তাকালেন—যেন তিনি তার কাছে পরামর্শ চাচ্ছেন। জিবরিল তার হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন—আপনি বিনয় অবলম্বন করুন। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং আমি একজন গোলাম ও নবি হয়ে থাকতে চাই। বর্ণনাকারী বলেন, এই কথোপকথনের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও হেলান দিয়ে আহার করেননি।[১]

মুসনাদে আবু ইয়ালায় হযরত আয়িশা রাযি. এর এই হাদিসের শেষে উল্লেখ হয়েছে—এই কথোপকথনের পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে আহার করতেন না। তিনি বলতেন, 'আমি তো আল্লাহর একজন দাসমাত্র। দাসের মতো আহার করি, আর দাসের মতো বসি।'[২]

উপরোক্ত হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূলত বিনয় ও দাসত্ব প্রকাশের জন্যই এভাবে বসা পরিহার করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেমন ইত্তেকার পদ্ধতিতে বসা থেকে বিরত থাকতেন, অন্যদেরকেও তা থেকে বাধা দিতেন। হযরত আবু দারদা রাযি. কে তিনি বলেছেন, 'তুমি হেলান দিয়ে আহার কোরো না।'[৩]

হাদিসে উল্লেখিত ইত্তেকা (اتكاء) এর মর্ম কী, এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসদের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। অনেক ব্যাখ্যাকারের বক্তব্যমতে স্থির ও প্রশান্ত হয়ে বসে আহার করা যায়—এমন আসনকেই ইত্তিকা বলে।[৪] এই আসন অধিক আহারের প্রতি আহ্বান করে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। এ কারণেই নববি রহ. 'আমি ইত্তেকা (اتكاء) তথা হেলান দিয়ে খাদ্য গ্রহন করি না' এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমি ওই ব্যক্তির মতো আহার করি না, যে বেশি আহার করার

---

১. *নাসায়ি কুবরা*: ৬৭১০; *সুনানে কুবরা*, বায়হাকি: ৭/৪৮ (হাদিসটি হাসান)

২. *মুসনাদে আবু ইয়ালা*: ৩৯২০; *শরহুস সুন্নাহ*: ৩৬৮১

৩. *আল মুজামুল আওসাত*, তাবারানি: ৩৩ (আল্লামা আইনি রাহি. *উমদাতুল কারিতে* (২১/৪৪) বলেন, 'হাদিসের রাবিগণ নির্ভরযোগ্য')।

৪. দেখুন, *ফাতহুল বারি*: ৯/৫৪১; *তুহফাতুল আহওয়াযি*: ৫/৪৫৪; *আল-আরফুশ শাযি*: 3/276

ইচ্ছা পোষণ করে, আর এজন্য সে স্থির হয়ে বসে। বরং আমি স্থির না হয়ে বসে দ্রুত আহার করি এবং কম আহার করি।'[১]

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'ইত্তেকার পদ্ধতি কী, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইত্তেকা হচ্ছে স্থির হয়ে বসা, চাই তা যে কোনোভাবেই হোক-না কেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, ইত্তেকা হচ্ছে দুই পার্শ্বের যে কোনো এক পার্শ্বের দিকে ঝুঁকে (হেলান দিয়ে) বসা। আবার কেউ কেউ বলেন, আহারের সময় বাম হাত দ্বারা জমিনে ভর দেওয়া।'[২]

খাত্তাবি রহ. বলেন, 'সাধারণ মানুষ মনে করে, ইত্তেকা বলা হয়—এক পার্শ্বে হেলান দিয়ে আহার করা। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়; বরং ইত্তেকা হচ্ছে, নিতম্বের নিচে যে বিছানা আছে, তার উপর ভর করা। আর হাদিসের অর্থ—যে ব্যক্তি অধিক আহার করতে ইচ্ছুক, তার ন্যায় আহারের সময় আমার নিচের বিছানার উপর ভর করে বসি না। কেননা আমি কেবল প্রয়োজন পরিমাণ আহার করি। আর এ কারণে স্থির হয়ে বসা পরিহার করি।'[৩]

ইবনে কাইয়িম জাওযি বলেন, 'ইত্তেকা তিনভাবে হয়ে থাকে। ক. দুই পার্শ্বের যে কোনো এক পার্শ্বে ভর বা হেলান দেওয়া। খ. আসন পেতে বসা। গ. এক হাতের উপর ভর করে বা হেলান দিয়ে আরেক হাতে আহার করা। তিনি বলেন, ইত্তেকার এই তিন পদ্ধতিই নিন্দনীয়।'[৪]

তিনি আরও বলেন, 'ইত্তেকার ব্যাখ্যা করা হয়েছে—ক. আসন পেতে বসা। খ. কোনো বস্তুতে ভর করা। গ. দুই পার্শ্বের যে কোনো এক পার্শ্বে ভর বা হেলান দেওয়া—তিনটি পদ্ধতিই ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে—যা আহারে ক্ষতি করে। সেটি হল দুই পার্শ্বের যে কোনো এক পার্শ্বে ভর বা হেলান দেওয়া। কেননা এটি খাদ্যনালিকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে বাধা প্রদান করে এবং খাদ্য পাকস্থলীতে দ্রুত প্রবেশ করতে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাতে চাপ দেয়। তাই খাদ্য গ্রহণের জন্য তা পাকাপোক্তভাবে খুলতে পারে না। কেননা পাকস্থলী তখন ঝুঁকে যায়, সোজা থাকে না। এজন্য সহজে তাতে খাবার প্রবেশ করে না। আর বাকি দুই প্রকারের বসা হচ্ছে—অহংকারীদের বসা, যা দাসত্বের বিপরীত। এ কারণেই রাসুল বলেছেন, 'আমি দাসের মতো আহার করি।'[৫]

---

১. *শরহু মুসলিম*: ১২/৪৪০
২. *ফাতহুল বারি*: ৯/৫৪১
৩. *মাআলিমুস সুনান*: ৪/২৪২-২৪৩; *ফাতহুল বারি*: ৯/৫৪১
৪. *যাদুল মাআদ*: ১/১৪২
৫. *যাদুল মাআদ*: ৪/২০২

কাযি ইয়ায রহ. বলেন, 'ইত্তেকা হচ্ছে, আহারের জন্য স্থির হয়ে বসা। যেমন আসন পেতে উপবিষ্ট ব্যক্তি বা তার ন্যায় কোনো প্রকারের বসা, যাতে আহারকারী নিজের নিচের বিছানার উপর ভর করে স্থির হয়ে বসে। এই পদ্ধতিতে বসা অধিক আহার এবং অহংকারের প্রতি আহ্বান করে।'[১]

ইবনে আদি রহ. দুর্বল সনদে একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন—'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাম হাতের উপর ভর করে আহার করতে নিষেধ করেছেন।'

ইমাম মালেক রহ. বলেন, 'এটি ইত্তেকার এক প্রকার।' হাফেজ ইবনে হাজার মালেক রহ. এর কথাটি উল্লেখ করে বলেন, 'মালেক রহ. এর এই কথার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে—যে পদ্ধতিতে আহার করাকে হেলান বা ভর দিয়ে আহার করা গণ্য করা হয়, সেটিই মাকরুহ। এটি বিশেষ কোনো পদ্ধতির সাথে খাস নয়।'[২]

ইবনে আছির রহ. তার *আন-নিহায়া* গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, 'যারা ইত্তেকার ব্যাখ্যায় বলেছেন 'এক পার্শ্বে ঝুঁকে আহার করা', তারা চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে এই ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা এভাবে আহার করলে খাদ্যনালি দিয়ে খাবার সহজে প্রবেশ করে না এবং আহারকারী তৃপ্তির সাথে খাদ্য গিলতে পারে না; বরং অনেক সময় এর কারণে সে কষ্টের সম্মুখীন হয়।[৩]

ইমাম তাহাবি রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইত্তেকা বা হেলান দিয়ে আহার করতেন না, কারণ এটি ছিল অহংকারী রাজাবাদশা ও আজমি (অমুসলিমদের) পদ্ধতি।[৪]

হাদিসে ইত্তেকা পরিহার করার মূল কারণ বা উদ্দেশ্য বলা হয়েছে—'বিনয় অবলম্বন করা এবং অহংকারী ও অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্যতা থেকে বেঁচে থাকা।' তেমনিভাবে ইত্তেকার সুরতে বসলে স্থির হয়ে বসা হয়, ফলে তা অধিক আহারের কারণ হয়, যা শরিয়তে নিন্দনীয়। ইবরাহিম নাখায়ি রহ. বলেন, 'তাঁরা (সাহাবিগণ) ইত্তেকার সুরতে বসা অপছন্দ করতেন এই আশংকায় যে, (অধিক আহারের কারণে) তাদের পেট বড় হয়ে যাবে।'[৫] তা ছাড়া ইত্তেকার কোনো কোনো পদ্ধতি চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে আহারের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার কারণেও এভাবে আহার করা অনুচিত।

---

১. *আশ-শিফা বিতারিফি হুকুকিল মুস্তাফা:* ১/৮৬
২. *ফাতহুল বারি:* ৯/৫৪১
৩. *আন-নিহায়া:* ১/৫২২
৪. *শরহু মাআনিল আছার:* ৪/২৭৫
৫. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ১২/৪০৮

সুতরাং যদি অহংকার প্রকাশের জন্য ইত্তেকার যে কোনো পদ্ধতিতে আহার করে, তাহলে সর্বাবস্থায় এটি শরিয়তে নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে যদি ওজরবশত এভাবে বসে, তাহলে এটি বৈধ হবে। মাকরুহ হবে না। ইমাম বায়হাকি রহ. এমনটিই বলেছেন।[১] তবে যদি কোনো ওজর ছাড়া আরামের জন্য বা অধিক আহারের জন্য এভাবে বসে, তা হলে যদিও এটি অনুত্তম বা অনুচিত ও নিন্দনীয় হবে, তবে তা অবৈধ হবে না।[২]

* * *

আসন পেতে বসে আহার করা

অনেকে যদিও আসন পেতে বসাকে নিষিদ্ধ ইত্তেকার মধ্যে গণ্য করেন না। কিন্তু উপরে উল্লেখ হয়েছে—কাযি ইয়ায রহ. এবং ইবনে কাইয়িম জাওযি রহ. 'তারাব্বু' তথা আসন পেতে বসাকে নিন্দনীয় ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। বরং খাত্তাবি রহ. এই পদ্ধতিতে বসাকেই নিষিদ্ধ ইত্তেকার পদ্ধতি বলেছেন।[৩] আর কাশমিরি রহ. এই পদ্ধতির বসাকে নিন্দনীয় বলেছেন।[৪]

তা ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকেও আহারের সময় এভাবে বসা অনুপযোগী। ড. গিয়াছ আহমদ ফিরি বলেন, 'নিতম্বের উপর বসা অর্থাৎ আসন পেতে বসার কারণে পাকস্থলী প্রসারিত ও বিস্তৃত হয়ে যায়, এবং পাকস্থলী প্রশস্ত স্থান দখল করে নেয়, যার ফলে অধিক খাবার গ্রহণের যোগ্যতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে দুই পায়ের কিংবা এক পায়ের নলা উঠিয়ে আহার করলে পাকস্থলীর স্থান সংকীর্ণ হয়, এবং তার প্রশস্ততা কমে যায়। ফলে স্বল্প খাবারেই তার পাকস্থলী ভরে যায়, এবং আহারকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৃপ্তি ও পেট ভরা অনুভব করে। তাই তার আহার কম হয়। ফলস্বরূপ সে 'তুখমা' বা অতিভোজনজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয় না।

সারকথা: আসন পেতে বসা হাদিসে নিষিদ্ধ ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা এতে আলেমদের মতভেদ রয়েছে। যদি ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহলে তো আহারের সময় এভাবে বসা বৈধ। আর যদি ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত হয়, তবুও ওজরবশত এভাবে বসা বৈধ। এ ছাড়া আরামের জন্য বা প্রশান্তিতে বসে আহার

---

১. *ফাতহুল বারি:* ৯/৫৪২
২. *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম:* ৪/৪৩
৩. *মাআলিমুস সুনান:* ৪/২৪২-২৪৩; *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম:* ৪/৪৩
৪. *আল-আরফুশ শাফি:* ৩/২৭৫

করার জন্য এভাবে বসলে তা অনুত্তম হবে। পক্ষান্তরে যদি অহংকার প্রকাশের জন্য এভাবে বসে, তা হলে সেটি অবশ্যই বৈধ হবে না।

* * *

চেয়ারে বসে আহার করা

অনেকেই ইত্তেকার সংজ্ঞায় বলেছেন, যে পদ্ধতিতে স্থির হয়ে প্রশান্তিতে বসে আহার করা হয়, এটাকেই ইত্তেকা বলে। এ হিসেবে চেয়ারে বসে আহার করাও ইত্তেকার অন্তর্ভুক্ত। তবে এটি হারাম বা অবৈধ হবে না, কারণ বর্তমান সময়ে কেউ অহংকার প্রদর্শন বা অমুসলিম ও অহংকারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য আহার করে না, বরং স্থির হয়ে প্রশান্তির সাথে আহারের জন্য এভাবে বসে থাকে। তাই এটি অনুত্তম হবে, কারণ এভাবে বসা অধিক আহার করার কারণ হয়, যা নিন্দনীয় ও অনুত্তম, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

* * *

উপুড় হয়ে বা পেটের উপর ভর করে বসা

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত—'যে দস্তরখানে বসে মদ পান করা হয়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসতে নিষেধ করেছেন। তেমনিভাবে উপুড় হয়ে বসে পেটের উপর ভর দিয়ে আহার করতে নিষেধ করেছেন।'[১]

মুয়াফফাকুদ্দিন আবদুল লতিফ আল-বাগদাদি রহ. (৫৫৭ হি.) বলেন, 'আহারের এই নিষিদ্ধ পদ্ধতি খাবার উপভোগে বাধা প্রদান করে, কেননা এই পদ্ধতিতে আহার করলে খাদ্যনালি ও গলাধঃকরণের অঙ্গসমূহ এবং পাকস্থলী নিজের মূল ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। কেননা তখন পেটসংশ্লিষ্ট অংশ জমিনের সাথে এবং পিঠসংশ্লিষ্ট অংশ খাদ্যযন্ত্র ও শ্বাসযন্ত্রের মধ্যকার পর্দার দিকে চেপে যায়। যার ফলে খাদ্যনালি সংকীর্ণ হয়ে যায়। বরং খাদ্যনালি তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন, যখন মানুষ বসা থাকে।[২]

* * *

---

১. *সুনানে আবু দাউদ:* ৩৭৭৪; *মুসতাদরাকে হাকিম:* ৪/১২৯ (হাদিসটি নির্ভরযোগ্য)
২. *শরহু সুনানে ইবনে মাজা:* ১/২৪১; *হাশিয়াতুস সিন্দি:* ৬/৩৫৩ আরও দেখুন, *যাদুল মাআদ:* ৪/২০৪

আহারের সময় বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি

হানাফি ও শাফিয়ি ফকিহগণ আহারের সময় সর্বমোট তিন পদ্ধতিতে বসা উত্তম বলেছেন। আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. বলেন, 'আহারে বসার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে,

ক. নিতম্বের উপর ভর করে দুই হাঁটু উঠিয়ে বসা।

খ. এরপর উত্তম হচ্ছে হাঁটু গেড়ে বা জানু পেতে বসা।

গ. এরপর উত্তম হচ্ছে, ডান পা উঠিয়ে এবং বাম পা বিছিয়ে বসা।

নিচে এই তিন পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

ইকআ বা নিতম্বের উপর ভর করে দুই হাঁটু উঠিয়ে আহার করা

আনাস রাযি. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তার কোনো এক প্রয়োজনে পাঠান। কাজ শেষ করে এসে দেখি—তাকে কিছু খেজুর হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। আর তিনি 'ইকআ'র সুরতে (দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে) বসে তা আহার করছেন।'[1]

হাদিসটি *সহিহ মুসলিম* ও *সুনানে আবু দাউদে* সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে এভাবে—'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে ইকআর সুরতে (দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে) বসে খেজুর খেতে দেখেছি।'

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে এই বিষয়টিই ভিন্ন শব্দে উপস্থাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শুকনো খেজুর আনা হলে তিনি তা ভাগ করতে লাগলেন এবং তা থেকে তিনি নিজেও দ্রুত আহার করতে লাগলেন। তখন তিনি ছিলেন 'মুহতাফিয'।[2]

'মুহতাফিয' বলা হয়, জমিনে স্থির না হয়ে এমনভাবে বসা—যে কেউ দেখে মনে করবে—লোকটি দাঁড়াতে চাচ্ছে।[3] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বসে আহার করেছেন।

এ সকল হাদিসের সারকথা হচ্ছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকআর সুরতে আহার করেছেন।

---

১. *সুনানে কুবরা*, নাসায়িঃ ৬/২৫৮

২. *সহিহ মুসলিম*: ২০৪৬

৩. *মাশারিকুল আনওয়ার*, কাযি ইয়াযঃ ১/৪০৫

ইকআর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অভিধান ও হাদিসের প্রায় সকল ইমামদের বক্তব্য হল, 'দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে বসে আহার করা।'[১]

স্মর্তব্য, নামাজে এই ইকআর পদ্ধতিতে বসা নিষেধ। নামাজে নিষেধ হলেও আহারের সময় পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, নামাজে এভাবে বসলে কুকুরের বসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আহারের বিষয়টি ব্যতিক্রম। কেননা আহারের ক্ষেত্রে এটি দাসের বসার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমি আল্লাহর এক গোলাম তাই গোলামের মতো বসি।'

তা ছাড়া নামাজ স্থিরতার সাথে পড়া আবশ্যক। তাই সেক্ষেত্রে ইকআর পদ্ধতিতে বসা উপযোগী নয়, কেননা এতে স্থিরতা ও প্রশান্তি থাকে না। পক্ষান্তরে খাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা খাওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুততা কাম্য। তাই এখানে ইকআর পদ্ধতিই উপযোগী।[২]

কেউ কেউ বলেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অল্প আহারে তুষ্ট থাকতেন, এবং যতটুকু আহার তার জন্য যথেষ্ট হত, তার উপরই ক্ষান্ত থাকতেন। আর এজন্য আহারের সময় বসার এই পদ্ধতি বেছে নেন, যাতে আহারের জন্য স্থির হয়ে বসার কারণে অধিক আহার করতে না পারেন।

তবে এখানে কিছু কথা থেকে যায়। যেগুলো হচ্ছে—

ক. প্রথম কথা হল আহারের সময় এই পদ্ধতিতে বসা প্রসঙ্গে আনাস রাযি. এর যে হাদিস আমাদের সামনে রয়েছে, ওই হাদিসের দিকে একটু গভীর দৃষ্টিতে তাকালে আমরা দেখতে পাই—এটি রাসুলের সব সময়ের কোনো অভ্যাস বা আমল ছিল না, বরং এটি একবারের ঘটনামাত্র। কেননা হাদিসের সারকথা হচ্ছে—হযরত আনাস রাযি. রাসুল কর্তৃক অর্পিত একটি দায়িত্ব শেষ করে এসে দেখেছেন—রাসুলকে কিছু খেজুর হাদিয়া দেওয়া হয়েছে, আর তিনি 'ইকআ'র সুরতে অর্থাৎ দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে খেজুর খাচ্ছেন।

লক্ষণীয়— আনাস বলেছেন, আমি এভাবে আহার করতে দেখেছি। তিনি এ কথা বলেননি—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে আহার করতেন। যদি এভাবে বলতেন, তাহলে বোঝা যেত—এটি রাসুলের সব সময়ের অভ্যাস। কিন্তু তিনি যখন বললেন, আমি রাসুলকে এভাবে আহার করতে দেখেছি, এতে এ

---

১. *তাহযিবুল লুগাহ*: ১/৩১৬; *আল-মিসবাহুল মুনির*: ২/৫১০; *আল-ফাইক ফি গরিবিল হাদিস*: ৩/২১২; *আন-নিহায়া*: ৪/১৩৪; *লিসানুল আরব*: ১৫/১৯১; *শরহু মুসলিম*, নববি: ১৩/২২৭; *আদ-দিবাজ*, সুয়ুতি: ৫/৮৯; *মিরকাত*: ১২/৪৪০

২. *মিরকাত*: ১২/৪৪০; *শরহু সুনানে ইবনে মাজা*: ১/২২

কথা প্রমাণিত হল না যে, তিনি সব সময় এভাবে আহার করতেন। এই সম্ভাবনাটি আরও নিশ্চিত হয়ে যায় এই হাদিসের বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে। যেমন

আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহিম আশ-শাফিয়ি রহ. তার 'আল-গাইলানিয়াত' গ্রন্থে হাদিসটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবে—হযরত আনাস বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুর হাদিয়া দেওয়া হল। তিনি সেই খেজুরগুলো ঝুড়িতে করে হাদিয়া দিচ্ছিলেন, আর আমি ছিলাম (খেজুরগুলো বণ্টনে) তার প্রতিনিধি। অবশেষে কিছু খেজুর অবশিষ্ট থেকে যায়। তখন আমি তাঁকে দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে আহার করতে দেখেছি।[১]

তেমনিভাবে *মুসনাদে আহমদে* হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—হযরত আনাস রাযি. বলেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খেজুর হাদিয়া দেওয়া হল। তিনি সেই খেজুরগুলো একটি ঝুড়িতে করে বণ্টন করতে লাগলেন। বণ্টন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি ছিলাম (খেজুরগুলো বণ্টনের) তার প্রতিনিধি। তিনি বলেন, তখন তিনি দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে দ্রুত আহার করতে লাগলেন। আমি তার আহার থেকে তার মধ্যে ক্ষুধা দেখতে পেয়েছি।'[২]

এসব রেওয়ায়াতের সারকথা হচ্ছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর বণ্টনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তখন তার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল। ব্যস্ততার ফাঁকে যেভাবে বসা সম্ভব হয়েছে, সেভাবে বসে তিনি খেজুর খেয়েছেন। এভাবে আহার করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের অভ্যাস ছিল না। আর বিনয়ের সাথে বসার পদ্ধতি কোনটি, তা এক হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট বলেছেন। সামনে জানু পেতে বসার আলোচনায় হাদিসটি উল্লেখ হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিতে বসাকে বিনয়ের সাথে বসার পদ্ধতি বলেননি।

খ. তা ছাড়া রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ধরনের আহারের ক্ষেত্রে এভাবে বসেছেন, সেটিও বিবেচনায় রাখতে হবে। আনাস রাযি. এর হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর খাওয়ার জন্য এভাবে বসেছিলেন। বোঝা গেল, খেজুর, শসা, সালাদ, ফ্রুইট ইত্যাদি শুকনা বা হালকা খাবার এবং যে খাবার ভাত রুটি ইত্যাদির মতো ভারী নয়, যে খাবার খুব ইন্তেযাম ও প্রস্তুতি নিয়ে আহার করা হয় না, উপরোক্ত পদ্ধতিটি এ ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে ভাত, রুটি, গোশত ইত্যাদি ভারী খাবারের ক্ষেত্রে জানু পেতে বা এক হাঁটু উঠিয়ে খেতে হবে। এ কারণেই আমরা

---

১. *আল-গাইলানিয়াত*: ২/৭০৩

২. *মুসনাদে আহমদ*: ২০/৩৭৩ (সনদ নির্ভরযোগ্য)

দেখতে পাই—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন বকরি হাদিয়া এল, তিনি জানু পেতে আহার করলেন। সামনে জানু পেতে বসার আলোচনায় এ সংক্রান্ত হাদিস উল্লেখ হবে।

গ. যদি ধরেও নিই—আহারের সময় বিনয়ের সাথে বসা মুস্তাহাব, অহংকারীদের মতো বসা নিষেধ, তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিনয় ও আদব প্রকাশের জন্য এবং অহংকারীদের পদ্ধতি পরিহার করার জন্য এই পদ্ধতিতে বসেছেন। সুতরাং আহারের ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশের জন্য এই পদ্ধতিতেই বসতে হবে। তথাপি এখানে কথা থেকে যায়। কারণ বিনয় ও অহংকার সামাজিক প্রচলনের উপর নির্ভর করে। একই কাজ এক সমাজে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখা হয়, যা অন্য সমাজে আদব পরিপন্থি ও অহংকার হিসেবে দেখা যায়। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, আমাদের সমাজে এভাবে বসা বিনয়ের আলামত হিসেবে দেখা হয় না। সুতরাং যেভাবে বসলে আমাদের সমাজে বিনয় ও আদব গণ্য করা হয়, সেভাবেই বসতে হবে। আর সেটি অন্য দুই পদ্ধতির মধ্যেই রয়েছে, যা সামনে উল্লেখ হবে।

সম্ভবত এ কারণে হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইতঃপূর্বে উল্লিখিত 'ইত্তেকা' অনুত্তম হওয়া-সংক্রান্ত আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন, 'ইত্তেকা মাকরুহ হওয়া বা অনুত্তম হওয়া প্রমাণিত। আহারের জন্য বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি হল—

ক. দুই হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর বসবে (জানু পেতে বসবে)।
খ. অথবা ডান পা দাঁড় করে বাম পায়ের উপর বসবে।'

হাফেজ ইবনে হাজারের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয়— ইত্তেকা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে 'ইকআ' (দুই পায়ের হাঁটু উঠিয়ে নিতম্ব মাটিতে রেখে আহার করা) তো নিষিদ্ধ বা অনুত্তম হয়ে যায়নি, বরং এই পদ্ধতিতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই আহার করেছেন। তথাপি হাফেজ ইবনে হাজার রহ. এই পদ্ধতিকে মুস্তাহাব বা উত্তম না বলে অন্য দুই পদ্ধতিকেই মুস্তাহাব বললেন। এতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও কোনো এক সময় এই পদ্ধতিতে আহার করেছেন, তথাপি এটি মুস্তাহাব বা সুন্নত নয়।

হাঁটু গেড়ে বা জানু পেতে আহার করা

উবাই ইবনে কাব রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুই হাঁটু গেড়ে বসতেন, তিনি হেলান বা ভর দিয়ে বসতেন না।'[১]

---

১. *সহিহ ইবনে হিব্বান*: ১২/৪৮৭; *আহাদিসুল মুখতারাহ*: ১১১৭১; *আখলাকুন নবি*, আবুশ শায়খ ইবনে হাইয়্যান: ১/১৬৪ (সনদ নির্ভরযোগ্য)

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহারের সময় বিনয় অবলম্বন করতেন, আর এজন্যই তিনি আহারের সময় দাসের মতো বসা পছন্দ করতেন। দাসের মতো বসাটা কেমন, হাদিসে এর বিবরণ এসেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর রাযি. বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একটি বকরি হাদিয়া করলাম। তিনি দুই হাঁটু গেড়ে বসে তা আহার করতে লাগলেন। এক বেদুঈন বলল, এটা কী ধরনের বসা! তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী বানাননি।'[1]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আহারের সময় বসার আদব হল এমনভাবে বসা যেভাবে বসলে বিনয় ও দাসত্ব প্রকাশ পায়। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পদ্ধতিতে বসলেন, আর এটাকে বিনয়ের বসা বললেন। হাদিসের শেষ অংশ "আল্লাহ তায়ালা আমাকে অনুগ্রহপরায়ণ ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হিংসুক ও অহংকারী বানাননি" থেকে তা-ই সুস্পষ্ট। সুতরাং আহারের জন্য বসার সর্বোত্তম পদ্ধতি এটিই।

ইবনে কাইয়িম জাওযি রহ.-ও এই পদ্ধতির বসাকে শিষ্টাচারপূর্ণ ও সবচেয়ে উপকারী এবং সর্বোত্তম বলেছেন। তিনি বলেন, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি আহারের সময় হাঁটু গেড়ে, বাম পায়ের পেট ডান পায়ের পিঠে রেখে বসতেন। তার রবের সামনে বিনয় ও আদব প্রকাশের জন্য এবং আহার ও যে আহার করিয়েছে, তার প্রতি আদব প্রকাশের জন্য। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে বসে আহার করা সবচেয়ে উপকারী এবং সর্বোত্তম। কারণ এভাবে বসলে সকল অঙ্গ তার স্বভাবগত পদ্ধতিতে থাকে, যেভাবে আল্লাহ তায়ালা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। পাশাপাশি এতে রয়েছে শিষ্টাচারপূর্ণ পদ্ধতি। তা ছাড়া অঙ্গগুলো তার স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার কারণে সে যা আহার করবে, তা হবে সর্বোত্তম আহার।'[2]

ডান পা উঠিয়ে আর বাম পা বিছিয়ে আহার করা

আর হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'আহারকারীর জন্য বসার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে—হাঁটু ও পায়ের উপর ভর করে উবু হয়ে বসা, অথবা ডান পা উঠিয়ে বাম পায়ের উপর বসা।'

---

১. *সুনানে আবু দাউদ:* ৩৭৭৩; *সুনানে ইবনে মাজা:* ৩২৬৩ (হাফেজ ইবনে হাজার রাহি. *ফাতহুল বারিতে* (৯/৫৪১) এর সনদকে হাসান বলেছেন)

২. *যাদুল মাআদ:* ৪/২০২

ইবনে মুফলিহ হাম্বলি রহ. তার *আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ* (৩/৩০৪) গ্রন্থে বলেন, 'প্রত্যেকের জন্য সুন্নত হচ্ছে—আহারের সময় বাম পায়ে বসা আর ডান পা উঠিয়ে বসা। ফিকহ ও হাদিসের অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থে আহারের সময় এই পদ্ধতিতে বসাকে মুস্তাহাব বা সুন্নত বলা হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে আবুল হাসান ইবনে মুকরি রহ. তার *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়া* গ্রন্থে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আহারে বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসে ডান পা উঠিয়ে রাখতেন আর বলতেন—আমি হলাম গোলাম। গোলামের মতো আহার করি এবং গোলাম যেমন করে, আমিও তেমন করি।'[১]

তবে এই পদ্ধতিতে বসার মধ্যে আহারের সময় বসার মুস্তাহাব পদ্ধতির মূলনীতিসমূহ বিদ্যমান। যেমন এমনভাবে বসা, যাতে বিনয় ও আদব প্রকাশ পায়, স্থির না হয়ে বসা, অহংকার প্রকাশ না পাওয়া ইত্যাদি। সুতরাং যদি এ প্রসঙ্গে কোনো হাদিস নাও থাকত, তবুও এটি আহারের বসার আদবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হত। উপরন্তু এ ব্যাপারে রয়েছে হাদিস; হোক তা দুর্বল। এ ধরনের ক্ষেত্রে অবশ্যই দুর্বল হাদিস গ্রহণযোগ্য হবে।

তা ছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকেও এই পদ্ধতিতে বসা উপযোগী। এ প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে ড. গিয়াছ আহমদ ফিরির বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি বলেছেন...'পক্ষান্তরে দুই পায়ের কিংবা এক পায়ের নলা উঠিয়ে আহার করলে পাকস্থলীর স্থান সংকীর্ণ হয় এবং তার প্রশস্ততা কমে যায়। ফলে স্বল্প খাবারেই তার পাকস্থলী ভরে যায় এবং আহারকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৃপ্তি ও পেট ভরা অনুভব করে। তাই তার আহার কম হয়। ফলস্বরূপ সে "তুখমা" বা অতিভোজনজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হয় না।'

নুরানির আহারে বসার পদ্ধতি শিক্ষা

উপরে আমরা আহারে বসার তিনটি পদ্ধতি দেখেছি। কিন্তু নুরানি শিক্ষায় আহারের সময় বসার যে পদ্ধতি শেখানো হয়, বা আমাদের মুখে মুখে যেই পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়, সেটি উপরোক্ত তিন পদ্ধতির কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত নয়।

নুরানি শিক্ষায় বসার আদব বা সুন্নতের বর্ণনায় বলা হয়—'দুই হাঁটু উঠায়া খাওয়ার সময়।' আর এর সুরত শেখানো হয় এভাবে—নিতম্ব উঠিয়ে দুই পায়ের

---

১. আল্লামা ইরাকি রাহি. *এহইয়াউ উলুমিদ্দিন* গ্রন্থে (হাদিস নং ১৩০৪, ২৪১০) ইবনে মুকরির শামাইলের উদ্ধৃতিতে হাদিসটি উল্লেখ করে বলেন, 'এর সনদ দুর্বল।'

পাতার উপর বসবে। অথচ আমরা ইতঃপূর্বে বসার প্রথম প্রকার; অর্থাৎ ইকআর যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি সেটি হচ্ছে, নিতম্বের উপর ভর করে দুই পায়ের হাঁটু উপরে উঠিয়ে বসবে। সুতরাং দুটি পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। তাই এটিকে বসার সুন্নত বা মুস্তাহাব পদ্ধতি বলা ঠিক নয়।

তা ছাড়া যদি ধরে নিই 'দুই হাঁটু উঠিয়ে আহারের সময়' এ কথার মর্ম হচ্ছে—উপরের সেই ইকআর পদ্ধতি, তথাপি এটিকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলার কোনো সুযোগ নেই। কেননা ইতঃপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি—ইকআ তথা নিতম্বের উপর ভর করে দুই পায়ের হাঁটু উপরে উঠিয়ে বসা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব সময়ের আমল ছিল না; বরং তিনি বিশেষ সময়ে পরিস্থিতির কারণে এভাবে বসেছিলেন। অবশ্য আহারের সময় বসার যে মূলনীতি রয়েছে, অর্থাৎ বিনয়ের সাথে বসা, স্থির হয়ে না বসা, অহংকার প্রকাশ না পাওয়া, এগুলো এই পদ্ধতির বসার মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই এভাবে বসাও বৈধ, মাকরুহ নয়।

সারকথা: আহারের সময় বসার কিছু আদব ও মূলনীতি রয়েছে।

ক. বিনয় অবলম্বন করা এবং অধিক আহার থেকে বেঁচে থাকার জন্য ইত্তেকা তথা হেলান বা ভর দিয়ে আহার পরিহার করা।

খ. আসন পেতে বসা, দুই পার্শ্বের যে কোনো এক পার্শ্বে ভর বা হেলান দেওয়া, এক হাতের উপর ভর করে বা হেলান দিয়ে আরেক হাতে আহার করা সবগুলোই পরিহার করা চাই।

গ. উপুড় হয়ে পেটের উপর ভর করে আহার করাও নিষিদ্ধ।

এ ছাড়া যে সকল পদ্ধতিতে বসলে আদব ও বিনয় প্রকাশ পায়; অধিক আহার পরিহার করা যায়; কম আহারই যথেষ্ট হয়ে যায়; স্থির ও প্রশান্তির সাথে বসা না হয়—বসার এমন সব পদ্ধতি শরিয়তে বৈধ।

তবে বসার উত্তম ও মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে—

ক. হাঁটু গেড়ে বা জানু পেতে বসা।

খ. ডান পা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে আহার করা। ইকআ বা নিতম্বের উপর ভর করে দুই হাঁটু উঠিয়েও আহার করা যায়। তবে সব সময় এভাবে বসা মুস্তাহাব হবে কিনা, এটি প্রশ্ন সাপেক্ষ একটি বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সকল বিষয়ে মাসনুন ও মুস্তাহাব পদ্ধতি অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

করোনা ও মহামারি

করোনা ভাইরাস এবং হাদিসে বর্ণিত 'তাউন' দুটি কি এক?

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর থেকে অনেকেই 'তাউন'-সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে করোনার সাথে ফিট করে হাদিসে বর্ণিত 'তাউন'-সংক্রান্ত সকল বিধান করোনার সাথে লাগিয়ে দিচ্ছেন। অথচ হাদিসে বর্ণিত 'তাউন' এবং করোনা ভাইরাস এক নয়।

তাউনের হাদিসগুলো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে মিল দেখানোর প্রচেষ্টা থেকে কয়েকটি বিপত্তি সামনে দাঁড়ায়—

ক. হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী 'তাউন' মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। *সহিহ বুখারি* (১৮৮০) ও *সহিহ মুসলিমে* (১৩৭৯) হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মদিনার প্রবেশপথসমূহে ফেরেশতাগণ পাহারায় নিয়োজিত আছেন। 'তাউন' এবং দাজ্জাল মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।'

কোনো কোনো বর্ণনায় মক্কা শরিফের কথাও এসেছে।[১]

করোনা ভাইরাস যদি হাদিসে বর্ণিত সেই 'তাউন'ই হয়ে থাকে, তা হলে করোনা মদিনায় প্রবেশ করার কথা নয়।

খ. 'তাউন' সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি এতে মৃত্যুবরণ করবে, সে শাহাদাতের সওয়াব পাবে। এ প্রসঙ্গে *সহিহ বুখারি* (২৮৩০) ও *সহিহ মুসলিমে* (১৯১৫) হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে— রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাউনের কারণে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক মুসলমানের সাওয়াব শাহাদাত-তুল্য।'

---

১. *ফাতহুল বারি*: ১৩/১৪৮

তা ছাড়া হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত *সহিহ বুখারির* অপর হাদিসে (৫৭৩৪) বর্ণিত হয়েছে— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো বান্দা যদি তাউন-কবলিত এলাকায় থাকে এবং নিজ এলাকায় ধৈর্য সহকারে সাওয়াবের প্রত্যাশায় এই বিশ্বাস বুকে নিয়ে অবস্থান করে—আল্লাহ তায়ালা তাকদিরে যা চূড়ান্ত রেখেছেন, এর বাইরে কোনো কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তা হলে তার জন্য রয়েছে শহিদের সমান সাওয়াব।'

করোনা ভাইরাস যদি হাদিসে বর্ণিত সেই 'তাউন'ই হয়ে থাকে, তাহলে করোনায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কি শাহাদাতের সাওয়াব পাবে?

গ. বিশ্বব্যাপী লকডাউন চলাকালে ধর্মীয় অঙ্গন থেকে কেউ কেউ এই কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেছিল—এই লকডাউনের কথা হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে 'তাউন'-সংক্রান্ত একটি হাদিস পেশ করেছিলেন। অর্থাৎ *সহিহ বুখারি* (৬৯৭৩) ও *সহিহ মুসলিমে* (২২১৮) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত যে হাদিসে তাউন-কবলিত এলাকায় প্রবেশ এবং সেখান থেকে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে, এই হাদিসটি পেশ করা হয়েছিল।

কিন্তু তাউনের হাদিস কি এই লকডাউনে প্রযোজ্য!

বিপত্তিগুলোর সমাধান পেতে প্রথমেই 'তাউন' এর সংজ্ঞা বুঝতে হবে। ইমাম নববি রহ. 'তাউন' এর সংজ্ঞায় বলেন,[১] 'তাউন হচ্ছে এক প্রকারের ঘা বা ফোঁড়া, যা পেটের নিচে (যেখানকার চামড়া নরম), বগল, হাত ও আঙুলসহ পুরো শরীরে প্রকাশ পেয়ে থাকে। সাথে থাকে ফোলা বা গুটি এবং প্রচণ্ড ব্যথা। এ সকল ঘা উত্তাপের সাথে বের হয়, আর তার আশপাশ কালো, সবুজ কিংবা ভায়োলেট ফুলের মতো লালচে রঙের হয়ে থাকে। সাথে থাকে হৃৎপিণ্ডের কাঁপুনি, আরও থাকে বমি।'[২] ইমাম নববি রহ. এর এই সংজ্ঞাটি এ সংক্রান্ত অপরাপর সকল আলোচনার সারাংশ।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও এমনই কাছাকাছি সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. ولفظه : وأما الطاعون فهو قروح تخرج فى الجسد فتكون فى المرافق أو الآباط أو الأيدى أوالأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ماحواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء.

২. শরহু মুসলিম, নববি; ১৪/২০৪ আরও বিস্তারিত দেখুন, ইকমালুল মুলিম, কাযি ইয়ায: ৭/১৩১-১৩১; ১৪/২০৪; ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনে হাজার: ১৩/১৩০-১৩১; আউনুল মাবুদ, আযিমাবাদি: ৮/৩৬৮

বলেছেন,[১] 'আমার উম্মত তান (তরবারি, বর্শা ইত্যাদির আঘাত) এবং তাউন দ্বারা নিঃশেষ হবে। আয়িশা রাযি. বললেন, তান তো আমরা চিনি, কিন্তু তাউন কী? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উটের 'গুদ্দা'র [২] মতো যা পেটের নিচে (যেখানকার চামড়া নরম) ও বগলে প্রকাশ পায়। যে ব্যক্তি এতে মৃত্যুবরণ করবে, সে শহিদ।[৩]

এই হচ্ছে 'তাউন'। পক্ষান্তরে ওবা (الوباء) হচ্ছে এমন রোগ যা লক্ষণীয় আকার ধারণ করে। ভাষাবিদ এবং হাদিসের ব্যাখ্যাকারদের মতে—'তাউন' হচ্ছে একটি বিশেষ প্রকারের রোগ, আর 'ওবা' হচ্ছে মহামারি আকার ধারণ করা যে কোনো রোগ। এ কারণেই 'তাউন'কে অনেক সময় 'ওবা' নামে অভিহিত করা হয়; পক্ষান্তরে 'ওবা'কে কখনও 'তাউন' বলা হয় না। কেননা 'তাউন' বিশেষ প্রকারের একটি রোগ; যে কোনো রোগকে 'তাউন' বলা যায় না।[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি—করোনা ভাইরাস হাদিসে উল্লেখিত 'তাউন' নয়। কেননা 'তাউন' হচ্ছে—ঘা জাতীয় এবং গুটি জাতীয় একপ্রকার রোগ। পক্ষান্তরে করোনা ভাইরাস এমন নয়। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাসকে 'ওবা' বলা যাবে।

এবার বিপত্তিগুলোর সমাধান দেখা যাক।

প্রথম বিষয়—অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তাউন মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।' এ কথাটি আপন জায়গায় ঠিক আছে। কেননা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি—করোনা ভাইরাস 'তাউন' নয়; বরং এটি হচ্ছে 'ওবা'। আর 'ওবা মদিনায় প্রবেশ করতে পারে। এমন ঘটনা অতীতে হযরত উমর রাযি. এর যুগেও ঘটেছে।[৫] সুতরাং করোনা মদিনায় প্রবেশ করার কারণে হাদিসের বিপরীত কিছু ঘটেনি।

দ্বিতীয় বিষয়—অর্থাৎ ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তি কি শাহাদাতের মর্যাদা পাবে?

---

১. ولفظه : إِنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَتْ :الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ :غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيرِ تَخْرُجُ فِي الْمَرَاقِّ، وَالآبَاطِ مَنْ مَاتَ مِنْهُ، مَاتَ شَهِيدًا

২. এটি হচ্ছে উটের তাউন। এটি উটের এমন এক প্রকারের রোগ, যার কারণে কানের নিকটবর্তী গ্রন্থি ফুলে যায়।

৩. *আত-তামহিদ*: ১৩/২৫৮

৪. *শরহু মুসলিম*, নববি: ১৪/২০৪; *ইকমালুল মুলিম*, কাযি ইয়ায: ৭/১৩১-১৩১; *ফাতহুল বারি*, হাফেজ ইবনে হাজার: ১৩/১৩০-১৩১; *আউনুল মাবুদ*, আযিমাবাদি: ৮/৩৬৮

৫. *সহিহ বুখারি*: ২৬৪৩

বিষয়টি সমাধানের আগে একটি হাদিস দেখে নিই। হযরত আমির ইবনে আবদ আস-সুলামি রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন— তিনি বলেছেন, 'কেয়ামতের দিন শহিদ এবং তাউনে মৃত্যুবরণকারীরা আসবে। তাউনে মৃত্যুবরণকারীরা তখন বলবে—আমরা তো শহিদ। তখন তাদের সম্পর্কে (ফেরেশতাদের) বলা হবে—দেখো, তাদের জখম থেকে যদি শহিদদের জখমের মতো রক্ত টপকায়, যার সুগন্ধি মেশকের মতো, তা হলে তারাও শহিদ। অতঃপর তারা (ফেরেশতাগণ) তাদের সেভাবেই পাবে।'[১]

তাউনে মৃত্যুবরণকারীদের সম্পর্কে হাদিস শরিফে যে শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়ার কথা বলা হয়েছে, এটা এজন্য—যুদ্ধের ময়দানে যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করে, তাদের সাথে তাউনে মৃত্যুবরণকারীদের বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। সাদৃশ্যটি হল, উভয়ের শরীরে জখম এবং ঘা থাকবে। আর আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি—করোনা ভাইরাস 'তাউন' নয়। কারণ এতে কোনো জখম, ঘা কিংবা গুটি থাকে না। সুতরাং তাউনের হাদিসটি করোনার সাথে প্রয়োগ করে এ কথা বলা—হাদিস শরিফে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিকে শহিদ বলা হয়েছে—এটা উচিত নয়।

অবশ্য ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির কিছু উপসর্গ তাউনে আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাছাড়া পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি সম্পর্কেও সহিহ হাদিসে শাহাদাতের সাওয়াব পাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তাই আল্লাহর কাছে আমরা এই প্রত্যাশা করতেই পারি—করোনায় মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিও আখেরাতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। কিন্তু সে তাউনে মৃত্যুবরণ করেছে—এজন্য শহিদ, এ কথা বলা যাবে না।

তৃতীয় বিষয়—অর্থাৎ মহামারি-কবলিত এলাকায় প্রবেশ এবং সেখান থেকে বের না হওয়া। এই বিধানটি শুধু তাউনের সাথেই সুনির্দিষ্ট নয়। বরং যে কোনো মহামারি এবং বাহ্যিক ছোঁয়াচে রোগের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। *সহিহ বুখারি* (৬৯৭৩) ও *সহিহ মুসলিমে* (১৪/২১২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমির রাযি. থেকে এ সংক্রান্ত যে বিধানটি এভাবে উল্লেখ হয়েছে—'সিরিয়ায় ওবা ছড়িয়ে পড়েছে।' আর যে কোনো রোগই মহামারি আকার ধারণ করলে যেহেতু ওবা বলা হয়, তাই করোনা ভাইরাসও ওবা এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং করোনা ভাইরাসের জন্যও ওবা এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

---

১. *মুসনাদে আহমদ* : ২৯/১৯৮ (হাফেজ ইবনে হাজার রাহি. *ফাতহুল বারিতে* (১৩/১৫৩) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন)

মহামারিতে হোম কোয়ারেন্টাইন-সংক্রান্ত বহুল প্রচারিত হাদিস এবং কিছু বিভ্রান্তি

লকডাউন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের সরকারি নির্দেশনা আসার পর খুব প্রচার হতে থাকে—মহামারির সময়ে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ চৌদ্দশ বছর আগে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দিয়ে গেছেন। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়।

এর স্বপক্ষে এই হাদিসটি উদ্বৃত করা হয়—হযরত আয়িশা রাযি. বলেন, 'আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে মহামারি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন,[1] 'মহামারি হল এক আজাব, আল্লাহ যাদের উপর ইচ্ছা এটি পাঠান। পরিশেষে তিনি তা ঈমানদারদের জন্য রহমত বানিয়ে দেন এভাবে—কোনো বান্দা যদি মহামারি আক্রান্ত এলাকায় থাকে এবং নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে সাওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তায়ালা তাকদিরে যা চূড়ান্ত রেখেছেন, এর বাইরে কোনো কিছু তাকে আক্রান্ত করবে না, তা হলে তার জন্য রয়েছে শহিদের সমান সাওয়াব।'

হাদিসে 'নিজ বাড়িতে ধৈর্য সহকারে সাওয়াবের নিয়তে এ বিশ্বাস বুকে নিয়ে অবস্থান করে' বাক্যের মধ্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্টভাবে মহামারির সময়ে 'হোম কোয়ারেন্টাইনে' থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু বাস্তবেই কি তাই? বাস্তবেই কি মহামারির সময়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঘরে অবস্থান করার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে?

বাস্তবতা মূলত এমন নয়। বিষয়টি বোঝার জন্য একটি পর্যালোচনার প্রয়োজন। হযরত আয়িশা রাযি. এর উপরোক্ত হাদিসটি *মুসনাদে আহমদে* (৪৩/২৩৫) নিম্নোক্ত সনদে বর্ণিত হয়েছে:—

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ...

এখানে 'দাউদ ইবনে আবুল ফুরাত' থেকে 'আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস' এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু 'দাউদ ইবনে আবুল ফুরাত'

---

১. ولفظه: أَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، فَجَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، فَلَيْسَ مِنْ رَجُلٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ، فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِيدِ

থেকে হাদিসটি শুধু 'আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস'-ই বর্ণনা করেছেন—বিষয়টি এমন নয়; বরং 'আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস' ছাড়াও 'দাউদ' থেকে আরও সাত জন নির্ভরযোগ্য হাফেজে-হাদিস হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন মুসা ইবনে ইসমাইল, হাব্বান ইবনে হেলাল, নাযর ইবনে শুমাইল, ইউনুস ইবনে মুহাম্মাদ, আবু আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ, আবদুর রহমান ইবনে মাহদি, মুহাম্মদ ইবনে ফজল আরিম।

মুসা ইবনে ইসমাইলের বর্ণনা *সহিহ বুখারিতে* (৩৪৭৪) বর্ণিত হয়েছে। হাব্বান ইবনে হেলালের বর্ণনা *সহিহ বুখারিতে* (৫৭৩৪) বর্ণিত হয়েছে। নাযর ইবনে শুমাইলের বর্ণনা *সহিহ বুখারিতে* (৬৬১৯) বর্ণিত হয়েছে। ইউনুস ইবনে মুহাম্মাদের বর্ণনা *মুসনাদে আহমদে* (৪০/৪১৭) বর্ণিত হয়েছে। আবু আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযিদের বর্ণনা *মুসনাদে আহমদে* (৪২/১১৮) বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে মাহদির বর্ণনা বাইহাকির *সুনানে কুবরায়* (৩/৩৭৬) বর্ণিত হয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে ফজল আরিমের বর্ণনা ইবনে আবদুল বার রহ. এর *আত-তামহিদে* (১২/২৫৯) বর্ণিত হয়েছে।

আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিস ব্যতীত এই সাতজন নির্ভরযোগ্য রাবির কারও বর্ণনায়-ই فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করার কথাটি নেই; বরং তাদের সবার বর্ণনায় فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ এসেছে। অর্থাৎ যে শহরে বা যে এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, সেই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র না যাওয়া; বরং মহামারি-আক্রান্ত সেই শহরেই অবস্থান করা।

সুতরাং আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনা যাতে فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ তথা ঘরে থাকার নির্দেশ এসেছে, এটি মুহাদ্দিসিনে কেরামের পরিভাষায় 'শায'বা বিরল। তাই এমন রেওয়ায়াতকে দলিল হিসেবে পেশ করার কোনো সুযোগ নেই।

বিষয়টি যুক্তির আলোকেও বুঝা যেতে পারে। মনে করুন—আপনার কাছে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি একটি সংবাদ দিল। কিন্তু ওই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সমপর্যায়ের কিংবা তার থেকে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য সাত-আটজন ব্যক্তি এর বিপরীত বলল। সেক্ষেত্রে আপনি সাত-আটজনের সংবাদটিই গ্রহণ করে থাকবেন। 'শায' হাদিসের বিষয়টাও এমন।

সুতরাং আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনায় فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ অর্থাৎ ঘরে অবস্থান করার কথাটি 'শায'। কেননা তার চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য আরও

সাতজন রাবি (বর্ণনাকারী) বলছেন, হাদিসের শব্দ فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ নয়; বরং فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ তথা এলাকায় থাকবেন ঘরে নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে তার রেওয়ায়াত নয়, অন্য সাতজনের রেওয়ায়াতই ধর্তব্য হবে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুরআনে কারিমের যেমন এক আয়াতের তাফসির অন্য আয়াতের মাধ্যমে হয়, হাদিসের ক্ষেত্রেও এমনি হয়ে থাকে। একটি হাদিস এক সনদ থেকে স্পষ্ট না হলে অনেক সময় হাদিসটির সকল সূত্র মিলালে এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। আর সকল সূত্র মিলিয়েও যদি হাদিসের অর্থ সুস্পষ্ট না হয়, তাহলে অন্য হাদিসে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ কারণেই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেছেন, 'হাদিসের সকল সূত্র যদি একত্রিত না কর, তাহলে তুমি হাদিস বুঝতে পারবে না। কেননা এক হাদিস অন্য হাদিসের ব্যাখ্যা করে।'

শাস্ত্রীয় এই নীতির আলোকে বলা যায়—আবদুস সামাদ ইবনে আবদুল ওয়ারিসের যে বর্ণনায় ঘরে অবস্থান করার কথা এসেছে, এর ব্যাখ্যা তা-ই, যা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের সূত্রে এসেছে। অর্থাৎ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ যার অর্থ মহামারি-কবলিত এলাকায় অবস্থান করা, অন্য এলাকায় না যাওয়া। অন্যান্য হাদিস থেকেও এই ব্যাখ্যা বুঝে আসে। এ সম্পর্কে *সহিহ বুখারি* (৬৯৭৩) ও *সহিহ মুসলিমে* (২২২১) হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসটি বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো এলাকায় যখন মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, আর তোমরা সেখানে থাক, তোমরা সেখান থেকে পলায়ন করার জন্য বের হয়ো না।'

সহিহ বুখারিতে (৩৪৭৩) হযরত উসামা রাযি. থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ ও উসামা রাযি. এর হাদিসের আলোকে আলোচ্য হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা হবে—'কোনো এলাকায় যখন মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, সেখান থেকে তোমরা বের হয়ো না।'

আমার উসতায মাওলানা আব্দুল মালেক দা. বা. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এর হাদিসটি উদ্ধৃত করে বলেন, "এ হাদিসের ফিতরি ও স্বাভাবিক অর্থ হল, যে নির্দিষ্ট মহল্লা বা এলাকায় বাস্তবেই এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে, ওখান থেকে কেউ যেন বের না হয় এবং বাইর থেকেও কেউ যেন ওখানে না আসে। এটা তো স্পষ্ট—হাদিসে 'আরদুন' বলতে উদ্দেশ্য হল নির্দিষ্ট

এলাকা, যা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা যেন এভাবে করছেন যে, এখানে 'আরদুন' অর্থ দেশ-মহাদেশ। আবার কেউ এমন অর্থও করছেন যে, আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ঘর থেকেই বের না হওয়ার কথা বলা হয়েছে এই হাদিসে । এটা হাদিসের মর্ম নয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের দাবিতে এমন করতে হলে কোনো বাধা নেই; তা তো ভিন্ন প্রসঙ্গ।"[১]

সারকথা: উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়— কোনো হাদিসেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোম কোয়ারেন্টাইনের কথা বলেননি। বরং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো এলাকায় মহামারি ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে বের না হতে।' তবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশনা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের পরামর্শের আলোকে সতর্কতামূলক ঘর থেকে বের না হওয়া ভিন্ন বিষয়। এতে আপত্তির কোনো সুযোগ নেই। আপত্তি শুধু হোম কোয়ারেইন্টাইনের বিষয়কে আল্লাহর রাসুলের নির্দেশ হিসেবে চালিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে।

* * *

১. *মাসিক আল কাউসার*, এপ্রিল-মে, ২০২০

হালাল ও হারাম

দাড়ি কাটা, দাড়ি ছাঁটা : কিছু ভ্রান্তি, কিছু বিভ্রান্তি

দাড়ি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধান। এটি সব নবির সুন্নত। সব নবিরই দাড়ি ছিল। হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১] 'দশটি বিষয় ফিতরতের অন্তর্ভুক্ত। মোচ ছোট করা, দাড়ি লম্বা করা...।[২]

ব্যাখ্যাকারগণ হাদিসে বিবৃত ফিতরতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ফিতরত হচ্ছে সুন্নাহ। অর্থাৎ সব নবির সুন্নাহ এবং সকল শরিয়তের সর্বসম্মত বিধান, যা আঁকড়ে ধরার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে।[৩] সুতরাং দাড়িও সব শরিয়তের বিধান, সকল নবির সুন্নাহ।

দাড়ি রাখার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য উপরোক্ত হাদিসটিই যথেষ্ট। উপরন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দাড়ি রাখার সুস্পষ্ট আদেশ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৪] 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো; দাড়ি বৃদ্ধি করো এবং মোচ ছোট করো।'[৫]

হায়! নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে মুশরিকদের বিরোধিতা করতে বলেছেন, সেখানে আমরা তাদের কালচার এবং ফ্যাশনকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। শুধু তা-ই নয়, এমন গর্হিত কাজের পক্ষে সাফাই পেশ করছি যে, এটি

---

১. ولفظه : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

২. *সহিহ মুসলিম*: ২৬৩; *সুনানে নাসায়ি*: ৫০৪০; *সুনানে আবু দাউদ*: ৫৩; *সুনানে তিরমিজি*: ২৭৫৭; *সুনানে ইবনে মাজা*: ২৯৩

৩. *শরহু মুসলিম*, নববি: ৩/১৪৮; *মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার*: ৪/১৫৫

৪. ولفظه : خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

৫. *সহিহ বুখারি*: ৫৮৯২; *সহিহ মুসলিম*: ২৬২

তো সুন্নত; ফরজ কিংবা ওয়াজিব তো নয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাদের কথা অনুযায়ী বাস্তবে যদি এটি কেবল সুন্নতই হয়, তবুও কি একজন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব—এটা তো সুন্নত, তাই পালন করা জরুরি নয়! আর সমস্ত নবিদের সর্বসম্মত সুন্নতের বিষয়টি তো আরও গুরুত্বপূর্ণ।

দাড়ি সুন্নত, তা মানলাম। কিন্তু সুন্নত শব্দের কী কী অর্থ রয়েছে, তা তো জানতে হবে। একটি হচ্ছে ফিকহি সুন্নত যা ফরজ-ওয়াজিবের বিপরীত, আরেকটি হচ্ছে শাব্দিক অর্থে সুন্নত। শাব্দিক অর্থে সুন্নত বলা হয় পন্থা, নিয়ম ও রীতিকে। সুতরাং শাব্দিক অর্থে যাকে সুন্নত বলা হয়, সেটি ফিকহি দৃষ্টিতে ফরজ কিংবা ওয়াজিবও হতে পারে। আর দাড়িকে সমস্ত নবির সুন্নত শাব্দিক অর্থেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ দাড়ি রাখা সকল নবির চিরাচরিত রীতি ও অভ্যাস। কিন্তু ফিকহি দৃষ্টিতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব। কেননা অসংখ্য হাদিসে দাড়ি রাখার আদেশ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও বিভিন্ন হাদিসে দাড়ি লম্বা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন হযরত ইবনে উমর রাযি. এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১] 'তোমরা মোচ ভালো করে ছাঁটাই করো আর দাড়ি বৃদ্ধি করো।'[২] ইবনে উমর রাযি. থেকে অপর এক বর্ণনায় এসেছে,[৩] 'দাড়ি পূর্ণ করো।'[৪] এ সকল বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে দাড়ি লম্বা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দাড়ি ঠিক কতটুকু রাখতে হবে?

দাড়ি লম্বা করার যে বিধান এসেছে, এর অর্থ এই নয়—দাড়ি লম্বা হতেই থাকবে, বিলকুল কাটা যাবে না। বরং নির্দিষ্ট পরিমাণ লম্বা হলে তা কাটা যাবে।

হযরত ইবনে উমর রাযি. যখন হজ বা উমরা করতেন, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়িগুলো কেটে ফেলতেন।[৫] তা ছাড়া হযরত আবু হোরায়রা রাযি.-ও এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়িগুলো কাটতেন। ইমাম বুখারি ও মুসলিমের উসতায ইবনে আবি

---

১. ولفظه : انْهَكُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

২. *সহিহ বুখারি: ৫৮৯৩; সহিহ মুসলিম: ২৬০*

৩. ولفظه : وَأَوْفُوا اللِّحَى

৪. *সহিহ বুখারি: ৫৮৯২; সহিহ মুসলিম: ২৬২০*

৫. *সহিহ বুখারি: ৫৮৯২*

শাইবাহ রহ. এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *আল-মুসান্নাফ* (১৩/১১২)-এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এভাবে—'হযরত আবু হোরায়রা রাযি. দাড়ি মুষ্টিবদ্ধ করতেন, অতঃপর এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কেটে ফেলতেন।'

এ ছাড়াও কাতাদা, হাসান বসরি, ইবনে সিরিন, আতা, তাউস, কাসিম প্রমুখ তাবিয়িগণ এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়িগুলো কাটতেন—এ মর্মে আছার বর্ণিত হয়েছে।[১]

শুরুতে উল্লিখিত বিভিন্ন হাদিসে আমরা দাড়ি লম্বা করার আদেশ পেয়েছি, কিন্তু এর বিপরীত সাহাবা ও তাবিয়িদের আমল পেলাম, তারা এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়িগুলো কেটেছেন। যেমন ইবনে উমর রাযি. ও আবু হোরায়রা রাযি. এর আমল। সাহাবায়ে কেরাম নবিজির আদেশের বিপরীত আমল করবেন, তা তো কল্পনাই করা যায় না। বিশেষত ইবনে উমর রাযি. তো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত বেশি অনুসরণ করতেন যে, কেউ দেখলে মনে হবে লোকটি মনে হয় পাগল?[২] সুতরাং এ কথা নিশ্চিত—তারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই মর্মে কোনো নির্দেশনা পেয়েছেন যে, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যাবে। হযরত আমর ইবনে আসের সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, 'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে দুদিকে তার দাড়ি কাটতেন।'[৩]

এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার বিষয়টি ইমাম তাবারি রহ. সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হযরত আমর ইবনে আস রাযি. এর হাদিসে যে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি কাটার কথা বর্ণিত হয়েছে, এটা اعفوا اللحى অর্থাৎ দাড়ি লম্বা করার হাদিসের বিরোধী নয়। কেননা নিষেধ হল আজমিদের (পারস্যের অগ্নিপূজারী কাফেরদের) মতো দাড়ি মুণ্ডানো অথবা কবুতরের লেজের মতো রাখা। আর اعفوا اللحى এর মধ্যে 'ইফা'র অর্থ হল, দাড়ি বাড়ানো, যা অন্য বর্ণনায় এসেছে। অগ্রভাগ থেকে কিছু (অর্থাৎ এক মুষ্টির অতিরিক্ত কিছু) কেটে ফেলা, এটা কোনো ক্রমেই মুণ্ডানো নয়।'[৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট হল,

---

১. *মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা:* ১৩/১১২-১১৩

২. *সিয়ারু আলামিন নুবালা:* ৩/২১৩

৩. *সুনানে তিরমিজি:* ২৭৬২, ২৯১২ (সনদের বিচারে হাদিসটি দুর্বল। ইমাম তিরমিজি হাদিসটিকে গরিব বলে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে এতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ এটি অন্যান্য আছার দ্বারা সমর্থিত)

৪. *মিরকাতুল মাফাতিহ:* ৮/২৮৫

ক. দাড়ি লম্বা করতে হবে এটাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ।

খ. এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটা যাবে।

গ. দাড়ি মুণ্ডানো সম্পূর্ণ হারাম। এটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিরোধী।

ঘ. দাড়ি ছাঁটাই করে এক মুষ্টির কম রাখাও নাজায়েজ।

আল্লামা মাহমুদ খাত্তাব রহ. তার *সুনানে আবু দাউদ শরিফের* প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল মানহালুল-আযবুল-মারূদে' (১/১৮৬) দাড়ি লম্বা করার আদেশসংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, 'এ কারণেই সকল মুজতাহিদ আইম্মায়ে মুসলিমিন যেমন ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেয়ি, আহমদ ও অন্যান্যদের মতে—দাড়ি মুণ্ডানো হারাম।'

আর বুখারির প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফয়জুল বারি' এর টীকায় (৬/৯৯) এসেছে, 'এক মুষ্টির কম দাড়ি থেকে কিছু অংশ কেটে ফেলা হারাম। এতে সকল ইমামদের ইজমা রয়েছে।'

আল্লাহ তায়ালা বিষয়টি বুঝে আমল করার তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো-সংক্রান্ত আমাদের কিছু ভ্রান্তি

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা সম্পর্কে হাদিসে কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেছেন,[১] 'টাখনুর নিচে লুঙ্গির যে অংশ ঝুলে থাকবে, তা আগুনে জ্বলবে (অর্থাৎ ঝুলন্তকারী ব্যক্তি আগুনে জ্বলবে।'[২]

হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৩] 'যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে চলবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না।'[৪]

---

১. ولفظه: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّار

২. *সহিহ বুখারি:* ৫৮৮৭

৩. ولفظه: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪. *সহিহ বুখারি:* ৩৬৬৫ , ৫৭৮৩; *সহিহ মুসলিম:* ২০৮৫

হযরত ইবনে উমর রাযি. আরও বর্ণনা করেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১] 'এক লোক তার লুঙ্গি পায়ের গোড়ালির নীচে ঝুলিয়ে পথ অতিক্রম করছিল। এমন সময় তাকে মাটির নীচে ধ্বসিয়ে দেওয়া হল। কেয়ামত অবধি সে মাটির নীচে ধ্বসে যেতে থাকবে।'[২]

উপরোক্ত হাদিসগুলো থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম সমাজের প্রায় সবাই বিষয়টি সম্পর্কে কমবেশি অবগত। এ কথা সবাই বুঝেন—এটি বড় ধরনের এক অপরাধ। কিন্তু আমাদের অনেক ভাই উক্ত বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভ্রান্তিতে পড়ে আছেন। আমরা এ সংক্রান্ত কয়েকটি ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

* * *

শুধু নামাজের সময়ই নয়, অন্য সময়ও টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো নিষেধ

মুখে না বললেও অনেকে কার্যত মনে করেন—টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানোর নিষেধাজ্ঞাটি কেবল নামাজের জন্যই নির্ধারিত। এজন্য তারা শুধু নামাজের সময়ই লুঙ্গি-পায়জামা-প্যান্ট টাখনুর উপরে উঠিয়ে রাখেন, কিন্তু অন্যান্য সময় এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। অথচ এটি সব সময়ের বিধান, শুধু নামাজের সাথে নির্দিষ্ট বিধান নয়। হাদিসগুলোতে বলা হয়নি—শুধু নামাজের সময় কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে এই শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। হ্যাঁ, এ কথা ঠিক—নামাজের সময় কাপড় ঝুলিয়ে রাখা অন্য সময়ের তুলনায় বড় অপরাধ। এ কারণেই কিছু হাদিসে বিশেষভাবে নামাজের কথাই বর্ণিত হয়েছে। যেমন—

ক. হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এক বেদুঈনকে লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখতে দেখে বললেন,[৩] 'নামাজে লুঙ্গি ঝুলন্তকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো হালাল-হারামের মধ্যে নয়।'[১]

---

১. ولفظه: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২. *সহিহ বুখারি: ৫৭৯০; সহিহ মুসলিম: ২০৮৮*

৩. ولفظه: إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ فِي الصَّلاةِ، لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ، وَلا حَرَامٍ

খ. তেমনিভাবে হযরত আবু হোরায়রা রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,[২] '(কাপড়) ঝুলন্তকারীর নামাজ আল্লাহ কবুল করেন না।'[৩]

এসব হাদিসে নামাজে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা বড় অপরাধ গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু নামাজে যেমন টাখনুর উপরে কাপড় উঠানো জরুরি, তেমনিভাবে অন্যান্য সময়ও জরুরি। আল্লাহ তায়ালা বিষয়টি বোঝার তাওফিক দান করুন, আমিন।

* * *

টাখনুর নিচে শুধু ইযার[৪] ঝুলানোই নিষেধ নয়, জুব্বা এবং অন্য পোশাক ঝুলানোও নিষেধ

কেউ কেউ মনে করেন—হাদিসে ইযার বা লুঙ্গি ঝুলাতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সুতরাং লুঙ্গি বা পায়জামা-প্যান্ট ঝুলানো অবৈধ; কিন্তু জুব্বা কিংবা অন্য কোনো কাপড় ঝুলানো নিষেধ নয়। এমন ধারণা সুস্পষ্ট ভ্রান্তি। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে,[৫] 'যে ব্যক্তি তার কাপড় ঝুলাবে...'[৬]

উক্ত হাদিস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—লুঙ্গি-পায়জামা, জামা-জুব্বা সবগুলোই ঝুলানো নিষেধ। কেননা হাদিসে 'ছাওব' (কাপড়) শব্দ এসেছে। যাতে সব কাপড়ই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ হাদিসে যেহেতু ইযার[৭] শব্দ এসেছে, তাই অনেকে হয়ত ধারণা করে নিয়েছেন—নিষেধাজ্ঞাটি কেবল লুঙ্গি বা পায়জামার ক্ষেত্রেই, অথচ বাস্তবতা এমন নয়।

উল্লেখ্য, হযরত ইবনে উমর রাযি. এর উপরোক্ত হাদিসে ইযারের পরিবর্তে 'ছাওব' শব্দ এসেছে, যাতে সব কাপড়ই অন্তর্ভুক্ত। অথচ অধিকাংশ বর্ণনায় 'ইযার' শব্দ এসেছে। তাই 'ছাওব' শব্দটি শুনে হাদিসের রাবি শুবা তার উস্তায

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হালাল এবং হারামের প্রতি তার বিশ্বাস নেই অথবা আল্লাহ তায়ালার জিম্মাদারি থেকে সে মুক্ত এবং তার দ্বীন থেকে সে আলাদা হয়ে গেছে। (*আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি: ৯৩৬৮) (হাফেজ ইবনে হাজার *ফাতহুল বারি*তে উক্ত হাদিসের সনদকে হাসান বলেছেন)

২. ولفظه: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَه

৩. *সুনানে আবু দাউদ*: ৬৩৮

৪. ইযার বলা হয়, দেহের নিম্নাংশের বস্ত্রকে, যেমন লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি।

৫. ولفظه: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ

৬. *সহিহ বুখারি*: ৩৬৬৫, ৫৭৮৩, ৫৭৮৪, ৫৭৯১; *সহিহ মুসলিম*: ২০৮৫, ২০৮৬

৭. ইযার বলা হয়, দেহের নিম্নাংশের বস্ত্রকে, যেমন লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি।

মুহারিবের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন—হাদিসে কি ইযার উল্লেখ করা হয়নি? জবাবে মুহারিব বললেন, ইযার, কামিস (জামা-জুব্বা) কোনোটাই নির্ধারণ করেননি।[১]

বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিস থেকে। বর্ণিত হয়েছে[২]—'যে ব্যক্তি ইযার, জামা, পাগড়ি এগুলোর কোনো একটিও ঝুলাবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেবেন না।'[৩] উপরোক্ত হাদিসে সুস্পষ্টভাবে জামা এবং পাগড়ি ঝুলানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তা ছাড়া হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত অন্য একটি হাদিসে এসেছে[৪]—'নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযার সম্পর্কে যা বলেছেন, জামার ক্ষেত্রেও সেই বিধানই প্রযোজ্য হবে।'[৫]

অবশ্য অধিকাংশ হাদিসে 'ইযার' শব্দ ব্যবহৃত হওয়ার একটি কারণ রয়েছে। আল্লামা তাবারি রহ. বলেন, সেই সময় অধিকাংশ মানুষ ইযার পরত, তাই ইযার শব্দটি এসেছে। এখন যখন মানুষ জামা-জুব্বা পরতে শুরু করেছে, তাই ইযারের বিধানটি এগুলোর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হবে।[৬]

অহংকার ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায়ও টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো নিষেধ

অনেকে মনে করেন, শুধু অহঙ্কারের বশেই টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো নিষেধ। যারা এই ধারণা রাখেন, হাদিসে ব্যবহৃত 'খুয়ালা' শব্দটি উপস্থাপন করে থাকেন। কিন্তু এই ধারণাটি কয়েকটি কারণে সম্পূর্ণ ভুল—

এক. প্রথম কথা হল, যদিও কিছু কিছু হাদিসে নিষেধাজ্ঞাকে অহংকারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীত অসংখ্য হাদিসে অহংকারের শর্ত ছাড়াই সাধারণভাবে কাপড় ঝুলানো থেকে বারণ করা হয়েছে, এবং কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। যেমন:

* হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

---

১. *সহিহ বুখারি: ৫৭৮৩*

২. ولفظه : الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৩. *সুনানে আবু দাউদ: ৪০৯৪; সুনানে নাসায়ি: ৫২৬৬; সুনানে ইবনে মাজা: ৩৫৭৬*

৪. ولفظه : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ

৫. *সুনানে আবু দাউদ: ৪০৯৫*

৬. *ফাতহুল বারি: ১১/২৬২*

‘লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে।’[১]

* হযরত আবু যর রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "، قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ: ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا، وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: " الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

‘তিন ব্যক্তি এমন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে দৃষ্টিও দেবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না...। এরপর এই তিন ব্যক্তিদের মধ্যে কাপড় ঝুলন্তকারীকেও উল্লেখ করেছেন।’[২]

* হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.

‘একজন মুসলিমের পাজামা/লুঙ্গি পায়ের গোছার অর্ধভাগ পর্যন্ত থাকবে, তবে তা পায়ের গিরা পর্যন্ত হলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই বা গুনাহ নেই। অবশ্য এর নিচে গেলে সে দোজখে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহংকার করে নিজের পাজামা ঝুলিয়ে পরবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না।’[3]

* হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الْإِزَارِ.

‘আল্লাহ তায়ালা লুঙ্গি ঝুলন্তকারীর দিকে দৃষ্টি (রহমতের) দেবেন না।’[৪]

* হযরত মুগিরা ইবনে শুবা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا سُفْيَانَ بْنَ سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ.

---

১. *সহিহ বুখারি: ৫৭৮৭*

২. *সহিহ মুসলিম: ১০৮*

৩. *সুনানে আবু দাউদ: ৪০৯৩; ইবনে মাজা: ৩৫৭৩; সহিহ ইবনে হিব্বান: ১২/২৬৩*

৪. *সুনানে নাসায়ি: ৫৩৩২*

'হে সুফিয়ান ইবনে সাহল, কাপড় ঝুলিয়ে রেখো না। কেননা আল্লাহ তায়ালা কাপড় ঝুলন্তকারীকে পছন্দ করেন না।'[১]

এসব হাদিসে ব্যাপকভাবেই টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে—চাই অহংকারের সাথে হোক, চাই অহংকার ছাড়াই হোক। এ কারণেই হযরত ইবনে উমর রাযি. সর্বাবস্থায় কাপড় ঝুলানো অপছন্দ করতেন। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, ইবনে আবি শাইবাহ এটি বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি বলেন, ইবনে উমরের এই অপছন্দ ইচ্ছাকৃত ঝুলিয়ে রাখার ক্ষেত্রে, চাই অহংকার থাকুক, চাই না থাকুক।[২]

দুই. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো নিষিদ্ধ হওয়ার মূলে অহঙ্কার ছাড়া আরও কিছু কারণ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. বলেন, প্রথমত এতে ইসরাফ বা অপচয় হয়, যা হারাম। দ্বিতীয়ত এতে নারীর সাথে সামঞ্জস্যতা হয়। এই কারণটি ইসরাফ বা অপচয়ের চেয়েও গুরুতর। হযরত আবু হোরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই পুরুষকে লানত করেছেন, যে মহিলার মতো কাপড় পরে।' হাকিম রহ. উক্ত হাদিসকে সহিহ বলেছেন।[৩] তৃতীয়ত টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তি নাজাসাত বা অপবিত্রতা লেগে যাওয়া থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না। এদিকে ইঙ্গিত করেই 'শামায়েলে তিরমিজি' (১১১) এবং 'নাসায়ি' (৯৬০৩)-তে হযরত উবাইদ ইবনে খালিদ রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, 'আমি টাখনুর নিচে একটি চাদর ঝুলিয়ে হাঁটছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে বলল, তোমার কাপড় উঠাও, কেননা এটা তোমার কাপড়ের পবিত্রতা এবং দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার বেশি উপযোগী। পিছনে ফিরে দেখি সেই লোকটি হলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।[৪]

তিন. অনেকে টাখনুর নিচে কাপড় পরার বৈধতা প্রমাণে হযরত আবু বকর রাযি. এর আমলকে পেশ করেন। তাদের দৃষ্টিতে হযরত আবু বকর রাযি. এর অহংকার ছিল না, তাই তার ব্যাপারটি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই আমাদেরও অহঙ্কার না থাকলে আমাদেরটাও বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল, অহংকার ছাড়া কাপড় ঝুলানোর দাবি করার দুটি দিক হতে পারে। একটি হল অহংকার ছাড়া অনিচ্ছায় কাপড় ঝুলানো। যেমন অসতর্কতাবশত কারও লুঙ্গি কিংবা কাপড় টাখনুর

---

১. *সুনানে ইবনে মাজা: ৩৫৭৪; সহিহ ইবনে হিব্বান:* ১২/২৫৯

২. *ফাতহুল বারি:* ১০/২৫৫

৩. হাদিসটি *মুসনাদে আহমদ; সহিহ ইবনে হিব্বানসহ* হাদিসের অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে

৪. *ফাতহুল বারি:* ১০/২৬৩

নিচে চলে গেল, কিন্তু যখনই খেয়াল হল, উঠিয়ে নিল। দ্বিতীয়টি হল ইচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলিয়ে দাবি করা—আমি অহংকার ছাড়া এমনটা করেছি।

হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন প্রথম সুরতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হাদিসের শেষে হযরত আবু বকর রাযি. এর প্রশ্ন এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার লুঙ্গির এক অংশ খেয়াল না করলে ঢিলা হয়ে যায়। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকারের কারণে ঝুলিয়ে রাখে।'[১] এমনকি তাড়াহুড়ো করে চলার কারণে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এরকম হয়েছিল। হযরত আবু বাকরা থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে এক বার সূর্যগ্রহণ হল। তিনি দ্রুত কাপড় ঝুলিয়ে মসজিদে এলেন।[২]

আরও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হযরত আবু বকর রাযি. কে অহংকার থেকে মুক্ত থাকার সার্টিফিকেট খোদ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন, কিন্তু অন্য ঝুলন্তকারীদের যে অহংকার নেই, এ কথার সার্টিফিকেট কে দেবে? সর্বোপরি হযরত আবু বকর রাযি. কে দলিল বানানো যায় না।

চার. ইচ্ছাকৃত কাপড় ঝুলিয়ে যে ব্যক্তি দাবি করবে—আমি অহংকারমুক্ত, তার এই দাবি সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য হবে। ইবনে আরাবি রহ. বলেন, 'টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে এ কথা দাবি করা—আমি অহংকারের কারণে এমন করিনি, এটি জায়েজ নয়। কেননা নিষেধাজ্ঞার শব্দটি এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর (কুরআন-হাদিসের) শব্দ যখন কাউকে বিধানগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন এ কথা বলার সুযোগ থাকে না—আমি এটা পালন করব না, কারণ এই ইল্লত (কারণ) আমার মধ্যে নেই। এটি অগ্রহণযোগ্য দাবি। বরং (কাপড়ের) অগ্রভাগ ঝুলানোই এ কথার প্রমাণ—তার মধ্যে অহংকার রয়েছে।'

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ইবনে আরাবির এই বক্তব্যটি উল্লেখ করে বলেন, 'সারকথা হল, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখলে অবশ্যই 'জাররুস সাওব' তথা কাপড় ঝুলানো পাওয়া যায়। আর কাপড় ঝুলানোর মধ্যে অহংকার অত্যাবশ্যক; যদিও পরিধানকারীর অহংকার প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে। তিনি বলেন, এই বক্তব্যটি সুদৃঢ় হয়ে যায় ইবনে উমর রাযি. থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত একটি

---

১. *সহিহ বুখারি*: ৩৬৬৫; ৫৭৮৪
২. *সহিহ বুখারি*: ৫৭৮৫

রেওয়ায়াত দ্বারা।[১] ওই রেওয়ায়াতে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এক বেদুঈনকে) বলেছেন, 'তুমি লুঙ্গি ঝুলানো থেকে বেঁচে থেকো। কেননা লুঙ্গি ঝুলানো অহংকারের অন্তর্ভুক্ত।' তেমনিভাবে আবু উমামার বর্ণনা দ্বারাও এ বিষয়টি সুদৃঢ় হয়ে যায়।[২] তিনি বলেন, 'আমরা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। ইতোমধ্যে আমর ইবনে যুরারা রাযি. আমাদের কাছে লুঙ্গি ও চাদর ঝুলিয়ে এলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজের কাপড় ধরে আল্লাহর জন্য বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন,[৩] 'হে আল্লাহ! আমি আপনার দাস এবং আপনার এক দাসের ছেলে, ছেলে আপনার দাসীর।' হযরত আমর ইবনে যুরারা কথাটি শুনতে পেয়ে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার পায়ের নলা পাতলা। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমর ইবনে যুরারা, আল্লাহ তায়ালা তার সকল মাখলুককে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। হে আমর ইবনে যুরারা, আল্লাহ তায়ালা কাপড় ঝুলন্তকারীদের পছন্দ করেন না।'

দেখুন, এ কথা তো সুস্পষ্ট—সাহাবি আমর ইবনে যুরারা অহংকার ছাড়াই টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়েছিলেন, তথাপি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় উঠাতে বলেছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কাপড় ঝুলন্তকারীদের পছন্দ করেন না। বোঝা গেল, অহংকার না থাকলেও কাপড় ঝুলানো নিষেধ।[৪]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি দা. বা. বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেন, 'টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো হারাম হওয়ার মূল কারণ অহংকার। যেমনটা হাদিস শরিফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু অহংকার একটি গোপন বিষয়। অনেক সময় অহংকারে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেও অবগত হতে পারে না। (তাই অহংকারের সববকে ইল্লতের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা।) (অর্থাৎ কাপড় ঝুলিয়ে রাখাই তার অহংকারের প্রমাণ বহন করবে)। বিষয়টি সফরকালীন কসর (চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজ দুই রাকাত) পড়ার মতো। কেননা কসরের মূল ইল্লত বা কারণ হচ্ছে 'মুশাক্কাত' (কষ্ট)। কিন্তু 'মুশাক্কাত' একটি অস্পষ্ট বিষয়, কোনো নিয়মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। তাই সববকে বা কারণ সংঘটককে

---

১. হাদিসটি *আল-মাতালিবুল আলিয়ায়* (১০/২৯১) বর্ণিত হয়েছে।

২. হাদিসটি তাবারানিতে (৭৯০৯) বর্ণিত হয়েছে।

৩. ولفظه: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أَمَتِكَ

৪. *ফাতহুল বারি*: ১০/২৬৪

(অর্থাৎ সফরকে) ইল্লতের বা কারণের (মুশাক্কতের) স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এখানেও বিষয়টি এমন। সুতরাং যখনই কাপড় ঝুলিয়ে রাখা পাওয়া যাবে, নিষেধাজ্ঞা আসবে। তবে অনিচ্ছার অবস্থা ভিন্ন। কেননা তখন অহংকার না থাকা নিশ্চিত। কারণ অহংকার এমন কাজের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, যাতে বান্দার কোনো এখতিয়ার (স্বাধীনতা) নেই। এই দিক বিবেচনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাযি. কে কাপড় ঝুলানোর অনুমতি দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, 'তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নও, যারা অহংকারের কারণে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে।'[১]

পাঁচ. উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল—কাপড় ঝুলিয়ে রাখাই অহংকার থাকার প্রমাণ বহণ করে। কিন্তু এ কথা বলার সুযোগ নেই—আমার মধ্যে অহংকার নেই, তাই আমার জন্য এটি বৈধ। অনেক আলেম অহংকার থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যেমন ইবনে আবদুল বার, নববি, আইনি, ইবনে মালিক, মোল্লা আলি কারি প্রমুখ ইমাগণ। তারা অহঙ্কার থাকা ও না থাকার মধ্যে পার্থক্য করলেও এ কথা বলেননি—অহংকার না থাকলে ঝুলিয়ে রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। তারা বলেছেন, হারাম কিংবা মাকরুহে তাহরিমি হবে না, বরং তা নিন্দনীয় ও মাকরুহে তানযিহি হবে। সুতরাং তাদের মতামতকে ঢাল বানিয়ে অহঙ্কার না থাকলে টাখুনর নিচে কাপড় পরা যাবে—এমন বৈধতা দেওয়া যায় না।

সর্বোপরি হাদিসের এত কঠোর বাণী সত্ত্বেও এ ব্যাপারে শিথিলতা কামনা করা কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় হতে পারে না।[২]

* * *

গায়ক, নায়ক ও খেলোয়াড়দের প্রতি ভালোবাসা এবং আমাদের ভ্রান্তি

কাউকে ভালোবাসা না বাসা; পছন্দ করা কিংবা অপছন্দ করা; কারও সাথে শত্রুতা রাখা কিংবা মিত্রতা রাখা—এর জন্য ইসলাম একটি মাপকাঠি দিয়েছে। সেই মাপকাঠি হচ্ছে ঈমান। মা-বাবা, ভাইবোন, স্ত্রী-ছেলে-সন্তানসহ সকল

---

১. *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম*: ৪/১০৭-১০৮

২. *আত-তামহিদ*: ৩/২৪৪; *আল-মিনহাজ*: ১৪/৬২; *ফাতহুল বারি*:১০/২৬৩-২৬৪; *আল-হিন্দিয়্যাহ*: ৩/৩৩৩; *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম*: ৪/১০৫

নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা হয়ে থাকে স্বভাবগত। এটা আল্লাহ তায়ালা জন্মগতভাবেই সবার মধ্যে দান করেছেন। এ ছাড়া অন্য সকল মানুষের প্রতি একজন মুমিনের ভালোবাসা হতে পারে ঈমানের কারণে। তেমনিভাবে কাউকে অপছন্দ করা কিংবা কারও প্রতি শত্রুতা রাখা—সেটা হতে পারে ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে।

একজন মুমিনের ভালোবাসা থাকবে অন্য মুমিনের প্রতি। অন্য মুমিনের প্রতি কোনো বিদ্বেষ থাকবে না; থাকতে পারে না। আর একজন কাফেরের প্রতি থাকবে দুশমনি ও বিদ্বেষ। তবে মুমিনের এই ভালোবাসা ও বিদ্বেষ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে নয়, বরং এটা তার ঈমানের দাবি। কেননা হযরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত— নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[১]

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ.

‘যে ব্যক্তির ভালোবাসা ও শত্রুতা, দান করা ও না -করা, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে থাকে, সে পূর্ণ ঈমানদার।’[২]

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য, ভালোবাসা-না বাসা, পছন্দ করা-অপছন্দ করার ইসলামি এই মূলনীতি থেকে মুমিন-সমাজ অনেক দূরে সরে গেছে। আমরা এর প্রতি ভ্রুক্ষেপই করছি না। একজন মুমিন যে কাউকে ভালোবেসে ফেলে; যে কাউকে মহব্বত করে ফেলে; অথচ তার এই মহব্বত এবং ভালোবাসা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে কতটুকু বৈধ, সেটা জানার চেষ্টাও করে না।

কিছু কিছু ভালোবাসা যে অবৈধ, এটা তো প্রায় সবারই জানা। যেমন একজন গায়ক কিংবা নায়ক-নায়িকাকে ভালোবাসা যে অবৈধ, সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কোনো মুমিনেরই তা জানা থাকার কথা। কারণ এ কথা তো নিশ্চিত, তার প্রতি ভালোবাসা তার ওই হারাম পেশা এবং হারাম কাজের জন্যই। সুতরাং এই ভালোবাসা বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু কিছু কিছু ভালোবাসা যে অবৈধ, এটা সবাই বোঝেন না। যেমন কাউকে যদি বলা হয়—একজন জাতীয় খেলোয়াড়কে শুধু খেলার কারণেই ভালোবাসা অবৈধ, তাহলে হা করে তাকিয়ে থাকবে এবং আশ্চর্য হয়ে যাবে। অথচ এটিই বাস্তব। বিষয়টি বুঝতে হলে খেলা কখন বৈধ হয়, কখন অবৈধ হয়

---

১. ولفظه : مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

২. *সুনানে আবু দাউদ: ৪৬৮১*

সেটা বুঝতে হবে। ইসলামি শরিয়তে কোনো খেলা বৈধ হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক শর্ত রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত হচ্ছে—খেলাকে পেশা বানানো যাবে না, এবং সেটাকে মাকসাদে হায়াত তথা 'জীবনের উদ্দেশ্য' বানানো যাবে না।

আমাদের দেশের যে সকল ক্রিকেটার কিংবা ফুটবলার জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণ করেন, যারা বিশ্বকাপ কিংবা আইপিএল-এ খেলেন, প্রথমত তাদের পেশাই হচ্ছে খেলা। তারা শুধু খেলার জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হতে বেতনভাতা পেয়ে থাকেন। তাদের জীবনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে খেলা। তাদের সার্বক্ষণিক চিন্তাই হল, কীভাবে ভালো থেকে ভালো খেলা যায়। উপরন্তু শরিয়তে খেলা বৈধ হওয়ার আরও যে সকল শর্ত রয়েছে, তা তাদের খেলায় পাওয়া যায় না। সুতরাং এই খেলা বৈধ হতে পারে না, বৈধ হওয়ার সুযোগ থাকে না। আর এ কথা তো সুস্পষ্ট—তাদের প্রতি ভালোবাসা তাদের ঈমানের কারণে কিংবা নেক আমলের কারণে নয়; বরং তাদের ভালো খেলার কারণেই। সুতরাং একজন খেলোয়াড়ের প্রতি কেবল তার খেলার কারণে ভালোবাসা, বৈধ ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

একই কথা গায়ক-গায়িকা, নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। খেলোয়াড়ের বিষয়টি অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকলেও গায়ক ও নায়কদের বিষয়টি তো কারও কাছেই অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। কারণ আমাদের সমাজের গান-বাজনা, নাটক, সিনেমা এগুলো যে হারাম, তা তো কারও অজানা নয়। তাই এ সকল পেশায় জড়িত হওয়া এবং এগুলোকে উপার্জনের মাধ্যম বানানো বৈধ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর এ কথা একেবারে সুস্পষ্ট—একজন গায়ক বা গায়িকা, নায়ক কিংবা নায়িকার প্রতি ভালোবাসা তাদের ঈমানের কারণে কিংবা নেক আমলের কারণে নয়; বরং তাদের ভালো গান, সিনেমা বা নাটকের কারণেই। সুতরাং একজন গায়ক বা গায়িকা, নায়ক কিংবা নায়িকার প্রতি কেবল তার গান-সিনেমা বা নাটকের কারণে ভালোবাসা, বৈধ ভালোবাসার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

যারা কোনো চিন্তা-ফিকির ছাড়াই নির্দ্বিধায় বলে ফেলেন, 'আই লাভ সাকিব খান' 'আই লাভ সাকিব আল হাসান' 'আই লাভ ..., তারা কি একটু ভেবে দেখবেন?

* * *

বিবিধ

আওলাদে রাসুল শব্দের ব্যবহার : কিছু সংশয় নিরসন

কাউকে আওলাদে রাসুল বা রাসুলের বংশধর বলার ক্ষেত্রে; বিশেষত হযরত মাদানি রহ. এর বংশকে রাসুলের বংশধর বলার ক্ষেত্রে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপিত হয়। যেমন—

এক. ইসলামে নসব (বংশধারা) পিতা থেকে প্রমাণিত হয়, মাতা থেকে নয়। আর এ কথা তো সবারই জানা—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পুত্রসন্তান জীবিত থাকেননি। তাই পরবর্তী কেউ আওলাদে রাসুল দাবি করার কোনো সুযোগ নেই।

দুই. আওলাদ শব্দটি বহুবচন, যার অর্থ সন্তানগণ, সুতরাং এক ব্যক্তি আওলাদে রাসুল হন কীভাবে!?

তিন. শুধু দাবি করলেই কি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ বা বংশধর হওয়া যায়! নিজের নসব নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে কিনা, তা দেখতে হবে না!

চার. যদি ধরেই নিই—তার নসব নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার বা হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাহলে আমার নসব আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তো আমি কি 'আওলাদে আদম' লিখব?

প্রথম আপত্তির বিশ্লেষণ: শরিয়তের মূলনীতি হল নসবের ক্ষেত্রে সন্তান পিতার অনুগামী, তাই সন্তান নিজ বাবা ও দাদার দিকে সম্বন্ধ হবে, মা ও নানার দিকে নয়। এ কারণেই তাদেরকে তাদের নানার 'আবনা' বা 'ইবন' (সন্তান) বলা হয় না। কিন্তু আওলাদ (أولاد) ও যুররিয়্যাহ (ذرية)—এমন দুটি আরবি শব্দ যেগুলো শুধু ছেলেদের বংশধরকেই বলা হয় না, বরং মেয়েদের সন্তানদেরও তাদের নানার আওলাদ ও যুররিয়্যাহ বলা যায়। কয়েকটি প্রমাণ দেখুন:

ক. কুরআনে কারিমে মায়ের দিকে সম্বন্ধ করেই যুররিয়্যাহ (আওলাদের সমার্থক শব্দ) বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শাবি রহ. বলেন, আমি হাজ্জাজের কাছে ছিলাম, এমন সময় ইয়াহইয়া ইবনে ইয়ামুরকে নিয়ে আসা হল। হাজ্জাজ তাঁকে বলল, তুমি নাকি হাসান এবং হুসাইনকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুররিয়্যাহ (আওলাদ) মনে করো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

হাজ্জাজ বলল, হয় তুমি এ বিষয়ে কুরআন থেকে সুস্পষ্ট কোনো দলিল পেশ করবে, নতুবা তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলব...

তিনি সুরা আনআমের ৮৪ নং আয়াতটি উপস্থাপন করেন—

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ۦ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ ۚ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ـ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِينَ.

'আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক এবং ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি এবং পূর্বে আমি নুহকে পথ প্রদর্শন করেছি—তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মুসা ও হারুনকে। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরও যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।'

আয়াতে লক্ষণীয় হল, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর কোনো পিতাই ছিলেন না। কিন্তু তার মাতা মারইয়াম আলাইহাস সালাম যেহেতু নুহ আলাইহিস সালাম এর বংশধর ছিলেন, তাই উপরোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে নুহ আলাইহিস সালাম এর সন্তান বলা হয়েছে।[১]

প্রতীয়মান হল, কুরআনে কারিমে (ذرية) শব্দটি মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে ব্যবহার করা হয়েছে। আর আওলাদ ও যুররিয়্যাহ শব্দ দুটি তো একই।

খ. হাফেজ সুয়ুতি রহ. বলেন, ফকিহ ও বিশেষজ্ঞগণ শুধু আওলাদ শব্দ এবং নসবের আওলাদের মাঝে পার্থক্য করেছেন। তাদের ভাষ্যমতে—কেউ যদি তার কোনো সম্পত্তি ওয়াকফ করে বলে—وقفت على أولادي আমার আওলাদের জন্য ওয়াকফ করলাম, 'আমার নসবের বা বংশের আওলাদ' যদি না বলে, তাহলে এই ওয়াকফে ছেলের সন্তানগণ যেমন অন্তর্ভুক্ত হবে, তেমনিভাবে মেয়ের সন্তানরাও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে।[২] বোঝা গেল—আওলাদ শব্দটি ব্যাপক; ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সন্তানকেই আওলাদ বলা হয়।'[৩]

---

১. তাফসিরে নাইসাবুরি: ১/২৩০

২. *আল-হাওয়ি লিল ফাতাওয়া*, সুয়ুতি: ২/৩১

৩. সুয়ুতি রাহি. যে মাসআলার কথা বলেছেন, এ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য জানার জন্য দেখুন *মিনহাজুত তালিবিন*, নববি: পৃ. ৩২১; *তুহফাতুল মিনহাজ বিশারহিল মিনহাজ*: ৬/২৬৬-২৬৭; *মুগনিল মুহতাজ*, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে খতিব আশ-শারবিনি: ২/৫০০; *আল-ফাতাওয়াল হাদিসিয়্যাহ*, ইবনে হাজার হাইতামি, পৃ. ১৬৭-১৬৮

গ. আমরা দেখি, রাজাবাদশা এবং বড় ব্যক্তিদের মেয়েদের সন্তানগণ নিজেদের নানার দিকে সম্বন্ধ করে অমুকের আওলাদ বা বংশধর বলে থাকে। সুতরাং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো সত্তা, যার মতো সম্মানিত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই, তার মেয়েদের বংশধরকে আওলাদে রাসুল বললে কী অসুবিধা হয়ে যায়! এ কথাটি আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওযি রহ.-ও *জিলাউল-আফহাম* গ্রন্থে (পৃ. ২৯৯-৩০১) বলেছেন।

আর যদি ধরেও নেওয়া হয়—আওলাদ কেবল ছেলের ঘরের সন্তানকেই বলা যায়, মেয়েদের সন্তানদের আওলাদ বলা যায় না, তবুও ফাতেমা রাযি. এর বংশধরকে আওলাদে রাসুল বলতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সবার ক্ষেত্রে যদিও বিধান হল নসব পিতা থেকেই হবে, কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একক বৈশিষ্ট্য যে, তার মেয়েদের পুত্রসন্তান ও তাদের পরবর্তী বংশধরকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেই সম্বন্ধ করা হবে, এবং তার থেকে তাদের নসব ও বংশ প্রমাণিত হবে। এ কারণেই তাদেরকে নবির বংশধর এবং আওলাদে রাসুল অথবা আবনাউর রাসুল বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওযি রহ. বলেন, মুসলমানগণ এ বিষয়ে একমত—হযরত ফাতেমা রাযি. এর সন্তানগণ নবিজির আওলাদের অন্তর্ভুক্ত।[১] নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই একক বৈশিষ্ট্যের কথা অসংখ্য ওলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন।[২] এ প্রসঙ্গে তারা নিম্নোক্ত দলিলগুলো পেশ করে থাকেন—

- আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ.

'অতঃপর তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর যে তোমার সাথে এ বিষয়ে ঝগড়া করে, তবে তুমি তাকে বলো, 'এসো আমরা ডেকে নিই আমাদের সন্তানদেরকে ও তোমাদের সন্তানদেরকে। আর আমাদের নারীদেরকে ও তোমাদের নারীদেরকে এবং আমাদের নিজদেরকে ও তোমাদের নিজদেরকে।' তারপর আমরা বিনীত প্রার্থনা করি, 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত।'

---

১. *জিলাউল আফহাম*, পৃ. ২৯৯-৩০১

২. এ প্রসঙ্গে তাদের বক্তব্য দেখুন *মুগনিল মুহতাজ*, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে খতিব আশ-শারবিনি: ২/৫০০, ৩/৮২; *আস-সাওয়াইকুল মুরসালাহ*, ইবনে হাজার হাইতামি পৃ. ২২১; *ফাতাওয়া হাদিসিয়্যাহ*, ইবনে হাজার হাইতামি পৃ. ১৬৮; *আল-হাওয়ি লিল-ফাতাওয়া*, সুয়ুতি: ২/৩১; *আল-মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ*: ২/২৬৮

আল্লামা ফখরুদ্দিন রাযি রহ. বলেন, 'আয়াতটি এ কথার প্রমাণ—হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান ছিলেন। কেননা আয়াতে সন্তানদেরকে ডাকার কথা বলা হয়েছে, আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-হুসাইনকে ডেকেছিলেন।[১]

- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي (ফাতেমা আমার একটি অংশ)।[২] সামহুদি রহ. এই হাদিস সম্পর্কে বলেন, জানা কথা—ফাতেমা রাযি. এর সন্তানগণ তারই অংশ। সুতরাং ফাতেমার মাধ্যমে তারাও (ফাতেমা রাযি. এর সন্তানগণ) নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি অংশ। আর এটা তার সন্তানদের জন্য চূড়ান্ত সম্মান।[৩]

- নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাযি. কে বলেছেন, إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّد—আমার এই ছেলে সাইয়িদ।[৪] এই হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান রাযি. কে নিজের সন্তান বলেছেন, অথচ তিনি ফাতেমা রাযি. এর সন্তান।

- এ মর্মে আরও সুস্পষ্ট একটি হাদিস রয়েছে।[৫] হযরত ফাতেমা কুবরা[৬] বর্ণনা করেন—নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,[৭] 'সকল আদম-সন্তান তাদের আসাবার (পিতা) দিকে সম্বন্ধ হয়, তবে ফাতেমার সন্তান ভিন্ন। কেননা আমিই তাদের পিতা, আমিই তাদের আসাবা।[৮]

দ্বিতীয় আপত্তির বিশ্লেষণ: দ্বিতীয় আপত্তি ছিল—আওলাদ শব্দটি বহুবচন, সুতরাং এক ব্যক্তি আওলাদ হন কীভাবে?

মূলত শব্দটি ছিল—মিন আওলাদির রাসুল (রাসুলের আওলাদদের একজন)। সংক্ষেপে আওলাদে রাসুল বলা হয়। এভাবে সংক্ষেপ করে বলা

---

১. *তাফসিরে রাযি*: ৮/৮৯
২. *সহিহ বুখারি*: ৩৭১৪; *সহিহ মুসলিম*: ২৪৪৯
৩. *তাফসিরে রুহুল মাআনি*: ২৬/১৬৫
৪. *সহিহ বুখারি*: ২৭০৪
৫. তবে সনদের বিচারে হাদিসটি দুর্বল।
৬. তিনি হলেন আলি রাযি. এর ছেলে হুসাইন রাযি. এর মেয়ে।
৭. ولفظه : كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصَبَتِهِمْ إِلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ، وَأَنَا عَصَبَتُهُمْ
৮. *তারিখে বাগদাদ*: ১৩/১৬৩-১৬৪; *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি: ৩/৩৬; *মুসনাদে আবু ইয়ালা*: ১২/১০৯) হাদিসটি হযরত জাবির ও উমর রাযি. থেকেও বর্ণিত হয়েছে। জাবির রাযি. এর হাদিস দেখুন, *মুসতাদরাকে হাকিম*: ৩/১৬৪। উমর রাযি. এর হাদিস দেখুন, *মুজামে কাবির*, তাবারানি: ৩/৩৫

সমাজে এবং ভাষাজগতের খুবই প্রসিদ্ধ একটি রীতি। এবং এর সঙ্গে শরঈ কোনো জটিলতার সম্পর্ক নেই।

তৃতীয় আপত্তির বিশ্লেষণ: রাসুলের বংশধর হওয়ার জন্য অবশ্যই বংশলতিকা প্রমাণিত হতে হবে। হযরত মাদানি রহ. এর বংশলতিকা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রমাণিত। তাদের বংশধারা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সূত্রবদ্ধ। হুসাইন আহমদ মাদানি রহ. এর সিলসিলায়ে নসব (বংশতালিকা) নিম্নরূপ—

১. হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২. সাইয়িদা হযরত ফাতেমা রাযি.
৩. সাইয়িদ হুসাইন রাযি.
৪. সাইয়িদ আলী আছগর রহ. (জায়নুল আবিদিন)
৫. সাইয়িদ হুসাইন আছগর রহ.
৬. সাইয়িদ আলি রহ.
৭. সাইয়িদ মুসা রহ.
৮. সাইয়িদ হুসাইন রহ.
৯. সাইয়িদ মুহাম্মাদ মাদানি, নাসির তিরমিজি রহ.
১০. সাইয়িদ হুসাইন রহ.
১১. সাইয়িদ আলি রহ.
১২. সাইয়িদ আহমদ তুখতা রহ. তিমছালে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
১৩. সাইয়িদ শাহ মুহাম্মাদ রহ.
১৪. সাইয়িদ শাহ আবু বকর রহ.
১৫. সাইয়িদ শাহ হামযা রহ.
১৬. সাইয়িদ শাহ আহমদ জাহিদ রহ.
১৭. সাইয়িদ শাহ যায়েদ রহ.
১৮. সাইয়িদ নূরুল হক রহ.
১৯. সাইয়িদ মুহাম্মদ আবদুল জাহেদি রহ.
২০. সাইয়িদ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ রহ.
২১. সাইয়িদ শাহ রাজু রহ.
২২. সাইয়িদ মুনাওয়ার রহ.
২৩. সাইয়িদ শাহ কলন্দর রহ.
২৪. সাইয়িদ লুধন রহ.

২৫. সাইয়িদ শাহ মাহমুদ রহ.
২৬. সাইয়িদ শাহ মুহিব্বুল্লাহ রহ.
২৭. সাইয়িদ সিফাতুল্লাহ রহ.
২৮. সাইয়িদ শাহ খাইরুল্লাহ রহ.
২৯. সাইয়িদ শাহ মুহাম্মদ মাহেশারি রহ.
৩০. সাইয়িদ মুদ্দন রহ.
৩১. সাইয়িদ শাহ নূর আশরাফ রহ.
৩২. সাইয়িদ জাহাঙ্গীর বখশ রহ.
৩৩. সাইয়িদ পির আলি রহ.
৩৪. সাইয়িদ হাবিবুল্লাহ রহ.
৩৫. কুতবুল আলম শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানি রহ.

চতুর্থ আপত্তির বিশ্লেষণ: চতুর্থ আপত্তি ছিল—যদি ধরেই নেওয়া হয় যে, মাদানি রহ. এর নসব মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার বা হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা হলে আমার নসব আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, এখন কি আমি 'আওলাদে আদম' লিখব?

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ আর অপরাপর বংশের মধ্যে শরিয়তের বিধিবিধানে পার্থক্য রয়েছে। যেমন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ ছাড়া অন্য যে কোনো বংশের লোক যদি জাকাত গ্রহণের যোগ্য হয়, তা হলে তাকে তা প্রদান করা যাবে; কিন্তু নবিবংশের হলে প্রদান করা যাবে না। কাজেই নবিবংশের পরিচয়ের জন্য আওলাদে রাসুল লেখা উচিত।

দ্বিতীয়ত আমরা সবাই আদমের সন্তান। এতে কারও কোনো বিশেষত্ব বা ফজিলত নেই। কিন্তু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হওয়া বা কোনোভাবে তার বংশের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারা, এতে বিশেষ ফজিলত এবং উপকারিতা রয়েছে।

যেমন—হযরত উমর রাযি. হযরত আলি রাযি. এর মেয়ে উম্মে কুলছুমকে বিবাহ করেন। এরপর কেন এত আগ্রহী হয়ে তাকে বিয়ে করলেন—এর কারণ বর্ণনা করে বলেন,[১] 'আমি আমার মনের আনন্দের কারণে এই বিবাহ করিনি,

---

১. ولفظه : إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، ولَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰه يَقُولُ: إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا سَبَبِي ونَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي، وبَيْنَ نَبِيِّ اللّٰهِ سَبَبٌ ونَسَبٌ

তবে আমি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি—কেয়ামতের দিন প্রতিটি সম্পর্ক ও নসব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (উপকারী সাব্যস্ত হবে না) কিন্তু আমার সম্পর্ক ও নসব বাকি থাকবে। তাই আমি পছন্দ করলাম, যেন আমার মাঝে এবং নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে একটি সম্পর্ক ও নসব থাকে। এ কারণেই আমি আলি রাযি. এর মেয়েকে বিবাহ করেছি।[১]

অবশ্য প্রশ্ন জাগতে পারে—বিভিন্ন হাদিসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে বাইতকে তাকওয়া অর্জনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেছেন এবং এ কথা জানিয়ে দিয়ে গেছেন—কেয়ামতের দিন শুধু তাকওয়া এবং নেক আমলের মাধ্যমেই তার নিকটবর্তী হওয়া যাবে। অথচ এই হাদিসে এর উলটো বলা হয়েছে। এর জ্ঞানগর্ভ উত্তর থাকলেও এখানে এই আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

* * *

ধারণামাত্রই কি গুনাহ?

একজন মুমিনের ইসলামের পরিপূর্ণতা হল, তার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে। আর হাত ও জবানকে উদ্‌বুদ্ধকারী অভ্যন্তরীণ যে কারণসমূহ রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও কুধারণা। এগুলোই হচ্ছে মানুষের রক্তনালি দিয়ে চলাচলকারী শয়তানের ক্ষেত্র। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَٰوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ.

‘শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে চায়। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না।’ (সুরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

শয়তান মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে অন্যের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি করে। তাই হাদিসে মন্দ ধারণা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.

---

১. *মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক*; ৬/১৬৪ *মুসনাদে বাজ্জার*: ১/৩৯৭, ৭/৬৪; *মুজামুত তাবারানি*: ৩/৩৬-৩৭; *মুসতাদরাকে হাকিম*: ৩/১৪২; *আল-আহাদিসুল মুখতারাহ*: ১/১৯৮, ১/৩৯৮ (হাইসামি রাহি. উক্ত হাদিসের রাবিদের নির্ভরযোগ্য বলেছেন, দেখুন—*মাজমাউয যাওয়াইদ*: ৯/১৭৫-১৭৬)

‘তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো। ধারণাই হচ্ছে বড় মিথ্যা। তোমরা দোষ তালাশ করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, পরস্পর হিংসাপোষণ করো না, একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না; বরং তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে যাও।’[১]

হাদিসে উল্লেখিত ‘যন’ (الظن) বা ধারণা দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এর অর্থ কি এই—ধারণার ভিত্তিতে কোনো বিধানই প্রমাণিত হবে না? খাত্তাবি রহ. বলেন, ‘হাদিসের অর্থ এই নয়—ওই ‘যন’ এর ভিত্তিতে কাজ করা পরিত্যাগ করতে হবে, যে যনের দ্বারা সচরাচর বিধান আহরিত হয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘যন’ বা ধারণাকে প্রমাণিত ও বাস্তব গণ্য করা, যার দ্বারা ‘মাযনুন’ তথা যার প্রতি ধারণা করা হয়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রমাণ ছাড়া অন্তরে যা উদয় হয়, তার ক্ষেত্রেও একই কথা। কারণ ‘যন’ এর সূচনা হয় মনের ইচ্ছা থেকে, যা প্রতিহত করা সম্ভব নয়। আর মানুষ যা করতে সক্ষম নয়, তা করতে বাধ্যও নয়। সুতরাং যন বা ধারণার ভিত্তিতে কাজ করা নিষেধ নয়। এটি নবিজির হাদিস—‘আল্লাহ তায়ালা উম্মতের অন্তরে যা উদয় হয়, সেটিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন’ তা থেকে গৃহিত।

কুরতুবি রহ. বলেন, হাদিসে ‘যন’ দ্বারা উদ্দেশ্য—অকারণে কারও প্রতি তুহমত বা অপবাদ দেওয়া। যেমন কেউ কারও প্রতি কোনো অশ্লীলতার অপবাদ দিল, তার মধ্যে এই অশ্লীলতার কিছু প্রকাশ হওয়া ছাড়াই। এ কারণে এর সাথে ‘ওয়ালা তাজাসাসু’ (তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না) বাক্য সংযোজন করা হয়েছে। কারণ মানুষের অন্তরে কারও প্রতি অপবাদের চিন্তা উদয় হয়। এরপর সে এটিকে প্রমাণিত করার জন্য গোয়েন্দাগিরি, অনুসন্ধান ও তদন্ত শুরু করে। এ কারণেই তা থেকে বারণ করা হয়েছে। হাদিসটি কুরআনের এই আয়াতের সঙ্গে মিল রাখে—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجۡتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٌۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।’

---

১. *সহিহ বুখারি*: ৫১৩৬; সহিহ মুসলিম: ২৫৬৩

আয়াতের বাচনভঙ্গি মুসলমানের সম্মান খুব ভালো করে বাঁচানোর প্রতি নির্দেশ করে। কারণ আয়াতের শুরুতেই ধারণার ভিত্তিতে এর মধ্যে ডুবে যেতে বারণ করা হয়েছে। এখন যদি ধারণাকারী বলে, আমি তদন্ত করছি যাতে বিষয়টি প্রমাণ করতে পারি, তাকে বলা হবে (হাদিসের অপর অংশ)— তুমি গোয়েন্দাগিরি করো না। সে যদি বলে, আমি কোনো তদন্ত বা গোয়েন্দাগিরি ছাড়াই প্রমাণ পেয়েছি, তখন তাকে বলা হবে হাদিসের আরেক অংশ— তোমাদের কেউ যেন অপরজনের গিবত না করে।'[১]

ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কেন?

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকি উসমানি বলেন, আলোচ্য হাদিসে, فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ (ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা) এর মধ্যে الْحَدِيثِ শব্দটির উদ্দেশ্য হতে পারে ওই কথা, যা অন্তরে উদয় হয়, যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। মানুষ চাইলেই কোনো কথা মনে আসা থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। আর যা মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, সেটি মাফ। পক্ষান্তরে নিষিদ্ধ ধারণা হচ্ছে—তাহকিক ও প্রমাণ ছাড়াই কোনো বিষয়কে নিশ্চিত মনে করা এবং তা দ্বারা অন্যকে অপবাদ দেওয়া। এটি 'হাদিসুন নাফস' তথা মনের মধ্যে আসা কথার চেয়ে কঠিন। এই বিবেচনায়ই ধারণাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যা বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, এখানে আরেকটি সম্ভাবনা রয়েছে। ধারণার উপর নির্ভর করে কোনো অপবাদ দেওয়া হাদিসের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমানকে তাহকিক ও যাচাই করা ছাড়া অপবাদ দেওয়া এটি ওই মিথ্যা, যাতে কোনো অপবাদ নেই তার থেকেও কঠিন। কারণ এতে তো অন্য কোনো মুসলমানের কোনো ক্ষতি নেই। পক্ষান্তরে অপবাদের মধ্যে দুটি বিষয় পাওয়া যায়ঃ—এক হচ্ছে মিথ্যা বলা, দ্বিতীয় হচ্ছে অন্যকে কষ্ট দেওয়া।[২]

অনুমাননির্ভর সিদ্ধান্ত অনেক সমস্যার মূল

আমরা অনেক সময় কারও কারও ব্যাপারে অনুমানের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। কখনও কারও ব্যাপারে কোনো কথা শুনলাম, অতঃপর এই কথার উপর ভিত্তি করেই লোকটি সম্পর্কে ভালোমন্দের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। অথচ

---

১. *ফাতহুল বারি: ১০/৪৮১*

২. *তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম: ৫/২৭৭*

এভাবে অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে অনেক বড় সমস্যা তৈরি হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনে মুবারক রহ. বলেন, 'আমি আওযায়ি রহ. এর সাথে বৈরুতে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, হে খোরাসানি! আবু হানিফা (ইমাম আবু হানিফা রহ.) নামে কুফায় যে লোকটি প্রকাশ পেয়েছে সে কে?'

ইবনে মুবারক বলেন, এরপর আমি ঘরে গিয়ে তিনদিন পর্যন্ত আবু হানিফার কিতাবাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে তার কয়েকটি উত্তম মাসআলা বের করলাম। তৃতীয় দিন আমি আওযায়ি রহ. এর কাছে এলাম। তিনি ছিলেন মসজিদের মুআযযিন ও ইমাম। আমার হাতে কিতাব দেখে বললেন—এটা কোন কিতাব? আমি তার হাতে দিলাম। তিনি সেখান থেকে কয়েকটি মাসআলা দেখলেন, যেগুলোতে আমি قال النعمان 'নুমান (ইমাম আবু হানিফা রহ.) বলেছেন' লিখে রেখেছি। তিনি আজান দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়তেই থাকলেন। এভাবেই কিতাবের শুরুর অংশ পড়া হয়ে গেল। অতঃপর জামার আস্তিনে কিতাবটি রেখে ইকামত দিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজের পর আবারও সেটি বের করে পড়তে লাগলেন। এভাবে পূর্ণ কিতাব পড়ে ফেললেন। এরপর বললেন, হে খোরাসানি! নুমান ইবনে সাবিত লোকটি কে?

আমি বললাম, ইরাকের এক শায়খ। তিনি বললেন, উনি তো এক মহান ব্যক্তি, মাশায়েখদের একজন। আমি বললাম, তিনিই আবু হানিফা, যে ব্যক্তি থেকে আপনি নিষেধ করেছিলেন।[১]

মানাকিবুল ইমাম কারদারি গ্রন্থে (পৃ. ৪৫) ঘটনাটি আরও বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। সেখানে উপরোক্ত অংশের পর এসেছে, ইবনে মুবারক বলেন, অতঃপর মক্কায় আমরা একত্রিত হলাম। সেখানে আওযায়িকে দেখলাম উপরোক্ত মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে আবু হানিফার সাথে একমত পোষণ করছেন, আর ইমাম রহ. তার সামনে ওই মাসআলাগুলো আমি যেভাবে লিখেছিলাম, এর চেয়েও বেশি খুলে বয়ান করছেন। যখন দুজন আলাদা হলেন, আমি আওযায়িকে জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি (ইমাম আবু হানিফা রহ.) কেমন? তিনি বললেন, লোকটির প্রচুর জ্ঞান এবং অধিক আকলের কারণে আমার ঈর্ষা হয়েছে। আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি তার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে ছিলাম। তুমি

---

১. *তারিখে বাগদাদ*: ১১/১৮, *আদাবুল ইখতিলাফ*, পৃ. ৭০

লোকটির সাথে লেগে থাকো। বাস্তবতা হচ্ছে, আমার কাছে তার ব্যাপারে যে খবর পৌঁছেছে, বাস্তবে তিনি এমন নন।[১]

উপরের ঘটনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—কারও ব্যাপারে অনুমাননির্ভর কথা বা শোনা কথার উপর ভরসা করে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া উচিত নয়। অনেকে ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং তার মাজহাব সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন। তারা যদি ইমাম সাহেব রহ. এবং তার মাজহাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন, তা হলে তার এবং তার মাজহাবের ভক্ত হয়ে যেতেন।

আজ আমরা অনেকে দূর থেকে অন্য ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করি, তাকে খারাপ ভাবি। অথচ যদি সরাসরি তার সাথে কথা হত, তার সাথে দেখা হত, ভুল ধারণা দূর হয়ে যেত। পাশাপাশি আমরা মন্দ ধারণার গুনাহ থেকে মুক্তি পেতাম। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কারও ব্যাপারে না জেনে মন্দ ধারণা করা থেকে মুক্তি দান করুন, আমিন।

জাল ঘটনা এবং আমাদের অসতর্কতা

বিভিন্ন কিতাবে আমরা অনেক ওলি ও বুজুর্গদের স্বপ্ন, কাশফ, কারামত ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনার আলোচনা পাই। এ সকল ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা অস্বীকার করি না। তবে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অবশ্যই এ সকল ঘটনার সনদ যাচাই করতে হবে। এর অর্থ এই নয়—যে সকল বুজুর্গ বা ওলির ক্ষেত্রে এগুলো ঘটেছে, তারা নিজেরা এগুলো বানিয়ে নিয়েছেন! লক্ষণীয় হল, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে বলেছেন,[২] 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।'[৩] এমন কঠোর বাণী থাকার পরও অনেকে নবির নামে হাদিস বানিয়েছে। জাল হাদিস রটিয়েছে। সে ক্ষেত্রে বুজুর্গ ও অলি-আউলিয়াদের বেলায় এমন কিছু ঘটা আরও স্বাভাবিক ব্যাপার।

বর্তমানে আমাদের মধ্যে একটি প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে। আমরা বিভিন্ন আমলের প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বিভিন্ন জাল হাদিস এবং এ ধরনের ঘটনাগুলোকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করে থাকি। আর সাধারণ মানুষকেও এগুলোর প্রতি অধিক মনোযোগী দেখা যায়। অথচ আমলের ফজিলত

---

১. *আদাবুল ইখতিলাফ*, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা, পৃ. ৭১

২. من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

৩. *সহিহ বুখারি*: ১০৭

বর্ণনা করার জন্য এবং মানুষকে আমলের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করার জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদিস রয়েছে। আরও আছে নবিজির সিরাত, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়িন, আউলিয়ায়ে কেরাম ও উলামা-সুলাহাদের জীবনী। এগুলো পড়ে আমরা নিজেরাও উদ্‌বুদ্ধ হতে পারি, এবং অন্যদেরকেও উদ্‌বুদ্ধ করতে পারি। কিন্তু আমরা এগুলোকে ততটুকু গুরুত্ব দিই না, যতটুকু পূর্বোক্ত বিষয়গুলোকে দিয়ে থাকি।

* * *

শবে বরাতের আমল কি চতুর্থ শতাব্দীর পরের উদ্ভাবন?

শবে বরাত তথা মধ্য শাবানের রাত হচ্ছে বছরের অন্যান্য সাধারণ রাতের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাত। নির্ভরযোগ্য হাদিসে এর ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

অনেকে তারতুশি রহ. (৪৫১-৫২০ হি.) এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে এই রাতের ফজিলত অস্বীকার করে থাকেন এবং এই রাতের আমল ৪৪৮ হিজরিতে উদ্ভব হয়েছে বলে দাবি করে থাকেন। তারতুশি রহ. (৪৫১-৫২০ হি.) *মুখতাসারুল হাওয়াদিছি ওয়াল-বিদা* গ্রন্থে বলেন, ‘‘আবু মুহাম্মদ মাকদিসি আমাকে জানিয়েছেন—এই ‘সালাতুর রাগাইব’ যা রজব এবং শাবানে পড়া হয়, তা বাইতুল মুকাদ্দাসে ছিল না। সর্বপ্রথম এটি চালু হয় ৪৪৮ হি. এর শুরুতে। ‘ইবনে আবিল হামরা’ নামে পরিচিত ‘নাবলুস’ এর এক ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাসে আমাদের কাছে আসে। সে সুন্দর তেলাওয়াত করতে পারত। অর্ধ শাবানের রাতে মসজিদে আকসায় সে নামাজ পড়ল। তার পিছনে আরেকজন তাহরিমা বাঁধল, এরপর তৃতীয় আরেকজন, এরপর চতুর্থ আরেকজন এভাবে নামাজ শেষ করতে করতে দেখা গেল অনেক লোকের জামাত। পরবর্তী বছর লোকটি আবারও এল এবং তার সাথে অনেক লোক নামাজ পড়ল। এভাবে নামাজটি মসজিদে আকসাসহ মানুষের ঘরবাড়িতেও প্রচার লাভ করল। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এটি এমনভাবে স্থির হয়ে গেল, যেন এটিই নিয়ম!”[১]

এই হচ্ছে তারতুশি রহ. (৪৫১-৫২০ হি.) এর বক্তব্য। তারতুশি রহ. শুধু বিশেষ পদ্ধতির ভিত্তিহীন নামাজের ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে অর্ধ শাবানের রাতের ইবাদত ৪৪৮ হিজরিতে উদ্ভব হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না।

---

১. *মুখতাসারুল হাওয়াদিছি ওয়াল-বিদা*, তারতুশি, পৃ. ৮৬-৮৭

আর অর্ধ শাবানের বিশেষ কোনো নামাজ নেই—সে কথা সকলেই বলেন। এ সংক্রান্ত সকল হাদিস সম্পর্কে মুহাদ্দিসিনে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে—এগুলো জাল। এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। বলাবাহুল্য, যে সকল মুহাদ্দিস এই 'সালাতুর রাগাইব' নামক বিশেষ পদ্ধতির নামাজকে ভিত্তিহীন বলেছেন সেই ইমাগণই বলেছেন, কোনো বিশেষ পদ্ধতি নির্ধারণ না করে নফল নামাজ পড়া, দোয়া-দরুদ, জিকির-আযকার, তিলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি এ রাতে মুস্তাহাব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট—অর্ধ শাবানের রাতের আমল চারশ শতাব্দীর পরের উদ্ভাবন, এর আগে এই রাতে ইবাদতের কোনো প্রচলন ছিল না—এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন আমার রচিত *শাবান ও শবে বরাত* গ্রন্থে।

* * *

সৌন্দর্যের চর্চা : কিছু সংশয় নিরসন

অনেকে মনে করেন—সুন্দর, ভালো, একটু পরিপাটি ও গোছালো থাকা দুনিয়াদারদের কাজ। দীনদার লোকদের জন্য এগুলো অনুচিত। তারা শুধু আখেরাতের কাজে ব্যস্ত থাকবে; তাদের কাপড় থাকবে সাদামাটা, চুল থাকবে এলোমেলো, আসবাবপত্র থাকবে অগোছালো। দামি গাড়ি-বাড়ি লেবাস-পোশাক ইত্যাদি দীনদারদের থাকার প্রশ্নই উঠে না।

প্রকৃত বিষয়টি আসলে এমন নয়। সৌন্দর্যের কয়েকটি দিক রয়েছে। একটা হল চারিত্রিক সৌন্দর্য, মনের সৌন্দর্য, কথাবার্তার সৌন্দর্য এবং আচার-ব্যবহারের সৌন্দর্য। এগুলো ধারণ ও বহন করা যে সবার জন্য অবশ্য কর্তব্য—এটা মোটামুটি সবাই বোঝেন। সৌন্দর্যের অন্যান্য দিকগুলোর মধ্যে রয়েছে, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর রাখা, নিজের লেবাস-পোশাক, আসবাবপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং গুছিয়ে রাখা; তাওফিক অনুযায়ী সুন্দর ও মানসম্মত লেবাস-পোশাক পরা। সৌন্দর্যের এই দিকগুলোকে অনেকে গুরুত্ব দেন না। মনে করেন—এটা আমার জন্য ঠিক নয়, এটা দ্বীনদারদের কাজ নয়।

এ কারণেই দেখা যায়—কেউ একটু সুন্দর বা দামি পোশাক পরলে কিংবা মূল্যবান আসবাবপত্র ব্যবহার করলে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা হয়। আর কেউ যদি নিজের তাওফিক অনুযায়ী সুন্দর গাড়ি-বাড়ি ব্যবহার করেন, তাহলে তো তিনি পুরোই দুনিয়াদার! আর শারিরীক সৌন্দর্যকে কোনো বিষয়ই মনে করা হয় না।

ফলে অনেকেরই মেদভুঁড়ি বাড়-বাড়ন্ত হয়ে গেলেও কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। বিয়ের আগে যুবকদের অনেকে এগুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ করলেও বিয়ের পরে আর করেন না। অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি ইসলামে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন-হাদিসে এ বিষয়টির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তার ঘরদোর পরিষ্কার রাখার বিষয়ে এত গুরুত্ব দিতেন যে, একটি খড়কুটাও খুঁজে পাওয়া যেত না।

অনেককে দেখা যায়—অঢেল সম্পদের অধিকারী, কিন্তু জীর্ণ কাপড়, জীর্ণ আসবাব ব্যবহার করেন। অথচ চাইলেই তিনি অনেক দামি আসবাব ব্যবহার করতে পারতেন। আবার অনেকে আছেন—যাদের সম্পদ যেমন আছে, খরচও করেন তেমনি। দামি কাপড়, দামি জুতা, দামি গাড়ি, সবকিছুই দামি, সবকিছুই সুন্দর। এই পার্থক্য শুধু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেই নয়; আলেম-উলামা, এবং দ্বীনদার শ্রেণির মধ্যেও রয়েছে। কেউ খুবই সাধারণ জীবনযাপন করেন; সাদামাটা থাকেন, কেউ আবার খুব শানশওকতে থাকেন, দামি জামা, দামি জুব্বা, দামি আতর, দামি রুমাল ব্যবহার করেন।

প্রশ্ন হল, কোনটি উত্তম? তাওফিক থাকা সত্ত্বেও সাদামাটা থাকা, নাকি তাওফিক অনুযায়ী সুন্দর থাকা, সুন্দর পরা, এবং উন্নত জীবনযাপন করা?

এ সম্পর্কে দুরকম হাদিস রয়েছে। কোনো হাদিসে একটির প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে, আর কোনো কোনো হাদিসে দ্বিতীয়টির প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে। আসলে দুরকম হাদিস এসেছে মানুষের প্রকারভেদের দিকে লক্ষ করে।

যারা সাদামাটা থাকতে পছন্দ করেন, তাদের মধ্যে দুরকম লোক রয়েছে—
ক. কৃপণতার কারণে দামি বস্তু পরিহার করেন।
খ. সাওয়াব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সাদামাটা জীবন গ্রহণ করেন।

প্রথম ব্যক্তি কৃপণ। তার কাজ গর্হিত। কুরআন-হাদিসে কৃপণের অনেক নিন্দা করা হয়েছে, যা প্রায় সবারই জানা। দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ প্রশংসনীয়। আর এমন ব্যক্তির ব্যাপারেই হাদিসে এসেছে[১]—'যে ব্যক্তি উত্তম এবং দামি পোশাক পরিহার করে আল্লাহ পাকের কাছে বিনয় প্রকাশের জন্য; অথচ সে এরকম (দামি, সুন্দর) পোশাক পরতে সামর্থ্য রাখে, এমন লোককে আল্লাহ পাক

---

১. ولفظه: مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا

কেয়ামতের দিন সকল মাখলুকের অগ্রভাগে ডেকে স্বাধীনতা দেবেন—ঈমানের (অর্থাৎ ঈমানদারদেরকে যে কাপড়ের জোড়া দেবেন, এগুলোর) যে জোড়া চায়, পরিধান করুক।'[১] অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাকে তাওফিক দিলেন দামি এবং সুন্দর জিনিস ব্যবহার করার; কিন্তু সে বিনয়ের কারণে তা পরিহার করল। এমন লোকের ব্যাপারেই এই হাদিসটি এসেছে।

অপর দিকে যারা উত্তম পোশাক পরেন, মানসম্মত আসবাব ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যেও দুই ধরনের লোক আছে—

ক. মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ মানুষ যেন তাকে বড়লোক মনে করে, সবাই যেন দেখে বাহবা দেয়—এজন্য।

খ. যিনি মনে করেন, আল্লাহ পাক আমাকে এত নিয়ামত দিলেন, তার নিয়ামত প্রকাশ করা দরকার। তাই তার নিয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ দামি লেবাস-পোশাক, দামি আসবাবপত্র তিনি ব্যবহার করেন। তিনি মনে করেন, আল্লাহ পাক সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন, তাই আমি সব সময় সুন্দর জিনিস ব্যবহার করব।

প্রথম লোকটির কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ, কবিরা গুনাহ। এটি হয়ত রিয়া বা লোকদেখানোর অন্তর্ভুক্ত হবে, নতুবা অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর উভয়টিই হারাম, যা অসংখ্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় লোকটি প্রশংসিত হবে। এমন লোকের ব্যাপারেই হাদিসে এসেছে[২]—'আল্লাহ পাক তার বান্দার মাঝে প্রদত্ত নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন।'[৩] আর এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে[4]—'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।'[৫]

মোটকথা—সম্পদ থাকার পরও যারা সাদামাটা জীবন গ্রহণ করেছেন, তাদের কেউ কৃপণতার কারণে নিন্দিত; আল্লাহর কাছে অপরাধী; অপর দিকে কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়ের উদ্দেশ্যে এমনটি করে হয়ে যাচ্ছেন নন্দিত, আখেরাতে বড় পুরস্কারের অধিকারী। আর সম্পদশালীদের মধ্যে যারা খুব শানশওকতে চলেন, তাদের কেউ কেউ লোকদেখানো ও অহংকারের কারণে হচ্ছেন আল্লাহর কাছে ঘৃণিত এবং অপরাধী। তার জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি। আর কেউ আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করার জন্য উন্নত জীবনযাপন করেন,

---

১. *সুনানে তিরমিজি:* ২৪৮১; *সুনানে আবু দাউদ:* ৪৭৭৮-এ এমনই আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

২. ولفظه: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

৩. *সুনানে তিরমিজি:* ২৮১৯

4. ولفظه: إِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَال

৫. *সহিহ মুসলিম:* ৯২

তিনি চিন্তা করেন 'আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন' তিনি ভাবেন, 'আল্লাহ পাক তার বান্দার মাঝে প্রদত্ত নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন' তাই তার সুন্দর পোশাক পরা, সুন্দর গাড়িতে চড়া, সুন্দর বাড়িতে থাকা, আর এজন্য তিনি আল্লাহর কাছে নন্দিত ও প্রশংসিত। বাহ্যিকভাবে উভয়েই তো সমান, পার্থক্য শুধু নিয়তে।

* * *

মিলাদ-মাহফিল : একটি শাব্দিক ভুল

মিলাদ শব্দটি আরবি। আরবি ব্যাকরণের পরিভাষায় শব্দটি হয়ত 'ইসমে যারফ' হবে, তখন এর অর্থ হবে—জন্মের সময়, নতুবা 'মাসদারে মিমি' হবে, তখন অর্থ হবে—জন্ম। সুতরাং 'মাহফিলুল মিলাদ' বা 'মিলাদ-মাহফিল'র পূর্ণ রূপ হল, 'মাহফিলু যিকরি মীলাদিন্নাবিয়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' অর্থাৎ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের; অথবা জন্ম-সময়ের আলোচনার মাহফিল। এই অর্থে প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের মাহফিলকে 'মিলাদ-মাহফিল' নামকরণ করতে কোনো অসুবিধ নেই। কেননা, এতে কিয়ামের পাশাপাশি কবিতার মাধ্যমে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ও জন্ম-সময়ের আলোচনা করা হয়। কিন্তু সমস্যা হল সুরায়ে ফাতেহা, ইখলাস ইত্যাদি পাঠ এবং দোয়ার মজলিসকে মিলাদ-মাহফিল নামকরণের ক্ষেত্রে। কারণ সেখানে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম কিংবা জন্ম-সময়ের কোনো আলোচনা হয় না। সুতরাং এটি শব্দের ভুল প্রয়োগ। এটাকে দোয়ার মাহফিল বলা যেতে পারে, মিলাদ-মাহফিল নয়।

লক্ষণীয় বিষয় হল, মিলাদ-কিয়ামের প্রচলন খাইরুল কুরুনে ছিল না। তাই প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের মাহফিলকে আমরা বেদআত বলে থাকি। সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ এবং ভিন্ন আলোচনা।

সমাপ্ত